BanglaBook.org

# আ ত ঙ্ক

৩২ জন লেখকের আতঙ্ক কাহিনী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

# আ ত ঙ্ক

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪২২

— তিনশো টাকা —

প্রচ্ছদপট সুমন মিত্র
ভিতরের ছবি প্রণব হাজরা

ATANKA
A book of collection of terror.
by Thirtytwo experienced renowned Bengali writers.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 300/-

ISBN 978-93-5020-178-7

Website : www.mitraandghosh.co.in

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শব্দগ্রন্থন
টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ইউনিক কালার প্রিন্টার্স, ২০এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

# নি বে দ ন

বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প বিবিধ কারণে বিখ্যাত। স্বল্প পরিসরে জীবনের সুখ দুঃখ সে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে বারবার। ছোটোগল্পের আকর্ষণ তার বিষয় বৈচিত্র্যে। কতরকম ভাবনা নিয়ে যে ছোটোগল্প লেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পাঠক মুগ্ধ হয়েছে, বিস্মিত হয়েছে। কখনো প্রেম, কখনো বিচ্ছেদ। কখনো সুখ, কখনো দুঃখ। কখনো গোয়েন্দা, কখনো রোমাঞ্চ। আমাদের এই সংকলনের আয়োজন 'আতঙ্ক' নিয়ে। তবে সবগুলিই গল্প নয়। লেখক/লেখিকারা তাঁদের জীবনের সত্য ঘটনাও বলেছেন। সেই সত্য ঘটনাও গল্পের মতো রোমাঞ্চকর। আতঙ্ক জীবনেরই অঙ্গ। সে সামনে এলে তাকে জয় করতে হয়। এই সংকলন পাঠক/পাঠিকাদের ভালো লাগলে আমরা তৃপ্ত হব।

**প্রকাশক**

# সূ চি প ত্র


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ॥ কী আশ্চর্য! ১

বাণী বসু ॥ মাঝ রাতে ৫

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ॥ মহানিশার রাত ১০

অমর মিত্র ॥ হত্যাকাণ্ড ২২

রামকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ জোবের আতঙ্ক ৩২

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ॥ স্পর্শ ৩৯

ভগীরথ মিশ্র ॥ জলদানব ৫২

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বাঘের ডেরায় পৌঁছে ৬৭

অনিতা অগ্নিহোত্রী ॥ শীত-বসন্ত ৮১

প্রচেত গুপ্ত ॥ জঙ্গল ৯২

নলিনী বেরা ॥ আর মাত্র আধ ইঞ্চি ফাঁক ১০৩

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ॥ এক টুকরো স্লিপ ১১৮

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ ইসাবেলা ১৩৪

সৌরভ মুখোপাধ্যায় ॥ অভয় ১৪৯

বিনতা রায়চৌধুরী ॥ কেউ আছে আশে পাশে ১৫৭

জয়ন্ত দে ॥ ভয় ধরানো সেই সাড়ে তিন ঘণ্টা ১৭৫

# সূ চি প ত্র


সায়ন্তনী পূততুণ্ড ॥ টিক্ টক্ ১৮৫

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রক্তের গন্ধ ১৯৭

চিন্ময় চক্রবর্তী ॥ অপুর গল্প ২১৭

সফিউন্নিসা ॥ জাতিস্মর ২২৭

গৌর বৈরাগী ॥ বক্তিয়ারপুরে একটি রাত ২৩৪

অহনা বিশ্বাস ॥ সেলফি ২৪৩

অরিন্দম বসু ॥ সেই কুয়াশায় ২৫২

শুভমানস ঘোষ ॥ জলের বিপদ ২৬০

অনিন্দিতা গোস্বামী ॥ শিকার ২৬৯

সাত্যকি হালদার ॥ পাহাড় চূড়ায় একা ২৭৮

নীহারুল ইসলাম ॥ সাপের মাথায় পরি নাচে ২৮৫

শংকরলাল সরকার ॥ উৎকণ্ঠা ২৯৪

মোনালিসা ঘোষ ॥ ভালোবাসা ৩০২

সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এনকাউন্টার ৩১৩

বিনোদ ঘোষাল ॥ সেই রাত ৩৩০

পল্টু দত্ত ॥ লালসার হাতছানি ৩৩৫

# আতঙ্ক

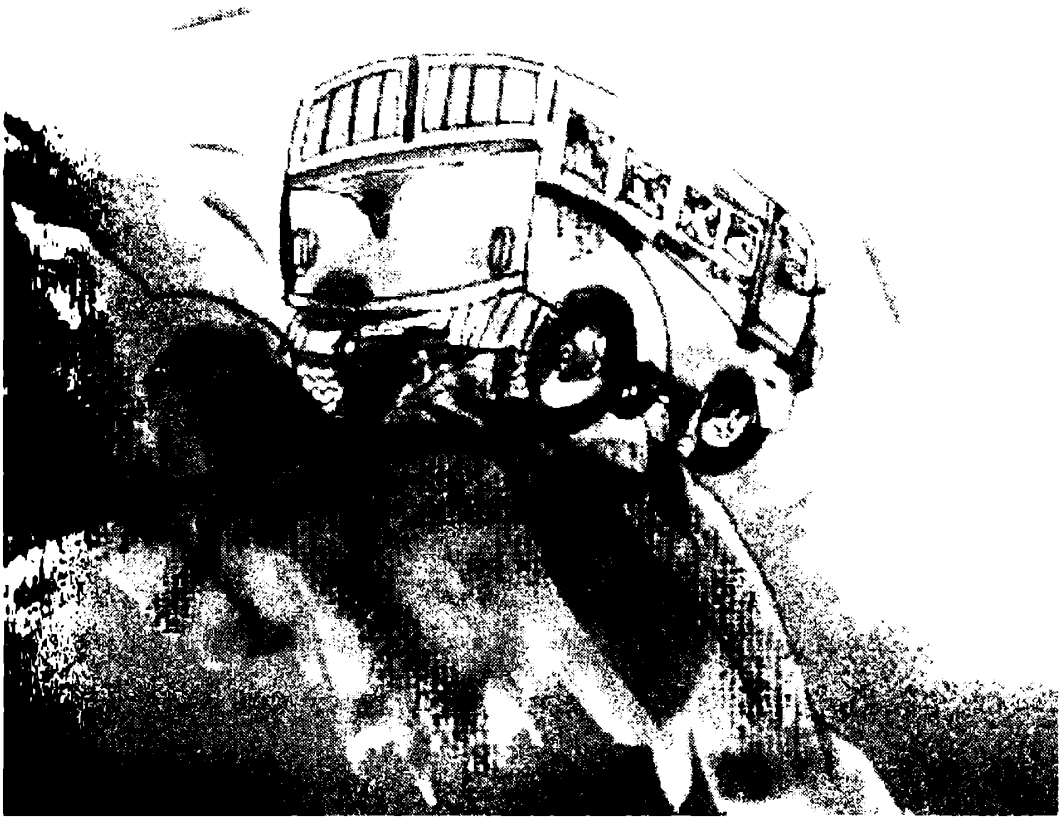

# কী আশ্চর্য!

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জম্মু থেকে বিশেষ বাসটি ছাড়ল। সকাল ১১টা নাগাদ। আরোহী আমরা একদল কলকাতার সাংবাদিক। সব সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাই রয়েছেন। উপলক্ষ 'হিমগিরি' ট্রেনটির কলকাতা থেকে প্রথম যাত্রা। আমরা 'রেল কর্তৃপক্ষে'র অতিথি। ফেব্রুয়ারি মাস। বেশ ঠাণ্ডা। আমরা যাচ্ছি শ্রীনগরে। ফিরে এসে লিখতে হবে দ্রুতগামী এই ট্রেনটির নানা কথা। কাশ্মীর ভ্রমণ কত সহজ হল। সময়ের সাশ্রয়। সার্ভিস ইত্যাদি। আনন্দ ভ্রমণ।

জম্মুর ঠাণ্ডা সহনীয়। শ্রীনগরে ভীষণ। কাশ্মীরের পরিস্থিতি তখন শান্ত। ভয়ের কিছু নেই। সমতলের মানুষদের জন্যে প্রকৃতির কোলপাতা, শিবালিক

BanglaBook.org

পর্বতমালার শীতল ছায়ায়। ডাল লেক, শিকরা, চিনার, জাফরানের কার্পেট, পহলগাঁও, লিডার নদী। ভূস্বর্গে চলেছি সদলে।

নির্বাচিত যাত্রীদের নিয়ে বাস চলেছে। আমাদের গল্পও চলেছে। হাসি, ঠাট্টা। বেশ একটা সুখ সুখ ভাব। কোনো অভাব নেই। দুঃশ্চিন্তা নেই। তেমন কোনো দায়িত্বও নেই। পথ কখনো উঠছে, কখনো নামছে। শহর-এলাকা শেষ হল। এবার শুধুই প্রকৃতি। সেই সব গাছ, যা বঙ্গদেশে দেখা যায় না। সেই সব ফুল, যার উল্লেখ কাব্যে আছে। ভিন্ন পোশাক। সুন্দরী, কিন্নরীদের এলাকা এখনো বহু দূরে। একটাই অভাব—চা। মাঝে মাঝে চুমুক। তবে চারপাশ থেকে প্রকৃতি এমনভাবে চেপে আসছে, নিজের অস্তিত্বই ভুলে যাচ্ছি।

বাস এইবার ঢুকবে 'বানিহাল' ট্যানেলে। অন্যতম বিস্ময়। পাহাড় ফুটো করে আমাদের স্থপতিরা নির্মাণ করেছেন এই দীর্ঘ সুরঙ্গ পথ। সমগ্র এলাকা জুড়ে সেনাবিভাগের কর্তৃত্ব নজরদারি। বাস টানেলে প্রবেশ করল। আলো-আঁধার। ঠাণ্ডাটা এইবার বেশ মালুম হচ্ছে। কেমন যেন লাগছে! গা ছম ছম। কতটা উঁচুতে আছি কার ভরসায়। কখন শেষ হবে এই গুহা!

হঠাৎ আলোর ঝলকানি। আমরা টানেলের বাইরে বেরিয়ে এসেছি। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলুম। দুপাশে নিরেট পাথরের দেয়াল। মাথার ওপর পাহাড়। গাড়ি বেশ জোরেই চলছে। মাঝে মাঝে বিপরীত দিক থেকে মিলিটারি ট্রাক আসছে। আমাদের গাড়িটা তখন বড় বেশি বাঁদিকে সরে যাচ্ছে যেন। বসে থাকা ছাড়া আমার তো কিছু করার নেই, বসে বসে ভয় তৈরি করছি, নানারকম আতঙ্ক। ইতিমধ্যে একজন ভালো বন্ধু পেয়েছি। দীর্ঘদেহী বুড়ো শিব দাশগুপ্ত। স্টেটস্‌ম্যানের সাংবাদিক। অর্থনীতিবিদ। নামে শিব, আচরণেও শিব। অসাধারণ সেই মানুষটি কোথায় হারিয়ে গেলেন। পৃথিবীর ঠিক কোন্ জায়গায় কি কাজে ব্যস্ত আছেন জানি না। বাসে ওঠার আগে রেলের পি.আরও তিনটে খাওয়া একসঙ্গে খাইয়ে দিয়েছেন। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার। শ্রীনগরে পৌঁছতে রাত হবে।

পাকদণ্ডী পথ। আমরা ওপরে উঠছি। মাঝে মাঝে 'হেয়ার পিন বেঞ্চ'। বিপজ্জনক বাঁক। গাড়িটা হঠাৎ ডানদিকে একটা টার্ন নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁদিকের ব্যারিকেডে ধাক্কা মেরেই ব্রেক কষল। প্রচণ্ড শব্দ। আচমকা ঝাঁকুনি। যেখানে ধাক্কা মেরেছে, সেই জায়গার তিন চারটে কংক্রিট পোস্ট

BanglaBook.org

ভেঙে খাদে পড়ে গেছে। বাসের সামনের দিকে চালকের অংশটা কিনারায় ঝুলছে। ইঞ্জিন বন্ধ। ব্যাক করার কোনো প্রশ্ন নেই। বাসটা ঢেঁকি হয়ে গেছে। সামনের দিকের কিছুটা শূন্যে পেছন দিকটা পথে। যদি গোঁত খেয়ে পড়ে, পড়বে হাজার ফুট নিচে।

চালকের মাথা স্টিয়ারিং-এ। প্রায় অচৈতন্য। সহকারী চিৎকার করে বলছেন, 'কেউ একটুও নড়বেন না, বাস তাহলে পড়ে যাবে। প্রাণভয়ে হে রে রে রে করে নেমে যাওয়ার উপায় নেই। একটাই দরজা সামনের দিকে। বাসটা হয়ে গেছে একটা দাঁড়িপাল্লা। কাঁটায় কাঁটায় ঝুলছে। সামনের পাল্লায় কয়েক কেজি চাপালেই গভীর মৃত্যু।

নির্বিকার বুড়োশিব বললেন, 'একেই বলে জীবন-মৃত্যুর পাটাতনে দোল খাওয়া—See Saw ব্যালেন্স।'

আশ্চর্য মানুষ! একটু পরেই মরে যাব। ধড় একদিকে, মুণ্ডু আর এক দিকে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কিছু ভাবতেই পারছি না। একটু পরেই মরে যাব, সেটাও যেন কিছুই নয়। যমের দুয়ারে আরাম কেদারায় বসে আছি। বাঁচার ইচ্ছে নেই বললেই চলে। মরে যাই তো মরে যাব—এইরকম একটা ভাব। অদ্ভুত একটা আলস্য। অনেকটা পথই তো এক ভাবে বসে বসে এলুম, তখন কোনো বিরক্তির ভাব ছিল না। এখন যেন ধৈর্যহারা। যা হবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। এই থমকে থাকাটা বিরক্তিকর।

বুড়োশিববাবু বললেন, 'আমি ভাবছি, কিভাবে পড়বে, হড়হড় করে নেমে যাবে, না গড়াতে গড়াতে, ডিগবাজি খেতে খেতে। আমরা দলা পাকিয়ে যাব। কে কার ঘাড়ে পড়ব, কে জানে?'

কে একজন গুন গুন করে গান গাইলেন সামনের দিকে। কেউ কিন্তু ভগবানের নাম করছেন না। সকলেই প্রায় বোবা। সামনে মৃত্যু বসে আছে কোল পেতে। ডাকছে, আয় আয়। হঠাৎ আমার একটা গান মনে পড়ল। স্বামীজী যখন বালক তখন একদিন যাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন। সেই পালা থেকে গানটি শিখে, পরের দিন সকালে বাড়ির দোতলার বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে গাইছেন,

তোমায় যম এসেছে নিতে,
আর দেরি কোরো না যেতে।

BanglaBook.org

ভাবছি, গাইব কি না, এমন সময় বাসটা নড়ে উঠল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি শব্দ—'ফিনিশ! গুডবাই অল মাই পাওনাদারস্!'

নড়ার কারণ, মিলিটারিরা এসে গেছেন। Don't Move। তাঁরা পেছনের বামপারে দড়িদড়া বেঁধে, টেনে টুনে নিরাপদ জায়গায় আনলেন। বোবারা এইবার ভীষণ সরব, 'চিয়ারস্ চিয়ারস্।' একদল কাঁচাপাকা মানুষের পুনর্জন্ম হল।

তাই ভাবি, জীবন একটা তক্তা। এই 'গেল গেল', এই 'উঠল উঠল'। ঢেঁকিতে কার পা? জানি মা, তোমার একটি রোঙা পা। রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে বলি, 'ওমা, কী আশ্চর্য! বেঁচে আছি মা!'

BanglaBook.org

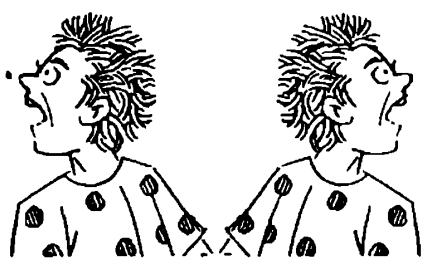

# মাঝ রাতে

## বাণী বসু

জীবনে কখনো ভূত দেখলাম না এ নিয়ে আমার কিঞ্চিৎ দুঃখু আছে। অথচ আমি নেহাত অভীতু মানুষ নই। ভূত যদি আসে, যদি দেখা দেয় তাহলে আমি আমার ভয়-ভয় ভাব নিয়ে রেডি। আমাকে ভয় পাওয়াতে ভূতের বেশি বেগ পেতে হবে না। সেরকম ভূতুড়ে বাড়িও ছাই আমার কপালে জুটল না! অবশ্য সে আমারই দোষে। ওইরকম বাড়ির ধারকাছ আমি মাড়াবোই না, ভূতের ভয়ে নয়, নোংরার ভয়ে, মানুষের ভয়ে। আমার কাছে আসতে হলে ভূতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় আসতে হবে, যেখানে বিদঘুটে গন্ধ নেই, ময়লাটে জিনিসপত্তর নেই, আলো জ্বাললেই জ্বলে, কল

BanglaBook.org

খুললেই জল, শুলেই ঘুম, খিদে পেলেই মোটামুটি খাবার। এইরকম নন-অ্যাডভেঞ্চারাস মানুষের যে ভূত দেখা হবে না তাতে আর আশ্চর্য কী! অন্ধকারেও আমার ভয় হয় না। অসুবিধে হয় কিন্তু ভয় টয় নয়। জীবনে বহুবার বহু বিপাকে পড়েছি, তখন ভয় পেয়েছি অবশ্যই। কিন্তু সে ভয় যদি হাত পা অসাড় করে দিত তা হলে আর এত দূর আসতে হতো না। তখন উঠে পড়ে লাগার দিন, কী করে এ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। পরীক্ষাতেও আমি কখনো ভয় পাইনি। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রছাত্রীরা যেখানে শুকনো মুখে লাস্ট মিনিট রিভিশন করছে, সেখানে আমি মায়ের হাতে রসগোল্লা খাচ্ছি। ডিম বা রসগোল্লা নিয়ে আমার কোনো কুসংস্কার নেই। অথচ সারা জীবনটা ভয়ে ভয়ে, সাবধানে সাবধানেই কেটে গেল। মানে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে আমি সন্ধে আসতেই দেব না, তার আগেই পিঠটান। বাঘ যদি আমার সামনে লাফিয়ে পড়ে তক্ষুনি আমি ধপাস করে পড়ে যাব, নে বাবা, চট করে আগে টুঁটি টিপে মেরে দে, তারপরে ডিটেলে যাস। এ ধরনের মানুষকে বলে কাপুরুষ। ভেতরে কোনো লড়াই-ই নেই।

দেখুন, লোকে ভূত আর ভগবান এই দুটো বিষয়কে সব সময়ে এক করে দেখে। যেন ভূত না থাকলে ভগবানও থাকবে না এটাই স্বতঃসিদ্ধ। কেন রে বাবা! ভূতের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক কী? ভগবান হলেন, এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। যেখানে যা আছে, যা ঘটছে সব তাঁর জানা। আর ভূত হল বায়ুভূত, যদি থাকে। দিনে দিনে ভূ-গোলোকে সব কার্যের পেছনে কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোক এখন ভগবানে বিশ্বাস করে না। আবার এক চতুর্থাংশ প্রবলভাবে বিশ্বাস করে, ঠিক যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষ বিশ্বাস করেছেন। পড়ে রইল আর অর্ধেক। তার মধ্যে কিছু বিশ্বাসের দিকে ঢলে, কিছু অবিশ্বাসের দিকে। আমি নিজে কোন্‌দিকে কী বৃত্তান্ত খুলে না-ই বললাম। নিজেই কি জানি? ভগবান নামে কোনো ব্যক্তি কোনো এক জায়গায় সব কিছুর দায়িত্ব নিয়ে বসে নেই এ কথা আমরা অনেকেই মানি। এ-ও মানতে শুরু করেছি যে ভগবান একটা সারা বিশ্বব্যাপী শক্তি। খেলে বেড়াচ্ছে, আমরাও তার অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও ছোট বড় যে-কোনো বিপদে হে ভগবান রক্ষা করো বলে ডাকাডাকি করি কি করি না! করি তো! আমার মতো অনেক হাফ-এথীস্টও তাই করেন। এর ভেতরে

BanglaBook.org

আমি কোনো অসংগতি দেখতে পাই না। পরে বিশ্লেষণ করে মনে হয় নিজের ভেতরে নিজের অতীত কোনো শক্তির কাছে আমার প্রার্থনা। সবটা তো আমরা জানি না। আমাদের ভেতরের সেই বিন্দু বিন্দু ঈশ্বর-শক্তি হয়তো আমাদের জোর দেয়! কখনো কখনো রক্ষা করে। অর্থাৎ নিজের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে একরকম করে ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দিতে পেরে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

এমন সময়ে সারা পৃথিবীতে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। সেটা হল একটি ঘোষণা।

সুইজারল্যান্ডের জিনিভার কাছে সার্ন নামে পৃথিবীর বৃহত্তম ফিজিক্স ল্যাব-এ লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার নামে এক দৈত্যাকার যন্ত্রে প্রোটন কণায় কণায় বিপুল বেগে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বিগ ব্যাং নামে বিশ্বের প্রারম্ভিক বিস্ফোরণের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা হবে, তাতে মহাবিশ্ব ও সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য আমরা জানতে পারব। কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল স্টিফেন হকিং-এর মতো বিজ্ঞানীরাও এটা না করতে বলেছেন। কী জানি কী বিপদ তাঁরা আশঙ্কা করছেন! আরো একটা ফিসফিসানি শোনা যেতে লাগলো—এতে নাকি গড পার্টিকল বা ঈশ্বরকণা আবিষ্কৃত হতে পারে। ২০১২-র চার জুলাই ঘটল ঘটনাটা।

সেই দিন রাতে কেন যেন কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সারা শরীরে, মনে কী একটা অস্বস্তি, একটা অশান্তি। সেটা ঠিক কেন কোথায়, বুঝতেও পারছি না, আবার শান্তিও পাচ্ছি না। অনেক রাতে উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে তেমন কোনো পরিষ্কার আকাশ দেখতে পেলাম না। অনেকদিনই পাই না। তারা দেখতে পাই না। অথচ বহুদিন পর্যন্ত তারা ভরা আকাশ না দেখতে পেলে আমার ঘুমই হতো না। চাবি নিয়ে ছাতে উঠে গেলাম। মাথার ওপর একটা সাদাটে, ফ্যাকাশে আকাশ। জানি, বায়ুদূষণে, সারা কলকাতাময় বিশাল বিশাল টাওয়ার নির্মাণে, আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চেহারারও এই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তবু মন মানল না। মনে হল আকাশটা কী এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় যেন থমথম করছে। সত্যি বলতে কী, পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে সে নিয়ে আমার কোনো ভয় ছিল না। গেলে যাবে, সবাই মিলে মরে গিয়ে বেঁচে যাব। কীভাবে শেষটা হবে সে নিয়েও ভেবে তো লাভ নেই, যা সবাইকার হবে আমাদেরও তাই হবে। তাহলে?

BanglaBook.org

হঠাৎ একটা কালো বিদ্যুৎ! গড পার্টিকল গড পার্টিকল! এতদিন ধরে বিজ্ঞান যা যা আবিষ্কার করেছে তাতে একটা একটা করে আমাদের স্বপ্ন ভেঙেছে। আমরা জেনেছি আমাদের সৃষ্টির পেছনে কোনো মাহাত্ম্য নেই। বিবর্তিত হতে হতে আজকের চেহারাটা পেয়েছি আমরা, ঠিক আছে মেনে নিলাম, তাছাড়া বিবর্তন যখন হয়েছে, তখন আরো হবার চান্স আছে। তখন কোনো মহিমায় পৌঁছোনো যায় কিনা মানুষ চেষ্টা করে দেখতেই পারে! কিন্তু বিজ্ঞান এখন ভালোবাসার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সবটাই বায়োলজিক্যাল, এরকম একটা সম্ভাবনা নিয়ে তোলাপাড়া চলছে। প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা মা-সন্তানের ভালোবাসা সবটাই জৈব অথচ আমাদের ধারণা ছিল এই ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই একমাত্র আমরা অলৌকিকের দেখা পাই। এখন আমাদের শেষ স্বপ্ন নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া চলেছে। এবার যদি বিজ্ঞান ওই শেষ রহস্যটুকু ফাঁস করে দেয়...! বাইরের প্রকৃতি কালো, ছাতের ওপরে একা একা দাঁড়িয়ে আমার মনে হল ব্রহ্মাণ্ড আসলে একটা চেতনাহীন যান্ত্রিক কালো দানব, যার চেতনা নেই সে দানব ছাড়া কী? সে কী করছে জানে না, তার কোনো বিচারবোধ নেই, তার কাজ শুধু এলোমেলো পা ফেলা, তাতে যা ধ্বংস হচ্ছে তা ভালো না মন্দ তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, কেন না সে জানেই না। আবছা ভাবে মনে হল— শুনেছিলাম ফিজিক্স এখন চেতনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। বার করে ফেললেই হল। চেতনা কতকগুলো কেমিক্যাল অ্যাকশন রিঅ্যাকশন! হিগ্‌স্ বোসন পার্টিকলের অন্য নাম গড পার্টিকল। কেন? একে ধরাছোঁয়া যায় না, এই আছে এই নেই! অথচ অঙ্ক কষে বোঝা যাচ্ছে তার থাকার কথা। এই পার্টিকলই নাকি সেই মিসিং লিঙ্ক যার বিহনে ফিজিক্সের অঙ্ক কষা ছকটি অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। তা হলে গড পার্টিকল পাওয়া গেলেই আমাদের যাত্রা শেষ? চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছে ঘন ধোয়ার কুণ্ডলি, আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। কেমিক্যাল গড! ফিজিক্যাল গড! বায়োলজিক্যাল গড! কোথাও কোনো মানবিক গড তো নেই-ই, নেই কোনো অলৌকিক সচেতন শক্তি, মানুষ যদি এই বিশ্বের কে কী কোথায় কেন, কেন ভালো কেন মন্দ সব স—ব ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারে তার ইকোয়েশনে ফেলে তাহলে কী হবে!

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখি আমি হাত পা নাড়াতে পারছি না। সর্বনাশ,

BanglaBook.org

তবে কি আমার পক্ষাঘাত হয়ে গেল? অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সাড় ফিরল, ভীষণ একা একা লাগল, কোনোক্রমে নিচে নেমে এলাম। নিজের ঘরে ঢুকে থুম হয়ে বসে থাকি, অসাড় মন নিয়ে। ঘুমন্ত মুখগুলি দেখি, দেখতে দেখতে এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে শুয়ে পড়ি যে ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত আমি একা নই! তবে ঘুম আসে না।

কাগজে খবর। হ্যাঁ, হিগস-বোসন কণা পাওয়া গেছে, হ্যাঁ ওই মিসিং লিঙ্ক আবিষ্কৃত হওয়ায় ফিজিসিস্টদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। নিখিল বিশ্ব যেসব কোয়ার্ক ও ইলেকট্রন দিয়ে প্রধানত গঠিত, তাদের এনার্জি আছে, মাস নেই, তাহলে মাস কোথা থেকে এলো? সে এই হিগস বোসন কণাদের দান। না না গড পার্টিকল নামটা একটা ভুল নাম। আসলে, বিজ্ঞানী লেডারম্যান কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন গডডামড পার্টিকল, সে যে ধরা দিতে চায় না। তিনি বলতে চেয়েছিলেন অতি বদমাশ চতুর কণা। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই ঠিক নামটা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। 'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'। কে জানে সে হয়তো আমাদের অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মের একটি কোষমাত্র।

BanglaBook.org

# মহানিশার রাত

## ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সবে পুরীর ট্রেন চালু হয়েছে। রামজীবনপুর ও তার আশপাশের গ্রাম থেকে এক তীর্থযাত্রীদল গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে। বিজন সরকার নামে এক যুবকও ছিল তাদের সঙ্গে।

পুরীতে ওরা যে পাণ্ডার বাড়িতে উঠেছিল সেই একই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল অন্য এক যাত্রীদল। সেই দলের সবাই ছিল মহিলা। ওরা এসেছিল বাঁকুড়ার ইন্দবিল থেকে। ওই দলের সেতো ছিল গোলক নামের একজন অভিজ্ঞ লোক। হাঁটা পথের সময় থেকেই এ পথে যাতায়াত ছিল তার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে শ্রীক্ষেত্রে স্বর্গলাভ করলে এই মহিলা যাত্রীদলের মন ভেঙে গেল এবং খুবই অসুবিধেয় পড়ে গেল তারা।

এই মহিলা যাত্রীদলে পদ্ম নামে এক অষ্টাদশী তরুণীও ছিল। তরুণী তার মধুর ব্যবহারে সকলেরই মন জয় করে নিয়েছিল। রামজীবনপুরের দলও আপন করে নিয়েছিল পদ্মকে। বিজনও পদ্মর হাসিখুশি মুখ ও সহজ সরল ভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিল তার প্রতি। ভোরে সূর্যোদয়ের সময় বিজন সমুদ্রতীরে গেলে পদ্মকে সঙ্গে নিত। এটা ওটা কিনেও দিত। তার কারণ পদ্ম ছিল দুঃখিনী। খুব ছোটবেলাতেই সে তার মা-বাবাকে হারিয়েছিল। ইন্দবিলেই মামার বাড়িতে থেকে বড় হয়েছে ও।

যাই হোক, যাত্রীদল এসেছিল শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের রথ দেখবে বলে। কিন্তু রথের তখনো একমাস দেরি। তাই সেতো মরে যাওয়ায় মহিলা যাত্রীদলের মন খুব ভেঙে গেল। তারা আর কেউ পুরীতে থাকতে চাইল না। বিশেষ করে সেতো ওই গ্রামেরই লোক। তাই এই অবস্থায় ওর পরিবার পরিজনের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোও তো উচিত। তাই সবাই এসে বিজনকে ধরল নিরাপদে ওদের প্রত্যেককে যার যার বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য।

পদ্মও বলল, 'রথ দেখার আনন্দ আর নেই। মনটা একেবারেই ভেঙে গেছে। কদিন তো ভালোই কাটল এখানে এসে। যদি আপনি আমাদের এই উপকারটুকু করেন তো আমরা সবাই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে। অবশ্য আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলে আপনার রথ দেখা হয়ে উঠবে না। যদি আপনি না যান তাহলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিজেরাই যাব আমরা।'

বিজন বলল, 'রথ দেখার ব্যাকুলতা আমারও খুব একটা যে আছে তা নয়। জগন্নাথ দর্শন হয়েছে, সমুদ্রস্নান হয়েছে এতেই আমি খুশি। তোমরা কবে যাবে দিন ঠিক করো, আমি তোমাদের নিয়ে যাব।'

মহিলা যাত্রীদলের মনের অবস্থাও তখন ভালো নয়। তার ওপর বিজনের মতো এক সদাহাস্যময় যুবকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া এবং সে যে

BanglaBook.org

এক কথায় যেতে রাজি হয়েছে সেই আনন্দে তারা যাবার জন্য গোছগাছ শুরু করল।

বিজনও রামজীবনপুরের সবাইকে জানাল তার এই সিদ্ধান্তের কথা।

দলের কয়েকজন প্রবীণাও বললেন, 'না বাবা, এই অবস্থায় তোমাকে আমরা বেশিদিন থাকতে বলব না। আমরা এতদূর যখন এসেছি তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না। তোমার অল্প বয়েস, তুমি হয়তো বারবার আসবে। আমরা তো তা পারব না। তাই যা ভালো মনে করো তাই তুমি করো।'

যেদিন কথা হল তার পরদিনই যে যার বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে হাজির হল স্টেশনে। স্টেশনে আসার পরই যাত্রীদলের মধ্যে পাঁচজন হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদল করে বেঁকে বসল যাবে না বলে। পুরীতে এসে রথযাত্রা না দেখে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে একদমই সায় দিচ্ছে না। বিজনের তখন বিরক্তি ধরে গেছে। ওদের রকমসকম দেখে একবার ভাবল সরাসরি না করে দেয় ওদের। কিন্তু পদ্ম ও আর দুজন বয়স্কা মহিলার দিকে তাকিয়ে সে তা পারল না। বিমুখী যাত্রীদের বিদায় দিয়ে পুরী প্যাসেঞ্জারে চারজনের থার্ড ক্লাসে টিকিট কেটে ট্রেন চেপে বসল। বিজন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত একটি কামরায় মেয়েদের তুলে দিয়ে নিজে সাধারণ বগিতে জায়গা করে নিল। তখন এত যাত্রীর ভিড় ছিল না। তাই একটা বেড়শিট পেতে বাঙ্কের দখল নিয়ে চুপচাপ বসে রইল জানলার ধারে একটি সিটে।

রাত দশটায় ট্রেন ছাড়ল। জগন্নাথের রথযাত্রা না দেখে অনেক আগেই চলে যাওয়ায় মনটা একবার একটু অন্যরকম হলেও আপন কর্তব্যবোধের কারণে সে ভাব কেটে গেল অচিরেই।

বিজন মেয়েদের খোঁজখবর রাখার জন্য মহিলা কম্পার্টমেন্টের পাশের কামরাতেই উঠেছিল। এবং কোনো স্টেশনে ট্রেন থামলে গিয়ে দেখা করত।

এইভাবে দু'রাত কাটার পর তৃতীয় দিনের ভোরে গাড়ি খড়্গপুরে এসে থামল। ওদের টিকিট যদিও হাওড়া অব্দি ছিল তবুও বয়স্কা মহিলা দুজন বললেন, 'আমরা এখানেই নামতে চাই বাবা। এখানে ইঁদায় আমাদের এক বোন থাকে তার সঙ্গে দেখা করে তবেই যাব। নাহলে আর তো এদিকে আসা সম্ভব হবে না।'

পদ্মর মুখ তখন ম্লান।

BanglaBook.org

বিজন বলল, 'আপনারা যদি এভাবে সময় নষ্ট করেন তাহলে কিন্তু আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব হবে না। বাড়িতে আমার মা বাবা আছেন। তাছাড়া রামজীবনপুরের পথও সুগম নয়। চারদিক বনজঙ্গলে ভরা। সেখানে ডাকাতের ভয়ও আছে। এখন আমি দলের সঙ্গে নেই। একা যাব।'

'তাহলে তুমি এক কাজ করো, আমাদের বোনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তুমি বরং তোমার দেশের দিকেই চলে যাও।'

পদ্ম বলল, 'আমার বাড়ি যাওয়ার তাহলে কী হবে? তোমরা যদি ইন্দোবিলেই না যাবে তাহলে অকারণে বিজনদাকে পুরী থেকে টেনে আনার কোন্ দরকারটা ছিল?'

'তুই আমাদের সঙ্গেই যাবি। আমরা খুব জোর এক দেড় মাস থাকব। তার বেশি তো নয়। একান্ত থাকতে না চাস দেখি না এদিক থেকে কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

বিজন সহজে রাগে না। তবুও মনের রাগ মনে চেপে ওদের তিনজনকে নিয়ে ইঁদার দিকেই চলল। স্থির করল অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে পরের কোনো ট্রেনে হাওড়ায় চলে যাবে। কিন্তু যা সে ভাবল তা হল না। ওই বয়স্কা মহিলা দুজনকে তাদের বোনের বাড়িতে পৌঁছে দিলে সে বাড়ির লোকজনদের মধুর ব্যবহার ও আতিথেয়তায় এমনই মুগ্ধ হল যে এক রাত থেকেই গেল সেখানে। থেকে যাওয়ার আরও কারণ এ-বাড়ির যিনি কর্তামশাই তিনি বললেন, আগামীকাল সকালেই তাঁর বিশ্বস্ত কয়েকজন লোককে দিয়ে পদ্মর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন। অতএব চিন্তা ভাবনার কিছু নেই।

একথা শুনে বিজনও নিশ্চিন্ত হল। পদ্মর মুখেও হাসি ফুটল এবার।

পদ্ম বিজনকে বলল, 'আপনি কিন্তু আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে না দিয়ে যাবেন না। আপনি সঙ্গে না থাকলে আমার খুব ভয় করবে।'

বিজন বলল, 'ভয় নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।'

যাই হোক, সে দিনটা ইঁদায় থেকে রাত্রিটা ভালোভাবে কাটিয়ে পরদিন সকালে যাবার জন্য তৈরি হল ওরা। বয়স্কা দুই মহিলার কারণে বিজনের মনে যেটুকু রাগ জন্মেছিল সেটুকু কেটে গেল এবার।

একটু পরে চারজন বলিষ্ঠ চেহারার বেহারা পালকি নিয়ে হাজির হল।

BanglaBook.org

পালকিতে ছিল পদ্মরই বয়সী এক বিবাহিতা তরুণী। সে যাবে বাঁকুড়া শহরে তার পিতৃগৃহে। সম্ভবত তার জন্যই হয়তো পালকির ব্যবস্থা করা ছিল। ফলে পদ্মও সুবিধেটা পেয়ে গেল। বর্তে গেল বিজনও। কেননা এ পথে সে কখনো আসেনি।

পালকির পুরোভাগে থেকে ডাকাতের মতো চেহারার একজন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সকলকে। বিজনও নির্ভাবনায় ওদের সঙ্গ নিয়ে বনপথ ধরে চলতে লাগল অদম্য উৎসাহে।

পথ কতদূর, কতদিনে পৌঁছবে, কিছুই তো জানা নেই বিজনের। যেহেতু পালকি বেহারারা পথ চেনে তাই ওর মনে কোনো উৎকণ্ঠাও নেই।

এইভাবে একটানা চলতে চলতে ভরদুপুরে বনময় পরিবেশে ছোট্ট একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছল ওরা। গ্রামের মানুষরা অনেক আদরযত্ন করল ওদের। দুপুরে আহারাদিরও ব্যবস্থা করল। এমনকি একটা রাত থেকেও যেতে বলল ওদের গ্রামে।

ওদের পথ প্রদর্শক ও পালকি বেহারারা রাজি হল না।

পদ্ম বিজনকে বলল, 'অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন যাওয়া যাক। সন্ধে পর্যন্ত গিয়ে কোথাও একটু আশ্রয় নেওয়া যাবে। কাল ভোরে উঠে আবার রওনা দেব।'

যে বিবাহিতা তরুণী পালকিতে ছিল তার মুখ ভালোভাবে দেখার সুযোগ পায়নি বিজন। এই গ্রামে এসেই তাকে খুব কাছ থেকে দেখল। কথা বলল। ওর নাম লক্ষ্মী। গা-ভর্তি গয়না। মুখে মিষ্টি হাসি। কিন্তু খুবই সরলতায় ভরা।

বিজন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যে বাপের বাড়ি যাচ্ছ তোমার সঙ্গে কেউ নেই কেন? তাছাড়া গা-ভর্তি এত গয়না পরে কেউ কি যায়?'

লক্ষ্মী বলল, 'আমার বাবার খুব অসুখ। এদিকে শ্বশুরবাড়ির কারও সময় নেই আমাকে নিয়ে যাবার। এমন সময় আপনারা এলেন। বিশেষ করে সঙ্গে একজন মেয়েও আছে তাই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পালকির ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিল আমাকে। গয়নাগুলো অবশ্য আমিই শখ করে পড়েছি।'

যাই হোক, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা আবার পথ চলতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখা দিল আকাশ কালো করে ঘন

BanglaBook.org

মেঘ। দেখতে দেখতে সেই মেঘ ছড়িয়ে গেল সারা আকাশময়। তারপর শুরু হল প্রবল বর্ষণ। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। বেহারা পালকি সামলাতে না পেরে উলটে গেল। পালকিও একপাশে কাত হয়ে গড়াতে লাগল এদিক সেদিক। পদ্ম ও লক্ষ্মী কোনোরকমে প্রাণে বাঁচল। সকলেই জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে একশা হল। ওদের যে পথ-প্রদর্শক, হঠাৎ বজ্রপাতে সেখানেই প্রাণ হারাল সে। বেহারারাও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল সেখানেই। এই অবস্থায় পদ্ম ও লক্ষ্মীকে নিয়ে বিজন যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। বজ্রনিনাদে লক্ষ্মীও প্রায় অচৈতন্য। তবুও বৃষ্টির জলের প্রভাবে একটু পরেই স্বাভাবিক হল ও।

গভীর বনের মধ্যে এমন এক জায়গায় এসে পড়ল ওরা যেখানে কোনো আশ্রয় নেই। এদিকে সন্ধেও যেমন ঘনিয়ে আসছে অপরদিকে দুর্যোগও বেড়ে চলেছে ক্রমশই।

বিজন বলল, 'এইভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। চলো একটু এগিয়ে দেখি কোথাও কোনো গ্রামের সন্ধান পাই কিনা।'

পালকির বেহারারাও অঙ্গুলিসংকেতে ওদের এগিয়ে যেতে বলল।

প্রত্যেকেরই সঙ্গে কিছু মালপত্তর ছিল। সেগুলোও ভিজে ঢোল। লক্ষ্মীর সঙ্গে একটি স্যুটকেস ও পুঁটুলি ছিল। বিজন বহুকষ্টে উদ্ধার করল সে দুটিকে। তারপর তিনজনে প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর গড়বেতার গ্রামে গিয়ে পৌঁছল ওরা। এই সমস্ত অঞ্চলের ধারে কাছে অনেক ডাকাতের বাস তা এরা জানত না। কাছেই গনগনির মাঠ অতি ভয়ংকর। কত মানুষ কত ডাকাতের হাতে যে ওখানে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ওরা ভুলবশত এমন এক ডাকাতের বাড়িতেই আশ্রয় নিল।

ডাকাতদের বউরা খুবই সমাদর করল ওদের। পদ্মর রূপ ও লক্ষ্মীর গয়নার প্রশংসা করতে লাগল খুব। তারপর এই দুর্যোগের রাতেও ওদের তিনজনকে খাইয়ে দাইয়ে একটি ছোট মাটির ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। খানিক পরে দুর্যোগও থেমে গেল একেবারেই।

মাটির ঘরে খড়ের ওপর চট পাতা বিছানায় পদ্ম ও লক্ষ্মী পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। একপাশে একটি নড়বড়ে তক্তাপোশে শয্যা নিল বিজন।

BanglaBook.org

সারাটা দিনের ক্লান্তিতে পদ্ম ও লক্ষ্মী ঘুমিয়ে পড়লেও বিজনের কিন্তু ঘুম এল না। ওদের পথ প্রদর্শকের করুণ পরিণতি ও পালকি বেহারাদের অবস্থার কথা চিন্তা করেই অধীর হয়ে উঠল সে।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর বাইরে কাদের যেন ফিসফিসানি ও পদশব্দ শুনতে পেয়ে প্রমাদ গণল বিজন। ঘরে টিম টিম করে জ্বলছে ছোট্ট একটি চিমনি লণ্ঠন। তারই আলোয় দেখল পদ্ম ও লক্ষ্মী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই অবস্থায় যদি বিপদ ঘটে তাহলে কী করবে ও। লক্ষ্মীর গা ভর্তি গয়না ওরা তো ছিনিয়ে নেবেই উপরন্তু প্রাণেও মারতে পারে। নিশ্চয়ই কোনো চোর ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছে এখানে। ও তাই আর শুয়ে না থেকে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে কান পাতল। তারপর দরজার খিল খুলতে গিয়েই মনে হল এ ঘরে কোনো খিল বা ছিটকিনি তো ছিল না। বুকের রক্ত তখন হিম হয়ে গেছে বিজনের। আলতো করে দরজাটা টানতে গিয়েই বুঝল ওটা বাইরে থেকে শিকল দেওয়া।

এই মুহূর্তে কী যে করবে বিজন তা ভেবে পেল না। দুর্বৃত্তরা শুধু গয়না নয় মেয়েদের অন্য ক্ষতিও করতে পারে। ও খুব সন্তর্পণে পদ্ম ও লক্ষ্মীর দিকে এগোল। ও বুঝেই গেছে আজ আর ওদের নিস্তার নেই। আজকের রাতই ওদের জীবনের শেষ রাত। ঘুমন্ত দুজনের কাছে গিয়ে চাপা গলায় ডেকে তুলল ওদের। তারপর যা বলার তা ফিস ফিস করে বলল।

লক্ষ্মী তো ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পদ্ম সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল ওর মুখ। বলল, 'একদম কান্নাকাটি নয়। ভয় পেলেই বিপদ বাড়বে।' তারপর বিজনকে বলল, 'আপনি এক কাজ করুন। আমি গ্রামের মেয়ে। আমার অভ্যাস আছে। নিচু চালা। আমি তক্তাপোশে উঠে চালা ফুঁড়ে বাইরে গিয়ে শিকল খুলে দিচ্ছি। আপনি লক্ষ্মীকে নিয়ে বেরিয়ে আসুন।'

বিজন বলল, 'তুমি নয়, আমি যাই। বাইরে বেরোলেই তোমার বিপদ হতে পারে।'

'কিছু হবে না। আপনি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

বিজন তাই করল।

অভ্যস্ত মেয়ে পদ্ম চালা ফুঁড়ে ওপরে উঠে দেখল কেউ কোথাও নেই।

BanglaBook.org

অথচ একটু আগেই দু'একজন লোকের কথাবার্তা ও নিজেও শুনেছে। যাই হোক, ছোট্ট কুঁড়েঘর। ও অনায়াসে চালা থেকে নেমে চুপি চুপি গিয়ে দরজার শিকলটা খুলে দিতেই লক্ষ্মীকে নিয়ে বাইরে এল বিজন।

চার পাঁচজন ডাকাত তখন দূরে বসে হয়তো বা নেশা করছিল। ওরা বাইরে আসতেই নজরে পড়ে গেল ওদের। সবাই একজোট চিৎকার করে উঠল, 'ওরে পালাল রে। ধর ধর।'

কিন্তু ধরা কি এতই সহজ? প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তিনজনেই তখন ছুটেছে অন্ধকার বনপথ ধরে। খানিক যাওয়ার পরই বিজন সোজা পথ ছেড়ে ঘন আগাছায় ভরা বনময় প্রান্তরের দিকে চলল। তারপর বড় একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল তিনজনে।

একটু নিশ্চিন্ত হল। কেননা ডাকাতদের পদশব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

তিনজনেই দারুণ ক্লান্ত হয়ে হাঁফাচ্ছে তখন। প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে প্রত্যেকের জামাকাপড় কাদায় মাখামাখি।

লক্ষ্মী বলল, 'কতক্ষণ আমরা এভাবে বসে থাকব? এদিকে আমরা তো সর্বস্ব খুইয়েছি। আমাদের পুঁটুলি, স্যুটকেস, ব্যাগ সবই তো ওই ঘরের মধ্যে রয়ে গেছে। কী যে আছে কপালে তা কে জানে?'

পদ্ম বলল, 'সব যাক। সময়মতো প্রাণ নিয়ে যে ফিরে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। এখন একটাই ভয় আমাদের, কীভাবে দেশে ফিরব। পালকি বেহারারা যে কোথায় রইল তাই বা কে জানে? ওদের খোঁজই বা পাব কী করে?'

বিজন বলল, 'আর ওইসব ভেবে কোনো লাভ নেই। এখন আবার পথ চলা শুরু করো। না হলে এখানে সাপে কাটবে।'

অতএব জঙ্গলের পথ ধরেই চলা শুরু করল ওরা।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় একটু আলোর রেখা দেখতে পেল।

পদ্ম বলল, 'মনে হয় বাকি রাতটুকুর জন্য ওখানেও একটু আশ্রয় পেতে পারি আমরা।'

বিজন বলল, 'কিন্তু ওটাও যদি ডাকাতের ঘাঁটি হয়?'

লক্ষ্মী তখন কাঁদতে শুরু করেছে।

বিজন বলল, 'তোমার গায়ে যা গয়নাগাটি আছে সব খুলে ফেলো।

BanglaBook.org

অর্ধেক পদ্মকে দিয়ে অর্ধেক তোমার আঁচলে বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে রাখো। আর এখানেই একটু লুকিয়ে থাকো তোমরা। আমি কাছে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী!

পদ্ম ও লক্ষ্মীকে রেখে বিজন ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সেই আলো লক্ষ করে। কিন্তু আশ্চর্য! যত এগোয় আলো যেন ততই দূরে সরে যায়। আর কেবলই মনে হয় ওর পিছে পিছে পাতা মাড়িয়ে কেউ যেন আসছে। এইভাবে অনেকটা পথ যাবার পর একটি ভাঙা মন্দিরে এসে পৌঁছল ও।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। চারদিক সুনসান। মাঝেমধ্যে দু'একটা রাতচরা পাখি ও প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। মন্দিরের এক কোণে দেওয়ালগিরিতে একটি প্রদীপ জ্বলছে। মাটির প্রদীপ। কিন্তু কেউ কোথাও তো নেই। সবচেয়ে বড় কথা মন্দিরে কোনো বিগ্রহই নেই।

বিজনের এবার কেমন যেন ভয় ভয় করল। ও বেশ বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনো ডাকাতের দল ওঁত পেতে বসে আছে মন্দিরের আশপাশে জঙ্গলের গভীরে। হয়তো বা ওরা দূর থেকেই ওকে লক্ষ করে গা আড়াল দিয়েছে। একটু পরেই স্বমূর্তি ধরবে। কিন্তু তাই বা কী করে হয়? ও তো একা। ওরা ওকে দেখে আত্মগোপনই বা করবে কেন? আর এত রাতে কে-ই বা আসবে এখানে যে ডাকাতরা তার সবকিছু কেড়েকুড়ে নিয়ে প্রাণহানি ঘটানোর জন্য অপেক্ষা করবে এখানে?

কেমন যেন আশ্চর্য লাগল বিজনের। রেড়ির তেলভর্তি প্রদীপ সমানে জ্বলছে। মাঝে মাঝে বাতাস ঘরে ঢুকলেও শিখা কাঁপছে না। ও কি তবে ভুল করে কোনো কাপালিকের ডেরায় এসে পৌঁছেছে? কেমন যেন একটা জমাট বাঁধা রহস্য খেলা করছে ওখানে। হঠাৎ কিছু মানুষের চাপা কান্নার শব্দ ওর কানে এল। হাড়হিম করা ভয় এবার পেয়ে বসল ওকে। ও ধীর পদক্ষেপে মন্দির থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই শুনতে পেল, 'এখনই না। একটু অপেক্ষা করো।'

বিজন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে আপনি?'

'আমার স্বরূপ পরে জানবে।'

বিজন তখন আরও ভয় পেয়েছে। ও বার বার মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল কেন যে পরোপকার করতে পুরী থেকে অসময়ে বিদায়

BanglaBook.org

নিল। ওখানে থাকলে এমন বিপদের মুখে পড়তেই হত না ওকে। অথচ যাদের জন্য নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল তারাই ছত্রভঙ্গ হল। শুধু পদ্মর মুখ চেয়েই ও এসেছিল। সেই পদ্মই এখন লক্ষ্মীকে নিয়ে বনের মধ্যে কী করছে তা কে জানে?

এমনই ভয় পেয়েছে বিজন যে ওর এখন নড়াচড়ারও শক্তি নেই। চোর ডাকাত যে কেউ হোক না কেন সামনাসামনি দেখলে তবু একটা ধারণা হয় কিন্তু যাকে চোখে দেখা যায় না তার এই অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বরই যে ওকে ভাবিয়ে তুলছে।

আবার সেই খস খস শব্দ। ভিজে মাটি, ভিজে পাতা। এতেও খস খস শব্দ হয় কী করে? পদশব্দ ক্রমশ কাছের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

শুনতে পেল, 'যা ভেতরে যা।'

বিজন বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখল পদ্ম ও লক্ষ্মী সহোদর বোনের মতো দুজনের হাত ধরে ভেতরে ঢুকল। লক্ষ্মী ওর কথামতো নিরাভরণ।

বিজন অস্ফুটে বলল, 'তোমরা!'

'হ্যাঁ আমরা। আপনিই তো আমাদের ডাকার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন।'

'আমি? কই ন্-না তো।'

এমন সময় আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কোনো ভয় নেই। আমিই ওদের ডাকিয়ে এনেছি। পাশে মায়ের ঘরে গিয়ে বসো।'

মায়ের ঘর! এখানে তো কিছুই নেই। একমাত্র সত্য যা ওরা দেখতে পাচ্ছে তা ওই প্রদীপ শিখাটুকু।

বিজন বলল, 'মায়ের ঘর কোথায়?'

এর কোনো উত্তর এল না। শুধু প্রদীপের শিখাটুকু আরও উজ্জ্বল হয়ে ভাঙা মন্দির আলোয় ভরিয়ে দিল।

বিজন এদিক সেদিক তাকিয়েই দেখল মন্দিরের ভাঙা দালানের একপাশে এক উগ্রকালীর মূর্তি। পদ্ম ও লক্ষ্মীকে নিয়ে সেখানে প্রণাম করতেই সেই অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল, 'আজকের রাতটা তোমরা এখানেই থাকো। এই মহানিশার রাত পার হলে তবেই তোমরা যেয়ো। আকাশ পরিষ্কার হওয়ার আগে মন্দিরের বাইরে তোমরা পা রেখো না।'

BanglaBook.org

একথা শোনার পর তিনজনেই তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

কতক্ষণ যে বসেছিল ওরা তা ওদের মনে নেই, হঠাৎ করেই বাইরে কয়েকটা মশালের আলো দেখে আবার কেঁপে উঠল ওদের বুক। ওরা বেশ বুঝতে পারল সেই অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর স্রেফ ছলনা ছাড়া কিছু নয়। ছল করে ওদের এখানে আটকে রেখেছে। তাছাড়া অলৌকিকত্বও আছে এই মন্দিরের ভেতরে। ভাঙাচোরা এই মন্দিরে প্রদীপই বা জ্বালাল কে? যেখানে এই মন্দিরে কোনো দেবদেবীর অস্তিত্ব ছিল না সেখানে হঠাৎ করে উগ্রকালীর মূর্তিই বা প্রকট হল কী করে?

বিজন তখন পদ্ম ও লক্ষ্মীর দুটো হাত শক্ত করে ধরে পিছনের ভাঙা দরজার দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু খানিক এসেই থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল এক কৌপীনধারী ব্রাহ্মণ যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে একভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্রাহ্মণ বললেন, 'বললাম না সকাল না হওয়ার আগে তোমরা যাবে না।'

বিজন বলল, 'আপনি কে?'

'এখনো সেই একই প্রশ্ন? যাও গিয়ে মায়ের সামনে বসো। সময় হলে আমিই তোমাদের যেতে বলব।' বলেই মিলিয়ে গেলেন যুবক।

এদের তো তখন মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা।

ওদিকে সেই মশালধারীরা এক এক করে ভেতরে ঢুকল। একজন মাথা হেঁট করে বলল, 'আমরা ডাকাত। আমাদের প্রাণে মায়াদয়া নেই। তোমরা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলে। বুদ্ধি করে পালিয়ে না এলে রাতেই তোমরা খুন হতে। আমরা তোমাদের ধরব বলে খানিক এগোতেই এক ভয়ংকর মূর্তির জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে পিছু হটলাম। তাঁর কড়া গলায় আদেশ হল তোমাদের সবকিছু ফিরিয়ে দিতে। পরে উনিই আমাদের জানিয়ে দিলেন তোমরা এখানে আছ বলে। নাও তোমাদের ফেলে আসা ব্যাগ সুটকেস ফেরত নাও।'

ওরা সবকিছু ফিরে পেয়ে দারুণ খুশি হল।

ডাকাতরা বিদায় নেওয়ার পরও ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটল না। কে

BanglaBook.org

সেই ব্রাহ্মণ যিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওদের এভাবে রক্ষা করলেন? তবে তাঁর দিক থেকে যে কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই এটা বুঝেই ওরা নিশ্চিন্ত হল।

দেখতে দেখতে মহানিশার অবসান হল। ভোরের পাখিরা গান গেয়ে উঠল গাছের ডালে ডালে। প্রদীপের আলোও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। সেই কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'এবার তোমরা যেতে পারো।'

বিজন বলল, 'আমরা যাব। কিন্তু তার আগে একবার বলুন আপনি কে?'

'আমি শরীরী নই। একবার আমি দেখা দিয়েছি। বারবার দিই না। আমার ছায়াশরীর আর একবার না দেখাই ভালো। এই ভাঙা মন্দির এককালে ছিল এক কাপালিকের আস্তানা। বহু নিরীহ মানুষ বলি হয়েছে তার খড়্গাঘাতে। সেই কাপালিককেও আমি ভয় দেখিয়ে দম বন্ধ করে মেরেছি। এখন আমি ওইসব হতভাগ্যদের মৃত আত্মার দেখাশোনা করি। তোমরা এই মন্দিরের পিছনদিকের পথ ধরে কিছুটা গেলেই একটা খাল পাবে। তাতে জল বেশি নেই। খাল পার হলেই আমার মায়াপ্রভাবে দুদিনের পথ অল্পক্ষণেই পৌঁছে যাবে তোমরা। এবারে রওনা হও। আর কোনো ভয় নেই তোমাদের।'

তিনজনেই জোড় হাত করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে রওনা হল। পথ চলতে চলতে মনে হল যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে ওরা। সূর্যোদয়ের আগেই প্রথমে লক্ষ্মীর বাপের বাড়ি পৌঁছল ওরা। পরে ওদেরই সাহায্য নিয়ে ইন্দবিলে। পদ্মদের ওখানে এক রাত কাটিয়ে বিজন ফিরে এল ওর নিজের দেশে। এই ঘটনার দু'বছর পরে পদ্মকে বিয়ে করে সুখী হয়েছিল বিজন।

BanglaBook.org

# হত্যাকাণ্ড

## অমর মিত্র

আসলে ছাপোষা কেরানি হলেই ভালো হত আমার। পুলিশে আমি অযোগ্য। ট্রেনিংয়ে কত খিস্তি খেয়েছি। একবার প্যান্ট খুলে দেখাতে হয়েছে আসলে আমি সত্যিকারের পুরুষ কি না। আমি টের পাই আমার ভিতরটা নরম। আমি ছেলেবেলায় কারোর গায়ে হাত দিইনি। মার খেয়ে ফিরেছি, কিন্তু মার দেওয়ার কথা ভাবিনি কখনো। হাতই উঠত না। আমার সহপাঠীরা ইচ্ছে করেই আমায় মারত। মেরে হে হে করে হাসত। আমি

একটু ভীতু প্রকৃতিরই। অন্ধকারে আমার ভয় ছিল, নির্জনতায় আমার ভয় ছিল, বোশেখ-জষ্টির লম্বা দুপুরে, খা খা দুপুরে আমার ভয় ছিল। একবার সেই লম্বা দুপুরে আমরা তিন বন্ধু যাচ্ছিলাম ইছামতী দেখতে। ইছামতীর ওপারে তখন পূর্বপাকিস্তান। আর কয়েকবছর বাদেই তা বাংলাদেশ হয়ে গেল। বন্ধুরা আমাকে ফেলে আচমকা অন্যদিকে ছুটল। আর আমাকে এসে জেরা করতে লাগল রাইফেলধারী এক সীমান্তরক্ষী। আমাকে হিন্দিতে কী সব জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। কেউ কোথাও নেই। সামনে নদী। নদীর ওপারে অন্য দেশ। উফ্‌ফ্‌, লোকটা আমাকে বলল, নাঙ্গা হ।

আমাকে ল্যাংটো করে দিয়ে লোকটা বলল, যা ভাগ!

এই ছিল সেই লোকটার মজা। আমি খুব রোগা ছিলাম, হাঁড়-পাঁজরা দেখা যেত সারা গায়ের। তাই আমাকে খুব পছন্দ হয়নি মোচওয়ালা সেই বিহারি রাইফেলধারীর। আমি চুপ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে থাকলাম। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে হু হু করে। ভয়ে আমি কুঁকড়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছি। শুনেছি এই সব পুলিশরা তাদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে আমাকে দলাই মলাই করবে। ১৪-১৫র ছেলে ওদের খুব পছন্দ। আমার ইস্কুলের দুই বন্ধু গুণেন আর নিমাই আমাকে নিয়ে এসেছিল ওই কাজটি করাতে। সীমান্ত পুলিশের জন্য ইস্কুলের ছেলে ভেট আনে তারা। বিনিময়ে পয়সা পায়। কিন্তু আমার কিছুই পছন্দ হয়নি তার। সারাক্ষণ ল্যাংটো করে রেখে নিজের ডিউটি করতে লাগল। তারপর প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে জামা আর হাফ প্যান্ট পরতে হুকুম দিল। আমি জামা প্যান্ট পরে সারাটা পথ একা ফিরলাম। সারাটা পথ আমার মনে হতে লাগল, সবাই দেখছে আমাকে। অথচ সেই পথ ছিল জনশূন্য। অনেকটাই বিল জমিনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। বৈশাখের দুপুরে ধা ধা কোটা মাঠ হা হা করছিল আকাশের দিকে চেয়ে।

পরদিন নিমাই আর গুণেন খিক খিক করতে লাগল। শাসাতে লাগল, কাউকে যদি বলি, ইস্কুলের ভিতরই তারা আমার প্যান্ট খুলে দেবে। আর তা নিয়ে ভয় দেখাত প্রায়ই। আমার রোগা শরীরে জামা প্যান্ট ঢলঢল করত। নিমাই ক্লাসের ভিতরেই হাফ প্যান্টের তলায় হাত গলিয়ে দিত আচমকা। তারপর হা হা হাসি।

BanglaBook.org

আমার খুব ভয়। ছেলেবেলায় মেঘ ডাকলে ভয় পেতাম। রাত হলে বারান্দায় একা থাকতে পারতাম না। আমাদের গ্রামে তখন ইলেকট্রিক ছিল না। হেরিকেনের আলোয় ঘরের দেওয়ালে মস্ত ছায়া, তেল ফুরোলে দপ করে আলো নিভে যাওয়া আমার শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত বইয়ে দিত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারে কত কিছু দেখতে পেতাম। মনে হত অশরীরী কেউ আমার গায়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি কুঁকড়ে থাকতাম। রাতে প্রস্রাব পেলে হত বিপদ। তখন কাউকে না কাউকে ডাকতে হত। সমস্তটা মনে পড়ে এখন। সেই ফিকে জোছনা রাত। একরাতে আমি একা পার হচ্ছি উঠোন। বারান্দায় খুড়তুতো ভাই দাঁড়িয়ে। উঠোনের পুবদিকে কামিনী ফুলের গাছের ছায়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে। চাঁদ পিছনে। আমার ছায়া আমার আগে আগে চলেছে। সে যেন আমার নয় অন্য কারোর অন্ধকার। সামনে দূরে কলাগাছের ঝাড়। সেখানে সাদা কাপড় পরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে। যার অন্ধকার আমার আগে আগে চলছিল, সে যেন হাত রাখল আমার কাঁধে। হিমশীতল স্পর্শ। ভয়ে আমি পড়ে গেলাম উঠোনে। তারপর আমি আর কিছু জানি না।

## দুই

আমি সেই গোলোকবিহারী কুণ্ডু। আমি হয়েছিলাম পুলিশের দারোগা। খুব সহজে চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম। স্বাস্থ্য, রেজাল্ট আর পরিশ্রমের ক্ষমতা আমাকে চাকরিটা দিয়েছিল। ছেলেবেলার গোলোক আর বড়বেলার গোলোক এক নয়। সেই নিমাই করে গরুর দালালি। তাতে সে পয়সা করেছে। গরু পাচারও করে। মানে তাদের সাহায্য করে। তবে হাজত খেটেছে কয়েকবার। গুণেন একটা দোকান করেছে বাজারে। পুঁজি-পাটা তেমন নেই, তার সেই চেহারা একেবারে দুমড়ে গেছে। আমার বাড়ি এখন কলকাতার গায়ে, এয়ারপোর্টের নিকটে ফ্ল্যাট। লোন নিয়ে কিনেছি। আমার বউ ইস্কুলে পড়ায়। আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার বড়বাবু। কলকাতার কাছেই। আমি ঘুষ খাই না। আমার এই স্বভাব পুলিশে অনেকের আছে, আবার অনেকের নেই। মৃদু গলায় কথা বলি। আমার উপরওয়ালা আমার উপর অখুশি। আমি তাঁর কাছে মাস গেলে ভেট দিয়ে আসি না। কিন্তু এই কাজটি করে আমার অধঃস্তন এ.এস.আই.। সে-ই টাকা তোলে, আমাকে বাদ দিয়ে টাকা ভাগ

BanglaBook.org

করে। সদরে গিয়ে দিয়ে আসে বড় সায়েব, মেজ সায়েবকে। আমি তাকে নিবৃত্ত করতে পারি না। করার উপায় নেই। বয়স পেরিয়ে গেছে, এখন আর অন্য চাকরি পাব না। আমি থানার লাগোয়া কোয়ার্টারে থাকি। সপ্তাহান্তে বাড়ি যাই। আমাদের গ্রামের বাড়ি আর নেই। দুই শরিকে বেচে দিয়েছে। আমাদের অংশ দখল করে আছে গাঁয়ের এক গরিব জামাই, সুবল মণ্ডল। আমি পুলিশে চাকরি পাওয়ার পর সে কলকাতায় আমাদের ভাড়াটে বাড়িতে এসেছিল এক ঝুড়ি আম নিয়ে। আমি তাকে বলেছিলাম, বাড়িটা ছেড়ে দিতে। সেই আধবুড়ো লোকটা, যার চার মেয়ের পর এক ছেলে, আমার পায়ে পড়ে গিয়েছিল। হুজুর, জানি আপনি তুলে দিতে পারেন, কিন্তু আমি যাব কোথায়, আপনার বাবা থাকতে দিয়ে গিয়েছিলেন এই অংশটায়, তিনি ভগবান, আমার তখন উপায় ছিল না। স্যার, আপনার পা চেটে আমি ধুলো পরিষ্কার করে দিতে পারি, আমার মাথায় বুট পরা পা রাখুন, কিন্তু নিরাশ্রয় করবেন না।

করিনি। আগে লোকটা আমাকে নাম ধরেই ডাকত, এখন গোলোকভাই বলে। পুলিশি উর্দিই তার সম্ভাষণ বদলে দিয়েছিল। সে খবর পেয়েছিল নিমাইয়ের কাছ থেকে। নিমাই, গুণেন আমার খোঁজ রাখত। আমি পুলিশে চাকরি পেলে গুণেন চিঠি লিখেছিল, মোদের গরব মোদের আশা, গোলোক ভাই আমাদের ভুলো না, আমরা জানিতাম তুমি এমন হইবে।

চিঠির জবাব দেওয়ার সময় হয়নি আমার। জামাই লোকটাকে বলেছিলাম, থাকো, কিন্তু আস্তানা করে নাও, এভাবে চলে না।

বেশ ভালোই চলছিল জীবন। বড় সায়েব পছন্দ করে না, কিন্তু নিজের প্রাপ্য পেয়ে যাচ্ছিলেন বলে, কিছু বলতেন না। এক সন্ধ্যার পর বড় সায়েব এলেন, বললেন, একটাকে তোলা হবে, রঘু মিদ্দে, তুমি জানো মি. কুণ্ডু?

না স্যার, কে সে?

অটো চালায়, রিপোর্ট পেয়ে এসেছি, একটা মেয়ে, প্যাসেঞ্জার ছিল, তাকে মোলেস্ট করেছে পরশু, বলেছে তুলে নিয়ে রেপ করে দেবে।

আমার কাছে তো রিপোর্ট নেই।

থানায় বসে থাকলে হবে, আমার কাছে রিপোর্ট আছে, মেয়েটার বাবা গিয়েছিল আজ সদরে অ্যান্ড হি সাবমিটেড আ পিটিশন।

কিছুই জানি না আমি, অথচ স্যার সব জেনে গেলেন। লোকটা পাকা

BanglaBook.org

ক্রিমিনাল। ওর জন্য স্কুল-কলেজের মেয়েরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। একটা রেপ কেস ঘটে গেলে মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বে। বলতে বলতে স্যার এ.এস.আই.-কে বললেন, তুলে আনো মাইতি, আমি দেখব ওকে।

ইয়েস স্যার। মাইতি বলল, নিয়ে আসছি স্যার।

বড় সায়েব বললেন, ওসিকে নিয়ে যাও, কুণ্ডু তুমিও যাও।

বড় সায়েব অনিন্দ্য সেনগুপ্ত আমার চেয়ে বছর পাঁচের ছোট। আমি পঁয়ত্রিশ, উনি তিরিশ। আই.পি.এস.। পদমর্যাদায় অনেক উঁচুতে তাই নাম ধরে ডাকাই দস্তুর। একজন পঞ্চাশের উপর এ.এস.আই. আছেন এই থানায়, প্রোমোশনে ওই অবধি চালা। তাঁকে তুই তোকারিই করেন সেনগুপ্ত সায়েব। তিনি চুপ করে শোনেন। আমাকে বলেন, খুব ভয় করে বড় সায়েবকে।

কেন করে ভয়? আমি জিজ্ঞেস করেও কোনো জবাব পাইনি। আমরা অন্ধকারে বের হয়েছি। আমি মাইতিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে বলুন তো।

মাইতি বলল, স্যার জানেন।

কোথায় পাবে তাকে?

বাড়ি থেকে তুলব, সন্ধের পর এ লাইনে লোক কমে যায়, ছেলেটাও গাড়ি গ্যারেজ করে দেয়।

ওর বাড়ি জানো তুমি?

জানি, চার নম্বর বস্তিতে। মাইতি বলল, শুয়ারের বাচ্চাটাকে তুলে একটু সাইজ করে ছেড়ে দেবে স্যার।

আমি একটু ভয় পেলাম। বড় সায়েব অনিন্দ্য সেনগুপ্তর একটু আসামী পেটানোর অভ্যেস আছে। মাইতি কিছু ভাঙছিল না। পরে বুঝেছিলাম সেই রঘু মিদ্দের গোলমাল ছিল মাইতির সঙ্গে। সে ঠিক মতো মাসোহারা দেয় না। অটো ভেঙে দেবে ঠিক করেছিল মাইতি। কিন্তু সায়েবের সাইজ করার ইচ্ছে জেনে সে রঘু মিদ্দেকে তাঁর হাতে তুলে দেব ঠিক করেছিল। সাহেব সাইজ করার জন্যই বসে আছেন থানায়। সেই রাতে রঘু মিদ্দেকে তোলা হয়েছিল। ওসি নিজে তুলেছিল। ওসি মানে গোলোক কুণ্ডু। আমি। মাইতি বলেছিল, থানায় যেতে, ওসি নিজে এসেছে।

আমার কাছে একটি বয়স্ক লোক এসে দাঁড়িয়েছিল। সে রঘুর বাবা।

BanglaBook.org

ক্ষীণ স্বাস্থ্য, ন্যুব্জদেহী সেই লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার ও কী করেছে?

আমি কিছুই বলতে পারিনি। সত্যিই তো, সে কী করেছে? আমি তাকে তুলতে এসেছি, কিন্তু জানি না কেন তুলছি। আমি মাইতিকে বললাম, থাক।

মাইতি বলল, থাকবে না স্যার, সায়েব বসে আছেন।

আমি না পেরে বললাম, কেন তুলব তা জানি না কেন আমি?

মাইতি বলল, শয়তানটার শিক্ষা দরকার, অটোওয়ালাদের দিয়ে রাস্তা অবরোধ করিয়েছে কতবার, ও অটো লিডার।

আমি চুপ করে গেলাম। সেই ছেলেটাকে মাইতি হাত কড়া পরিয়েই নিয়ে এল। কোনো অভিযোগ নেই, এফ. আই. আর. নেই, অথচ তাকে তোলা হল। সে মাথা তুলেই এল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, যা জিজ্ঞেস করার এখেনে কি হত না স্যার।

না, এস.পি. সায়েব থানায় আছেন, যা বলার তা বলবি তাকে। মাইতি বলেছিল। মাইতির ওই কথাটা অন্ধকারে দাঁড়ানো ছায়া ছায়া মানুষগুলো শুনেছিল। শুধু ওই কথাটা আমাকে বাঁচাতে পারে, তা পরে বুঝেছিলাম।

BanglaBook.org

## তিন

স্যারের গাড়ির ড্রাইভারের নাম পল্টন। লোকটা আসলে কনস্টেবল। ছ'ফুট লম্বা। তেমনি স্বাস্থ্য। সেই রঘু মিদ্দেকে থানা হাজতে পুরে পল্টনকে সাইজ করতে বলল সায়েব। তিনি টেলিভিশনে হ্যান্ডবল খেলা দেখছিলেন। সমর্থ সমর্থ মানুষজন বল কাড়াকাড়ি করছে। আমি থানার বাইরের ঘরে বসে আছি। কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। স্যার আমার ঘরে। ঘরে বসেই হাজত দেখা যায়। সিগারেট জ্বলছে। স্যারের পিছনে মাইতি দাঁড়িয়ে। লস্কর আমার থেকে দূরে একটি চেয়ারে। আর্তনাদ কানে আসছিল। গর্জন করছিল পল্টন। আমি ছুটে স্যারের কাছে গেলাম, বন্ধ করুন স্যার।

ইউ, বাস্টারড্, বাইরে গিয়ে বোস।

স্যার, ওর নামে কোনো এফ.আই.আর. নেই।

স্যার আমার দিকে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকালেন। মাইতি পিছন থেকে ইঙ্গিত করে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলল। আমি হাজতের দিকে তাকালাম, লোকটা

চিত হয়ে পড়ে আছে, তার বুকের উপর বুটপরা পা তুলে দিয়েছে পল্টন। শীর্ণকায় যুবক একদিকে মাথা কাত করে শ্বাস নিচ্ছে। পল্টনের হাতের রুল ঘুরছে। পল্টন রুল নামাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বললাম, প্লিজ স্যার, পল্টনকে থামতে বলুন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে পল্টন রুল নামিয়ে আনল। আমি চোখ বুজলাম। মরণ কান্না শুনছিলাম। আমি কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে গেছি। কিন্তু সেই আর্তনাদ বাইরে বসেও শুনতে পাচ্ছিলাম। লস্কর আমাকে বলল, ভয় করছে স্যার, লোকটা মরে যাবে।

আমি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিলাম। শুনেছি মানুষ পেটানো দেখা স্যারের একটা নেশা। কিন্তু তা তো শোনা কথাই ছিল। প্রত্যক্ষ করছি। স্যারের ফ্যামিলি আই.পি.এস. ও আই.এ.এস.। স্যারের শ্বশুর দিল্লিতে আছেন। ক্যাবিনেট সচিব। স্যারের স্ত্রী আই.আর.এস.। ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস। উচ্চবংশ জাত। স্যার এইচ.এস.-এ তৃতীয় হয়েছিলেন। মেধাবী। আমি ফার্স্ট ডিভিশন। স্টার হয়নি। অনেক পরীক্ষা দিয়ে এস.আই.-এর চাকরি। আশা আছে, প্রমোশনে একটু উঁচুতে উঠব।

আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এল। থেমে গেল। বেরিয়ে এসেছে পল্টন। সায়েবের ঘর থেকে ছুটে এল মাইতি, বলল, হাসপাতালে পাঠাতে হবে স্যার, একটু বেশি হয়ে গেছে।

সেই রাতের কথা মনে পড়ে। নিঃশব্দে সায়েব বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম বাইরে গাছতলায় জনাচারেক লোক। তারা সে রঘুর বস্তির লোক। আমি লস্করকে বললাম, এখন কী হবে, স্যার চলে গেলেন।

লস্কর বলল, পল্টন এর আগে একবার মানুষ মেরেছিল স্যার, আমি জানি, প্রমাণ হয়নি তাই।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমাকে পালাতে হয়েছিল। লোকটাকে হাসপাতাল মৃত ঘোষণা করেছিল। ডেড বডিই আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই লোকগুলো আমাদের পিছু পিছু হাসপাতালে গিয়েছিল। আমাকে মাইতি বলেছিল, বেশি হয়ে গেল, কিন্তু আপনি তুলেছেন স্যার, আমি আপনার অর্ডার পালন করেছি।

এই সব কথা সমস্ত রাত ধরে হয়েছিল। থানা কাস্টডিতে লোকটা মরে

BanglaBook.org

গেছে। লোকটাকে ওসি তুলেছিল। লস্কর আমাকে বলল, আপনি ফেঁসে গেলেন স্যার।

কেন, আমি তো কিছু করিনি।

আপনার হেফাজতে ঘটেছে। বলল লস্কর।

মাইতি চুপ করে ছিল। লোকটার সঙ্গে মাইতির গোলমাল ছিল টাকা পয়সা লেনদেন নিয়ে। মাইতি ওকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। বড় সায়েব এটাতে আনন্দ পান। মানে মানুষের আর্তনাদে। তিনি সমস্তক্ষণ পল্টনের হাত আর পায়ের কাজ দেখে গেছেন। সঙ্গে সিগারেট। সঙ্গে টিভিতে মেয়েদের টেনিস। শর্ট ড্রেস পরা সুন্দরীদের খেলা আর শরীরের নানা বিভঙ্গ।

হ্যাঁ, এরপর আমি বাধ্যতামূলক ছুটিতে ছিলাম। মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লস্কর কোনো কথা বলার সাহস পায়নি। মাইতি তাকে শাসিয়েছিল। বড় সায়েব বলে দিয়েছেন মুখ না খুলতে। সায়েব বদলি হয়ে অন্য জেলায় চলে গিয়েছিলেন। কোর্ট থেকে ওসির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছিল। আর সেই পরোয়ানার কথা লস্কর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, পালান স্যার, আপনার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছে।

আমি পালিয়ে গেলাম। বাড়িতে কেউ বিশ্বাস করল না ঘটনা আমি ঘটাইনি। আমি বিনা কারণে একটা মানুষ মেরেছি। ডিপার্টমেন্ট কেস ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে সেই রঘুর বাবা একটি পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল ছেলের মৃত্যুর কথা জানিয়ে। সেই পোস্টকার্ডকে পিটিশন গণ্য করে চাপা পড়া খুনের মামলা চালু হয়ে গেল। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার স্ত্রীই বলেছিল চলে যেতে, সে চারদিক থেকে নানা কথা শুনতে পাচ্ছে। বিশ্বাস করেনি যে আমি জড়িত নই। বিনা অপরাধে লোকটাকে আমি পিটিয়ে মেরেছি। আমি কী ভয়ানক এক মানুষ।

কোথায় যাব? লস্করের দেশের বাড়ি মেদিনীপুর কয়েকদিন। তারপর সেখান থেকে চলে আসতে হল। টিভিতে টক শো। আমার ছবি। লস্করের বাড়ির লোকই বলল, চলে যেতে। আমি যাব কোথায়? শীতকাল। চাদরে মুখ ঢেকে আমাদের সেই পৈতৃক বাড়ি। গাঁয়ের জামাই সুবল মণ্ডল যেন ভূত দেখল। লোকটা বলল, পালিয়ে বেড়াচ্ছ, একেই বলে ভগবানের মার, আমি তোমার পায়ে পড়ে গিয়েছিলাম গোলোক।

BanglaBook.org

সম্ভাষণ বদল হয়ে গেছে। আমি বললাম, কদিন থাকব আমি সুবলদা।

একদম না, এক রাত্তিরও না, খুনেকে আশ্রয় দিয়ে শেষে আমি মরি, যাও বেরিয়ে যাও।

শীতের রাতে আমি একা গাঁয়ের ভিতরে হাঁটছি। ঘুমিয়ে পড়েছে সব। আমি খুঁজে বের করেছি নিমাইদের সেই ভেঙে পড়া পুরোনো দালান। চাপা গলায় ডাকছি। কুকুরের ঘুম ভেঙে গেছে। পাঁচটা কুকুর ভীষণ চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে আমাকে ঘিরে। কে কে, বলতে বলতে একটা আধবুড়ো লোক বেরিয়ে এসেছে। টর্চের আলো পড়েছে আমার মুখে। আমি ডেকে উঠেছি, নিমাই, আমি গোলোক।

তুই, তুই খুন করেছিস, তোকে তো পুলিশ খুঁজছে।

আমি না নিমাই, আমি না।

তুই না মানে, টিভিতে আজ সন্ধেয় দেখাল। নিমাই বলল, তুই যা গোলোক, শালা মানুষ মারতে পারলি, যা এখেন থেকে।

স্যার, আপনার নামে আঁচড় পড়ল না, আমার কোনো জায়গা নেই। স্যার। আমি সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিমাই-এর সামনেই মোবাইল থেকে ফোন করলাম, স্যার আমি গোলোক বলছি, আমি কিছু করিনি কিন্তু আমার গায়ে রক্ত লাগল, আমাকে বাঁচান স্যার।

ওপার থেকে ফোন কেটে দিল কেউ। নিমাই নেমে এসে আমার গালে একটা চড় মারল, ঘেন্না, গাঁয়ের নাম ডুবুলি গোলোক, যা চলে যা।

আমি আবার ফোন করলাম মাইতিকে, সে ধরল, বলল, তুমি সারেন্ডার কোরো না, পুলিশ তোমায় ধরবেও না।

না মাইতি, আমি এখানকার থানায় যাচ্ছি, সুকুমার বোস ওসি।

মাইতি বলল, তুমি কিন্তু জামিন পাবে না, তোমার বিপক্ষে সব, পক্ষে কোনো সবুদ নেই গোলোকদা।

আমি বললাম, আমি বলব সব।

কী বলবে?

তুমি আর সায়েব, তুমি তো সেখেনে বলেছিলে, সায়েব জেরা করবে, ওরা তা বলবে, মাইতি আমি সারেন্ডার করব আজ রাতেই।

ওরা কারা? মাইতির গলা কাঁপল।

BanglaBook.org

রঘু মিদ্দের বাবা কাকারা, আমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। আমি মিথ্যে বললাম। না বলে উপায় নেই।

মাইতি বলল, প্লিজ, না, তোমায় পুলিশ অ্যাবসকন্ড দেখাবে, দু-চার বছর বাদে সবাই ভুলে যাবে, তুমি চাকরি ফিরে পাবে।

না মাইতি, আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, ওরাই বলেছে আমাকে সারেন্ডার করতে, ওরা জানে আমি করিনি, বাইরের ঘরে বসেছিলাম সারাক্ষণ, ওরা তা দেখেছে সেই রাতে, মাইতি আমি যাচ্ছি থানায়।

মাইতি আর্তনাদ করে ওঠে, না গোলোকদা না।

আমার ভয় এবার মাইতির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি ফোন কেটে দিয়ে হাঁটতে থাকি অন্ধকারে। মাইতি ফোন করেছে। বেজে যাচ্ছে। আমি ধরছি না। ফোন কেটে দিলাম। আবার মাইতি। আবার। আবার।

BanglaBook.org

# জোবের আতঙ্ক

## রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বৈশাখের সবে মাঝামাঝি, এরই ভেতর বেলা বারোটাতে রোদে মাথা ফাটে। গত দিন তিনেক সূর্যের দাপটে ত্রাহি-ত্রাহি রব। হঠাৎ সন্ধের দিকে মেঘ উঠল গড়ের মাঠের মাথায়। তারপর খানিক ঝড়, বজ্রাঘাত আর এক পশলা ভারী বৃষ্টি। প্রাণ জুড়োল মানুষজনের। মাঝরাত পর্যন্ত সদর দরজাটা খুলে রাখি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখে। খানিক পরে হাওয়ার সঙ্গে জোবও ঢুকল ঘরে। ইংল্যান্ডের ঘড়ির কাঁটায় এখনো তার জাগা ও ঘুমোনো। সোয়া তিনশো বছরেও কলকাতার রাত তার কাছে দিন আর কলকাতার দিন হল ইংল্যান্ডের রাত। এমনই আজব জীববিদ্যার ঘড়ি, বায়োলজিক্যাল ক্লক।

জোব ওয়াকিং-স্টিকটা দেয়ালে ঠেকিয়ে কেদারায় বসল। এমন বৃষ্টির পর জোবের তরতাজা হয়ে ওঠার কথা কিন্তু কেমন যেন মনমরা দেখায়। মুখচোখে একটা আতঙ্কের ছাপ। কীসের কী না জানতে চেয়ে চা বসাতে

BanglaBook.org

গেলুম। চা করে এনে দেখি বেশ গুম মেরে আছে। গড়গড়ার নলটি পর্যন্ত ছোঁয়নি। শেষে জিজ্ঞেসই করি, কি হে জোব, কোনো বিপদ হল নাকি?

এবার জোব খানিক নড়ল। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, বিপদ নয়, বিপর্যয়।

আমি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে এক ঘটি জল এনে হাতে দিয়ে বলি, আগে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপর শুনব।

জোব ঘটিটি হাতে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল। মনে হল দীর্ঘ গ্রীষ্ম শেষে বছরের প্রথম আকাশের জল খাচ্ছে বর্ষাঋতু। জল শেষে চায়ে এক চুমুক দিয়ে বলল, গতকাল মাঝরাতে মনে হল গঙ্গাটা খানিক বেয়ে আসি। গরমও কাটবে আর ভাগীরথী তরঙ্গে মনটিও মহানন্দে দুলবে।

আমি হেসে বলি, তোমার দোল খাওয়ার শখ এখনো মিটল না! সেই যে ১৬৯০-এর ঢেউয়ের দোলায় গঙ্গাবক্ষে নাকানিচোবানি খাচ্ছিলে নোঙর করতে, ভুলে গেলে সে কথা!

জোব বলে, দেখো তখন সবে বর্ষা পেরিয়েছে। ভাদ্রের নদী একেবারে কানায়-কানায় ভর্তি। তার ওপর তোমার ওই আকাশ ছিল মোষের মতো কালো মেঘে ঢাকা। জলের স্রোতে যেন বাঘ ডাকছে।

আমি বলি, তুমি জলপথে পাটনা, হুগলী, হিজলী, উলুবেড়িয়া থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত কত জল ভেঙেছ। তা হঠাৎ গতরাতে গঙ্গার দুলুনিতে আতঙ্কিত হলে কেন? দেহের বায়ু বা রক্তের চাপ নয় তো হে?

জোব ইতিমধ্যে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে নলে মুখ ঠেকিয়েছে। টান দিতে গিয়েও থমকে বলল, আমি ১৬৯০-এর আগেও দু'বার এসেছি সুতানুটিতে। তা ধরো ওই সময়ে গঙ্গার বালিচর ছিল আজকের ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট পর্যন্ত।

আমি বলি, তোমার নিশ্চয় মনে আছে জোব, ১৮৪০-এ যখন অ্যাল্যান্ড হোটেল হল এখনকার ওল্ড কোর্ট হাউস আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটের মোড়ে, তখন একতলার ছাদে বসে হাওয়া খেতুম চাঁদনি রাতে।

জোব বলে, তার বছর পঁচিশ পরে নাম বদলে হল দ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল। ওখানে গঙ্গার মাছের কত পদ খেয়েছি বলো।

BanglaBook.org

আমি আরো বছর সতেরো-আঠেরো এগিয়ে বলি, মাছের চেয়েও কাঁকড়ার পদটি আমার বেশি ভালো লাগত। ততদিনে মাল্টিপিল শপ হয়েছে হোটেলের।

জোব বলল, খাওয়ার ব্যাপারে তোমার স্মৃতি চিরকালই বেশ প্রখর দেখছি মুখুজ্যে। তবে আমারও একটি জিনিস বেশ মনে পড়ছে। কত লোক হোটেলের একদিক দিয়ে ঢুকে, জামাকাপড়, বিয়ের উপহার থেকে গাছের বীজ কিনে, কাঁকড়া দিয়ে পেটপুরে পানভোজন করে, বারমেড রাজি থাকলে তার সঙ্গে বিয়ের এনগেজ্‌ড হয়ে বেরোচ্ছে।

আমি বিলাপ করি, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তখন কাঁকড়া ওঠা-নামা করত। শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত গঙ্গার সেই কাঁকড়ার কথা বলেছেন মহেন্দ্রনাথ সরকারকে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' বইয়ে লেখা আছে।

জোব কপাল চাপড়ে বলল, সেই প্রাচীন অষ্টপদ আর মিলবে না মুখুজ্যে। গতকাল রাতে দেখি গঙ্গাটি শুকিয়ে ডাঙা। নৌকা নিয়ে বেরিয়ে শেষে হেঁটে ফিরলুম দক্ষিণেশ্বর থেকে।

আমি অবাক হয়ে বলি, মানে?

জোব আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, হঠাৎ দেখি আমার ডিঙি নামছে। আমি ভাবি এ বুঝি ঢেউয়ের ওঠা-নামা। একসময় দেখি শুধুই নামে, ওঠে না। যেমন কুয়োতে বালতি নামে কিংবা আকাশের চিল ইঁদুরছানা ধরতে মাটিতে নেমে আসে, তেমন কেবল নামা।

আমি ব্যাপারটা সহজ করতে বলি, যেমন বহুতলের লিফ্‌ট নামে।

অনেকক্ষণ পরে জোবের মনে এক চিলতে হাসি দেখি। বলে, ও নামা তো তোমার পড়া না পারলে কান ধরে উঠ-বোস করার মতো। না হে, আমার ডিঙির নামাটা আতঙ্কের কিন্তু তার ভেতরেও একটা ছন্দ ছিল, দোলা ছিল। অবশ্য যখন গঙ্গার তলায় বসে পড়ল তখন নিশ্চল শিবলিঙ্গ।

আমি বলি, তোমার কথা লোকে শুনলে বলে গপ্পো। আবার কেউ বলবে বয়সের দোষ। কাগজে খবর হবে জোবের স্মৃতিভ্রম। কিন্তু আমি জানি, জোব, তোমার কথা ষোল আনা সত্যি।

জোব লণ্ঠনের আলোয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমিও গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে নাকি?

BanglaBook.org

আমি চায়ের কাপ তুলে রান্নাঘরে রেখে এসে বলি, অমন ঘন বৃষ্টির পর জেগে থাকব কেমন করে? আমি তখন গভীর ঘুমে। আমি ১৭৩৪ সালের কথা বলছি। সেবার আশ্বিন মাসে গঙ্গা শুকিয়ে গেল। সেই মাটিতেই পুকুরের পাড়টা বাঁধালাম।

জোব বলল, আমি তখন ছিলুম হিজলীতে। সেই শুকনো গঙ্গা দেখিনি। তবে গঙ্গামাটিতে পোঁতা তোমার পুকুর পাড়ের আম খেয়েছি। আমগুলো সব তালের মাপের আর পাতিলেবুগুলো যেন মুসাম্বি।

জোবের স্মরণে আনতে বলি, গঙ্গা আবার শুকিয়েছিল ১৭৭০ সালে। কলকাতার লোকের চিন্তা নেই গঙ্গা শুকোনোতে। তারা খালুই নিয়ে মাছ ধরতে গেল। সত্যিকারের মেছেল হল কালীঘাটের ব্রহ্মানন্দ হালদার। একটা ঢেঁকিমাপের রুই ধরেছিল। কিন্তু জল শুকোনো নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না তার।

জোব এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, বলো কি! আতঙ্কিত হয়নি, ভয় পায়নি?

আমি হতাশ হয়ে বলি, মাছের আনন্দে মশগুল, ভয় বা আতঙ্কের ছিটেফোঁটা নেই। বলে কিনা যেমন গরমের শুকনো পুকুর বর্ষাকালে ভরে যায় তেমন গঙ্গাও ভরে যাবে। আকাশের জলে না ভরলে সাগর ভরে দেবে।

জোব নলটি কেদারার পাশে রেখে হতাশ স্বরে বলে, কত নদী শুকিয়ে হারিয়ে গেল, কোনো চিন্তা নেই তার। এই যে দু-পা আগে অমন রূপবতী সরস্বতী হারিয়ে গেল!

আমি আতঙ্কের সঙ্গে বলি, গঙ্গা দুবছর আগে শুকিয়েছে, তুমি গত রাতে দেখলে তৃতীয়বার। তিনটি সুযোগের পর এবার যদি গঙ্গা শুকিয়ে যায় বাঙালির গঙ্গাপ্রাপ্তিও যে হবে না জোব! তখন কোনো বিকল্প খুঁজবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রের লেখকেরা?

জোব বলল, বিলাপ অর্থহীন মুখুজ্যে। আর এক পেয়ালা চা খেয়ে বরং সমস্যার কারণ ও সমাধানের পথ খোঁজা হোক।

জোবের অনেক নদী-সাগর অতিক্রমের অভিজ্ঞতা। ওকে ভাবার দায়িত্ব দিয়ে আমি চা করতে গেলুম। চায়ের জল ফোটে আর ওদিকে জোবের গড়গড়াও সবাক হয়। খানিক পরে চা এনে দেখি জোব সত্যিই ভাবছে।

BanglaBook.org

গভীর ভাবনায় চোখ দুটি বন্ধ। তারপর একসময় চোখ খুলে বলে, মুখুজ্যে, তোমার নিশ্চয় মনে আছে চৌরঙ্গীর কাছের পুকুরটা মাঝেমধ্যেই শুকিয়ে যেত। তাই মাটি তুলে খানিক গভীর করতে গিয়ে সারি সারি সুঁদরিগাছের শিকড় পাওয়া গেল।

আমি বলি, এখনো চোখের সামনে ভাসছে হে। তারপর ওই কেল্লার কাছে কুয়ো খোঁড়ার কথা মনে করো। বালি, হলুদ মাটি সরিয়ে আর খানিক খুঁড়তেই ছাঁচিকুমড়োর বিচি, আর আখের পাতা। আর তলাতে যেতে কুকুরের কঙ্কাল, কচ্ছপের খোলা, সুঁদরিগাছের গুঁড়ি, ঝিনুক।

জোব বলল, নীচে সুন্দরবন, ওপরে কলকাতা, ওপরের গঙ্গার জল তলায় চলে যাচ্ছে।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, পেয়ালার চা যেমন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে চলে গেল ঠিক তেমনই গঙ্গাও সময়ে সময়ে অন্তঃপ্রবাহিনী হচ্ছে।

জোব চিন্তিত মুখে বলল, মাঝেমধ্যে হলে ঠিক আছে কিন্তু যদি মাটির তলায় চিরকাল থেকে যায়। ওপর গঙ্গা শুকিয়ে গেল, নীচে জাগল।

আমি বলি, হতেও পারে জোব। ঠাকুরবাড়ি থেকে একটা গানের কলি মাঝেমধ্যে ভেসে আসত—যে নদী মরুপথে হারাল ধারা/জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' মানে মরা নদী আবার বেঁচে উঠতে পারে। তখন কী উপায়?

জোব বলল, উপায় একটাই। গঙ্গা খুঁড়তে হবে, মর্ত থেকে পাতাল পর্যন্ত। তখন ওপরের জল নীচে, নীচের জল ওপরে। মাঝ থেকে লম্বা লম্বা সুঁদরিগাছের গুঁড়ি পেলে আর বাংলা গানের ঝিনুকও মিলে গেল।

আমি হেসে বলি, তুমি যখন ঘরে ঢুকলে তখন তোমার মুখে আতঙ্ক আর এখন কত নতুন নতুন প্রাপ্তি তা থেকে। আসলে একজনের কাছে যা আতঙ্ক তা পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করলেই আনন্দ হে। একবার বর্ষার সময় মাঝরাতে পাশের বাড়ির গোপাল 'কুমির' 'কুমির' বলে বেজায় চেঁচাচ্ছে।

জোব অবাক হয়ে বলল, কুমিরে এত ভয়। তখন তো তোমার আজকের রাজ্যপাল ভবন, টেলিফোন ভবন, রাইটার্সের জায়গায় বালির চরে দশ-বিশটা সব সময় শুয়ে থাকত। চারপাশের জঙ্গল থেকে শেয়ালগুলো মাঝে মাঝে ছেলে পড়ানোর নামে কুমিরের বাচ্চাগুলো কত বড় হল তার খোঁজ নিত। এখনো সে সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

BanglaBook.org

আমি বলি, সে সব দেখতে কিন্তু গোপালের আতঙ্কের কুমির হল ধানঝাড়া পাথরের মতো বিশাল দুটি কাতলা মাছ। অন্ধকারে তাদের কুমির ভেবেছিল। ধরে দিলুম। পরদিন সারা পাড়া জুড়ে আনন্দে খাওয়া হল।

জোব হাত তুলে বলে, আরো অনেক মাছ খাবে শুধু গঙ্গাটা একবার খনন হতে দাও।

কিন্তু কোথায় রাখা হবে সে মাটি আর কী তার ব্যবহার, সে প্রশ্ন মনে জাগল। তুললুম সে কথা। জোব বলল, কেষ্টনগরের গোপাল হয়তো বলত খানিক ছড়িয়ে কেটে ওরই একপাশে রেখে দিতে কিন্তু আমি চাই মাটির ব্যবহার ঠিকঠাক হোক।

আমি বলি, কেমন ঠিকঠাক?

জোব বলল, যেমন ধরো জলদস্যুদের আটকাতে নবাব শায়েস্তা খাঁ মেটিয়া (মৃত্তিকা) দিয়ে দুখানি বুরুজ (কেল্লা) বানালেন। কলকাতায় যে এত থানা, তোমার লালবাজার সমেত, সব ভেঙে গঙ্গামাটিতে তৈরি হোক। থানা তৈরি সংশোধনের কেন্দ্র। সেই মনের সংস্কার পুণ্যসলিলা গঙ্গা মৃত্তিকাতেই ঠিকঠাক হয় হে।

আমি অবাক হয়ে বলি, বড় ভালো ভেবেছ তো। জলদস্যু যদি মাটির কেল্লায় প্রতিরোধ করা যায় তবে সাধারণ অপকর্মে যেন ইঁট-সিমেন্টের গরাদ?' বোধ হয় একারণেই 'ভাঙ ভাঙ কারা' ধ্বনি উঠেছিল চুরুলিয়া গাঁয়ের শাহিপাড়ায়।

জোব বলল, এই হল আতঙ্কের উৎসে সত্যিকারের আঘাত করা।

আমি বলি, তা বুঝলুম কিন্তু তার পরেও তো মাটি থাকবে জোব। তার কী হবে? শেষে যেন গ্রীষ্মে তোলা মাটি বর্ষার জল খেয়ে পাড় থেকে আবার গঙ্গায় না নেমে যায়।

জোব পা-দুটো সামনে ছড়িয়ে বলে, তুমি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতীক, পতাকা, দেখেছ? নাম স্লোগান শুনেছ? সেখানে বারে বারে মাটি-জমির কথা আনে। যেমন কাস্তে, মূল, ধানের শিস, লাঙল, গরু—এইসব।

আমি জোবের যুক্তিটা ধরে ফেলি। ওইসব প্রতীক বা নাম ব্যবহার করলে দলীয় কার্যালয়টি ইঁটের হয় কী করে! কাজেই কার্যালয় হবে মাটির।

BanglaBook.org

জোব বলল, দেন মুখুজ্যে, মাটির বাড়ি যা দিতে পারে ইঁটের বাড়ি পারে না। তাই তোমার সাধক রামপ্রসাদ মাটির বাড়ি আর বাঁশের খুঁটির কথা বলেছেন।

আমি বলি, তুমি যখন কলকাতায় এলে তখন মাটির বাড়িতেই থাকতে। নগর গড়েছ কিন্তু সব ভাবনাই ওই মাটির বাড়িতে। ঠাকুরবাড়ির রুদ্রনাথের গীতাঞ্জলি যখন লেখা হচ্ছে তখন তাঁর বসবাস মাটির 'দেহালি' বাড়িতে।

জোব বলল, মুখুজ্যে তোমাদের মাটির দোতলা বাড়িটিও বেশ। কত গাছপালা চারপাশে। আর দেখো, তোমাদের পাকা মন্দির তিনটে। বট পাকুরের চারায় কেমন ফেটে যাচ্ছে।

ভোরের আলো ফুটছে। আমি জোবকে বলি, সব ইঁটকাঠের বাড়িই ফেটে যাবে জোব। এমনকি তার ভারে পৃথিবীও দুলবে, ফাটবে, ভাঙবে। শেষ সত্য মাটি। কিন্তু অত মাটি গঙ্গা থেকে তুলবে কে?

জোব উঠতে উঠতে বলে, রাজনৈতিক দলের বাড়ির ক্ষেত্রে নেতাকর্মীরা, থানা হলে পুলিশ আর অফিস হলে অফিসের লোকজন।

জোবের লোকের সংখ্যা বাড়াতে বলি, কিছু কবিও পাবে।

জোব অবাক হয়ে বলে, সব ছেড়ে 'কবি' কেন?

আমি দরজার কাছে এসে জোবকে বিদায় জানিয়ে বলি, যারা মাটির কোলের কাছে অ যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

মাদার ডেয়ারির গাড়িগুলি বাদ দিলে কলকাতা তখনো ঘুমে। জোব হাতের লাঠিটি আকাশে নাড়তে নাড়তে চলে। এক জটিল রহস্যের মধ্যে জোব। মুখুজ্যে দু-চার বাক্যের গদ্য লেখে ঠিকই কিন্তু কাব্য-কবিতা তার অধরা। তাহলে কবিটি কে?

জোবের যে আগমন ছিল আতঙ্কময় তাই প্রত্যাবর্তনে রহস্যময়।

BanglaBook.org

# স্পর্শ

## সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

মৃদু ঝাঁকুনি আর প্ল্যাটফর্মের দৃশ্যপট ধীরে সরে যাওয়া, এ.সি. কম্পার্টমেন্টে থাকলে ট্রেন চালু হওয়াটা এরকমই লাগে। যেন অভিজাত সহবত। আভাস মোবাইল বার করে বউকে ফোন করল, এইমাত্র ছাড়ল। রাইট টাইম-ই আছে।

—তোমাদের সবাই এসেছে তো? ওপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল পায়েল।

—এসেছে।

—ছেলের সঙ্গে কথা বলবে?

—পরে বলব।

—আবার কখন ফোন করবে?

—চেন্নাই স্টেশনে নেমে।

—না, রাতে শোওয়ার আগে একবার কোরো। বলার পর একটু থেমে পায়েল বলল, ঠিক আছে, আমিই করে নেব'খন।

—কোরো। বলে ফোন কাটল আভাস।

সাইড লোয়ার বার্থ নিয়েছে সে। লাগোয়া কুপে দলের বাকি পাঁচজন। চারজনের কানেই ফোন। ট্রেন ছাড়ার খবর যে যার বাড়িতে জানাচ্ছে। রঞ্জনাদির কানে ফোন নেই। কারণ, বর সঙ্গেই আছে। বর, অর্থাৎ প্রতাপ রায় ছেলেকে ফোন করে জানাচ্ছেন ট্রেন সময়মতো রওনা হওয়ার খবর।

ছ'বার্থের কুপেটার একটা বার্থ আভাসের নামে ছিল। এখন যে সাইড লোয়ারে বসে আছে, সেটা ছিল এক বৃদ্ধার। উনি আভাসদের রিকোয়েস্ট করলেন, কুপের একটা বার্থ ওঁকে দিতে, ওঁর বার্থটা আভাসরা কেউ নিক। সাইড লোয়ারটা গেটের পাশেই। মহিলার সঙ্গে অনেক ব্যাগপত্তর আছে। কেউ একটা টেনে বেরিয়ে নিয়ে গেলেই হল। সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে ওঁকে। রাতে ঘুমও হবে না।

দলের মধ্যে আভাস সর্বকনিষ্ঠ এবং ইয়াং, বার্থটা স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে তাকেই। আভাসের হাইট বেশ ভালই। লম্বা মানুষের পক্ষে সাইড বার্থ অসুবিধেজনক, পা গুটিয়ে শুতে হয়। তবু আভাসের মনে হচ্ছে দল থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ভালই হয়েছে। নিজের মতো থাকা যাবে। লাগাতার বকবক করতে হবে না।

আভাসদের আজকের এই দলটার কোনো প্রাক্ ইতিহাস নেই। একে অপরকে চেনে ঠিকই, শুধুমাত্র এই ছ'জন মিলে কোথাও আড্ডা মারতে বসা হয়নি কখনো। বেড়াতেও যাওয়া হয়নি কোথাও। এই ট্যুরের শর্তেই প্রথমবার দলটা গঠন হয়েছে। চেন্নাইয়ের একটি বেঙ্গলি ক্লাব ছ'জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করার জন্য। দলে তিনজন

BanglaBook.org

সাহিত্যের, আভাস, রূপময়দা গল্প-উপন্যাস লেখে, ধ্রুবদা কবি। প্রতাপদা, রঞ্জনাদি নাটক-সিনেমায় অভিনয় করেন। টিভি সিরিয়ালেও রঞ্জনাদিকে প্রায় নিয়মিত দেখা যায়। সেইহেতু আভাসের সঙ্গে বার্থ চেঞ্জ করা বৃদ্ধা রঞ্জনাদিকে সহজেই চিনেছেন। মেতে উঠেছেন খোশগল্পে। বৃদ্ধাকে বাকি পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করিয়েছেন রঞ্জনাদি। উনি চিনি চিনি ভাব করে হাসলেন বটে। বোঝাই যাচ্ছিল ফল্‌স্‌ হাসি। মোটেই চিনতে পারেননি। আসলে টিভি সিরিয়াল সাংস্কৃতিক জগৎটাকে পুরো খেয়ে ফেলেছে। এই যে এতটা পথ উজিয়ে আভাসরা প্রোগ্রামটায় যোগ দিতে যাচ্ছে, টাকা-পয়সা খুব অল্পই পাবে। কত পাবে, সেটাও জানায়নি কর্মকর্তারা। বলেছে, আসুন না, দেখি কতটা কী করা যায়।

রঞ্জনাদির জন্য কিন্তু প্লেন ফেয়ার দিতে চেয়েছিল। এছাড়া ভাল অ্যামাউন্টের টাকা তো দেবেই। বরকে ছেড়ে প্লেনে যেতে চায়নি রঞ্জনাদি, সকলের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে ট্রেনে যাওয়াটাই বেছে নিয়েছে।

আভাসও চলেছে অপরের পয়সায় কদিন ছুটি কাটাতে। অফিস, লেখালিখি সংসারের বাজার-হাট, অন্যান্য কাজ নিয়ে জেরবার হয়ে থাকে সারাক্ষণ। বিনা খরচের এই বেড়াতে যাওয়াটা তাই হাতছাড়া করতে চায়নি। জার্নিটাতে বউ-বাচ্চা নেই বলে যেমন একটু খারাপ লাগছে, ভালও যে লাগছে না, তা নয়। ওরা থাকা মানেই একটা অ্যাটেনশন, বাড়তি দায়িত্ব। সেই অর্থে ছুটিটাকে নিরবচ্ছিন্ন বলা যায়। শরীর, মন দুটোই বেশ হাল্কা লাগছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটায় যোগ দেওয়ার পিছনে আর একটা আকর্ষণ বা বলা ভাল তাগিদ আভাসের আছে। যা একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রকাশ্যে জানানোর নয়। চেন্নাইয়ের কর্মকর্তাদের থেকে যখনই শুনেছে রূপময় সরকার এই অনুষ্ঠানে যাবে এবং তাদের সঙ্গে একই ট্রেনে, একই কামরায়, দুবার ভাবেনি। আভাস হ্যাঁ করে দিয়েছে। রূপময় সরকার আভাসের অত্যন্ত প্রিয় গল্পকার, প্রায় গুরু বলে মান্য করে। আভাসের নিজের অবস্থান একলব্যর মতন। রূপময়দার গল্প পড়েই সে ভক্ত হয়েছে, ব্যক্তিগত আলাপ বেশিদূর গড়ায়নি। সুযোগ ঘটেনি বিশেষ। দু'জনের বাসস্থানের দূরত্ব অনেকটাই—আভাস থাকে বেলঘড়িয়ায়, রূপময়দা যাদবপুর। দু'জনের আড্ডার জায়গা, পছন্দের লোকজন সবই আলাদা। কফি

BanglaBook.org

হাউসে অথবা কোনো সাহিত্য-অনুষ্ঠানে যদিবা বারকয়েক দেখা হয়েছে, আভাস একবার আগ বাড়িয়ে বলেছে আমি আপনার লেখার দারুণ ভক্ত। রূপময়দা খুশি হয়েছে ঠিকই, আভাসের পরিচয় জানার পরই গম্ভীর হয়ে গেছে। ভেবেছে আভাসের ভক্তি আসলে মিথ্যে। বিনয়ের মোড়কে অহংকার প্রকাশ। এরকমটা ভাবার কারণ, রূপময়দার চেয়ে প্রায় বারো-চোদ্দো বছর পরে লেখালেখিতে এসে আভাস অনেক বেশি জনপ্রিয়। আভাসের আত্মপ্রকাশ কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনে। লিটিল ম্যাগে বড় একটা লেখেনি। প্রাইভেট কম্পানির চাকরি সামলে সময় পায়নি লেখার। বৃহত্তর পাঠক সমাজ আভাসের লেখা গ্রহণ করেছে। কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনের আমন্ত্রণে ইতিমধ্যে বেশ কটা উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে আভাসের। তার গল্প-উপন্যাস থেকে সিনেমা, নাটক, টেলিফিল্ম সব কিছুই হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে সাহিত্যজগতে ইতিমধ্যেই খানিকটা তারকার মর্যাদা পায় আভাস। যেটা নির্ঘাত পছন্দ হয় না রূপময়দার। কখনো-সখনো দেখা হয়ে গেলে আভাসকে তাই এড়িয়ে চলে। রূপময়দা সিরিয়াস কাগজে লেখালেখি করে বেশি। কমার্শিয়াল ম্যাগাজিনেও লিখে থাকে, নিজের লেখার ধারা না পালটে। আভাসও বেশ কিছু সিরিয়াস লেখা লিখেছে, তার মধ্যে কিছু গল্প রূপময়দার লেখা থেকে প্রাণিত হয়ে। সে সব লেখা হয় রূপময়দা পড়েনি অথবা পড়েও গুরুত্ব দেয়নি। আভাসের গায়ে বাণিজ্যিক কাগজের ছাপ, সেটাই যেন তার অপরাধ। এই বৈরিতা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবারের যাত্রাতে কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছে আভাস। রূপময়দাকে বোঝাবে ভাল লেখা বাণিজ্যিক পত্রিকায় ছাপা হলে খারাপ হয়ে যায় না। মান একই থাকে। ...এছাড়াও আরো অনেক কিছুই বলার আছে। যেমন আভাস তো রূপময়দার মতো আরামের সরকারি চাকরি করে না। তার চাকরিতে খাটুনি বেশি, নিরাপত্তা কম। কমার্শিয়াল পত্রিকায় লিখে সে যদি ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে চায়, তাতে কি বিরাট অন্যায় করা হয়?....কথাগুলো ট্রেন পথেই তুলবে ভেবে ছিল আভাস। দীর্ঘযাত্রা, প্রায় সাতাশ ঘণ্টা। কিন্তু বিধি বাম। বৃদ্ধা প্যাসেঞ্জারটি একগাদা লাগেজ নিয়ে খুঁড়িয়ে এসে কুপের লোয়ার বার্থ চাইলেন, আভাসকে নিজের জায়গা ছেড়ে আসতে হল।

—আভাস যে বই খুলে ফেললে দেখছি। এতটুকু সময় নষ্ট করতে রাজি

BanglaBook.org

নও। কী পড়ছ? কুপ থেকে জানতে চাইল ধ্রুবদা। মিশুকে মানুষ। আভাস বই খুলেছে বটে, এখনো পড়া শুরু করেনি। উত্তর দেয়, গোয়েন্দা গল্পের সিরিজ।—ইংরেজি বই। বিদেশি গল্প।

সামনের পুজোর প্রিপারেশন মনে হচ্ছে। এটা বলল রূপময়দা। স্পষ্ট খোঁচা। টুকলির অপবাদ। মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই রাগ করে না আভাস। আপনহাসি হাসে, বুঝিয়ে দেয় অভিযোগটা সে মানছে না। প্রত্যেক পুজোয় বাচ্চাদের জন্য একটা গোয়েন্দা উপন্যাস লেখে আভাস। ভাঁড়ার এখনো শূন্য হয়নি, যে অন্য লেখা থেকে প্লট নিতে হবে। বিভিন্ন গোয়েন্দা গল্প পড়ে বুদ্ধিটাকে শানিয়ে নেয়।

বৃদ্ধাসহ যাত্রীর সঙ্গে কথা বলা থামিয়ে রঞ্জনাদি বলে উঠল, আমি আভাসের ডিটেকটিভ উপন্যাসের বিরাট ফ্যান। পুজোয় প্রথমেই ওটা পড়ি। গোয়েন্দা শাশ্বত রায়কে আমার দারুণ লাগে।

রঞ্জনাদির উচ্ছ্বাসের মুখে একটু বুঝি ম্রিয়মাণ হল রূপময়দা। বলল, আমি অবশ্য আভাসের কোনো গোয়েন্দা গল্প পড়িনি। গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার ভালও লাগে না। অপরাধীকে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখে লেখক, তাকে দিয়ে অপরাধের নানান প্রমাণ ফেলে রাখে। নিজের সৃষ্ট গোয়েন্দার মাধ্যমে ধরিয়ে দেয়। এর মধ্যে বাহাদুরিটা কোথায়, আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—বাহাদুরিটা হচ্ছে পাঠককে ভাল লাগানো। বলল ধ্রুবদা।

রূপময়দা বলে, ভাল তো মানুষের অনেক কিছুই লাগে। যেমন, ম্যাজিক। ঠকছে জেনেও মানুষ উপভোগ করে। ঠকাচ্ছে বলে ম্যাজিশিয়ানেরও কোনো আত্মদংশন হয় না। কারণ, ওটাই তার কাজ। লেখকের কাজ তো সেটা নয়। বিনোদনের বাইরেও কিছু দায় থাকে। অবশ্য আমি বলছি না সাহিত্যে সমস্ত গোয়েন্দা গল্পই বিনোদনমূলক। কিছু উচ্চমানের লেখা নিশ্চয়ই আছে, সংখ্যায় বেশ কম।

আলোচনার কেন্দ্রে এসে পড়েছে বলে বেশ অস্বস্তিই হচ্ছে আভাসের। রূপময়দা তাকে অপছন্দ করে, সেটাও প্রমাণ হচ্ছে। প্রসঙ্গটা যত তাড়াতাড়ি থামে, ততই মঙ্গল। কথা ঘোরানোর জন্য কী বলবে ভাবছে আভাস, প্রতাপদা বলে উঠল, আভাসের ছোটগল্প আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

BanglaBook.org

ও যদি অন্যান্য লেখা একটু কমিয়ে দিয়ে বেশি করে ছোটগল্প লিখত, আমাদের বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হত।

লজ্জার এক শেষ। কোথায় মুখ লুকোবে আভাস? প্রতাপদার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ গল্পকারের সামনে আভাসের গল্পের প্রশংসা করছে। আড়চোখে রূপময়দাকে দেখে নেয় আভাস, ফর্সা, চশমা পরা মুখটা বেশ থমথমে। ঝড়ের গতিতে ছুটছে ট্রেন। প্যান্ট্রিকারের কোনো হকারও যাতায়াত করছে না, যে তার থেকে কিছু কিনতে গিয়ে প্রসঙ্গের মোড় ঘোরাবে আভাস। খড়্গপুরের আগে ট্রেন থামবে না। ওখানেই ফার্স্ট স্টপেজ। ...ভাবনার মাঝে ধ্রুবদা বলে উঠল, আভাস কিন্তু উপন্যাসেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। ওর সবকটা উপন্যাস পড়েছে আমার বউ। খুব সুখ্যাতি করছে দেখে আমিও একটা পড়লাম। সম্ভবত ওর দ্বিতীয় পুজোর উপন্যাস, ছবিঘর। দারুণ লেখা।

কথা শেষ করে ধ্রুবদা আভাসের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল, ওই উপন্যাসটা কী একটা পুরস্কার পেয়েছে না?

অধোবদন হয়ে মাথা নাড়ল আভাস, পুরস্কারের নাম মুখফুটে বলে উঠতে পারল না। এবার সে টয়লেটে যাবে, প্রয়োজন ছাড়াই। নয়তো পয়েন্ট থেকে এরা নড়বে না। বার্থ থেকে পা নামাতে যাবে আভাস, রূপময়দা বলে উঠল, লেখালিখিতে আভাস তো প্রায় সব্যসাচীর ক্ষমতা ধরে। টিন এজারদের বিখ্যাত যে ম্যাগাজিনটা আছে, সেখানে দেখি প্রায়ই প্রেমের গল্প লেখে। ভূতের গল্পতেও আভাস নাম করেছে। আমার পাশের ফ্ল্যাটে একটা বাচ্চা ছেলে আছে, প্রায়ই আমাকে বলে, জেঠু, তুমি আভাস বসুর মতো ভূতের গল্প লেখো না কেন? ভীষণ ভাল লাগে পড়তে। আমি বলি, ভূতের লেখা খুব ঝুঁকির ব্যাপার বাবা। গল্প খারাপ হলে ভূতেরা এসে চাঁটি মেরে যায়। যত খারাপ, তত চাটি...

হাসছে রূপময়দা। হাসির আড়ালে বিদ্রূপটা গ্রুপের কারুরই পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না। গুম মেরে গেছে ধ্রুবদা, রঞ্জনাদি, প্রতাপদা। ধ্রুবদা বলে ওঠে, সব ধরনের লেখা লিখতে পারা কি খারাপ?

প্রশ্নটা যেহেতু রূপময়দার উদ্দেশে, উত্তর দেয়, না না, খারাপ কেন হতে যাবে। পাঠক পাবে বিরাট রেঞ্জের। অর্থ, যশ, পরিচিতি সবই হবে।

BanglaBook.org

যেমনটা লিখলে পাঠক খাবে সেটাই লিখে যাবে জীবনভোর। কিন্তু ও যখন লেখালিখি শুরু করেছিল, সেই সময়কার কিছু গল্প আমি পড়েছি। মনে হয়েছিল সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলো ভাঙতে এসেছে। পাঠককে ভাবাতে এসেছে অন্য ভাবে।

মুখভর্তি অসন্তুষ্টি নিয়ে চুপ করে গেল রূপময়দা। প্রতাপদা বলল, কথাগুলো একটু ভেঙে বললে হয় না? মাথায় ঢুকল না ঠিকমতো।

বলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রতাপদার কাছে ব্যাপারটা সত্যিই ক্লিয়ার হয়নি। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে রূপময়দা বলতে থাকে, আভাস যে ভূতের গল্প লেখে, নিজে কি বিশ্বাস করে ভূতে? প্রেমের যে গল্পগুলো লেখে সব হান্ড্রেড পারসেন্ট লাভ। আর কে না জানে প্রেমের সম্পর্কের মধ্যেই সংশয় সবচেয়ে বেশি। প্রেমিক প্রেমিকারা একে অপরকে বিশ্বাসের ভান করে অবিরত।

—কিন্তু আভাসের আগেও তো অনেক বড় বড় লেখক প্রেম বা ভূতের গল্প লিখেছে। তাহলে তো সাহিত্যের একটা বিপুল অংশকে অগ্রাহ্য করতে হয়। এটা বলল ধ্রুবদা।

রূপময়দা বলে, আমি অগ্রাহ্য বা পরিত্যাগের কথা বলছি না। যা লেখা হয়েছে, তার পরের লেখাটা আশা করছি আভাসের থেকে। নবীন লেখক, নতুন কিছু তো দেবে পাঠকদের।

—আচ্ছা মুশকিল, আভাস হয়তো ভূত বিশ্বাস করে। বহু বড় বড় লেখক ভূত বিশ্বাস করতেন, করেন। বলল প্রতাপদা।

রূপময়দা আভাসের দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, তুমি কি ভূত বিশ্বাস করো? মনে করো বিশুদ্ধ প্রেম বলে কিছু হয়?

এবার তো কিছু বলতেই হবে। শ্রদ্ধা করে বলে রূপময়দার সমস্ত অন্যায় অভিযোগ মেনে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আভাস বলে, ভূত, বিশুদ্ধ প্রেম আমি যেমন বিশ্বাস করি না, অনেক পাঠকও করে না। পাঠকদের লেখকের চেয়ে বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই। তারা সাহিত্য থেকে রস পেতে চায়, জ্ঞান নয়। জ্ঞানের জন্য স্কুল কলেজ আছে।

—স্টুডেন্টরা কি শুধুমাত্র স্কুল কলেজ থেকেই সব কিছু শেখে? এই যে তুমি গল্প লিখে বাচ্চাদের মনে ভূতের অস্তিত্ব আছে বলে জানান দিচ্ছ, এই

BanglaBook.org

ভুল ধারণা তার আদৌ কোনোদিন কাটবে কিনা, কে জানে! আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যা হাল। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা তোমার গল্প পড়ে মনে করছে প্রেম এক স্বর্গীয় ব্যাপার। অযোগ্যের কাছে সমর্পণ করছে নিজেকে। বাস্তবটা জানছে না। ঠকছে। এর দায় তুমি নেবে না?

রূপময়দার কথার মাঝে রঞ্জনাদি বলে ওঠে, এ মা, তোমরা তো দেখছি ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিলে। ট্রিপের প্রথমদিনেই যদি এই অবস্থা হয়, শেষে না জানি কী হবে। একসঙ্গে ফিরব তো?

—সরি সরি, আমি একটু ওভার রিঅ্যাক্ট করে ফেলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আভাস খুব পাওয়ারফুল লেখক বলেই ওর প্রতি এক্সপেকটেশন আমার বেশি। বলে পরিস্থিতি সামলে নিল রূপময়দা।

বৃদ্ধা সহযাত্রী এতক্ষণ ধরে সকলের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন, এবার আভাসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা, হিমরাত নাটকটা আপনারই না? আপনিই সেই আভাস বসু। নাটকটা আমি অ্যাকাডেমিতে দেখেছি। মেয়ে-জামাই নিয়ে গিয়েছিল দেখাতে। কী দারুণ নাটক! অসাধারণ!

আভাস বুঝতে পারে আর এখানে বসা যাবে না। যেতেই হবে টয়লেটে। নয়তো নাটক নিয়ে শুরু হবে আর এক প্রশ্ন। মুখটা হাসি হাসি করে আভাস বার্থ থেকে নেমে গেট টেনে বাইরে যায়।

BanglaBook.org

খড়্গপুর পার হয়ে গেছে ট্রেন। টয়লেট থেকে ফিরে এসে আভাস দেখেছিল আলোচনা ঘুরে গেছে। স্বস্তি পেয়েছিল। যার সাহচর্য পাওয়ার জন্য এই ট্যুরে সে চলেছে, তার সঙ্গেই তৈরি হচ্ছিল তিক্ততা। খড়্গপুরের প্ল্যাটফর্ম থেকে মাটির ভাঁড়ের চা এসেছিল কামরায়। সকলে মিলে খাওয়া হল, বৃদ্ধা সহযাত্রী সমেত। বৃদ্ধা প্রায়ই এই ট্রেনে চেন্নাই যান, মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। প্রতিবারই নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। পরে যোগাযোগ হয় ফোনে। কলকাতার ফ্ল্যাটে একাই থাকেন মহিলা। ছেলে বিদেশে, স্বামী গত হয়েছেন। চেন্নাই যাত্রাপথের বন্ধুদের ফোন পেলে নিঃসঙ্গতা কাটে। বয়স্কা মহিলার জন্য খারাপ লাগে আভাসের, নিশ্চয়ই বড়ি, আচার আরো নানান জিনিস মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে নিয়ে যাচ্ছেন বলেই এত লাগেজ হয়েছে। ট্রেনে উঠিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। এমনকী কুলির দেখা পাওয়া যায়নি।

হয়তো পাননি খুঁজে। ওই পা নিয়ে কমপার্টমেন্ট অবধি পৌঁছলেন কীভাবে, সেটাই আশ্চর্যের!

ভদ্রমহিলার পারিবারিক প্রেক্ষাপট শোনার মাঝে আভাস বারদুয়েক রূপময়দার গল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিল। বিখ্যাত কয়েকটা গল্পের নাম করে শুরু করেছিল প্রশস্তি, রূপময়দার কত বড় ভক্ত বোঝাতে চাইছিল, এখন এসব থাক বলে রূপময়দা অন্য কথায় চলে গেল। এই হচ্ছে সত্যিকারের গুণী মানুষের শিষ্টাচার। এখন গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে আলোচনা চলছে কুপে। সামান্য দূরে থাকার সুবাদে আভাস সন্তর্পণে সরে এসেছে গল্পগাছা থেকে। এখনো তো অনেকটা পথ, কয়েকটা দিন পড়ে আছে হাতে, প্রচুর কথা বলতে হবে। ডিটেকটিভ গল্পের বইটায় মন দিয়েছে আভাস। ধীরে ধীরে ঢুকে গেছে কাহিনিতে।

বেশ খানিকক্ষণ চলার পর ট্রেনের গতি কমতে লাগল। বই থেকে মন সরে গেল আভাসের। কাচঢাকা জানলায় চোখ রেখে বোঝার চেষ্টা করল, কেন স্লো হল ট্রেন? বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

—জাজপুর ঢুকছে ট্রেন। কুপ থেকে বলল রূপময়দা। আভাসের উদ্দেশেই, জানলায় চোখ রেখেছে বলে। ট্রেনের পাশে আরো অনেক লাইন দেখা যেতে লাগল, সিগনাল পোস্ট, দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ি। রূপময়দা ফের বলল, আভাস, নামবে নাকি একবার প্ল্যাটফর্মে? দু'বছর জাজপুরে কাটিয়েছি। অফিস থেকে পোস্টিং দিয়েছিল।

—কোনো দরকার নেই নামার। সুপারফাস্ট ট্রেন, এসব স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। বলল ধ্রুবদা।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল ট্রেন। আভাসের নামার ইচ্ছে নেই খুব একটা। রূপময়দাও গা করল না।

সত্যিই খুব অল্প সময় দাঁড়াল ট্রেন। ফের চালু হয়েছে। আভাস বইয়ে মন দেয়। ট্রেনজার্নিতে পড়া খুব ভাল হয় তার। এই কমপার্টমেন্টে একটা বাড়তি সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত বার্থে প্যাসেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও হইচই একেবারেই নেই। সব সময় এমনটা হয় না, হই-হট্টগোলের একটা দুটো গ্রুপ থেকেই যায় কামরায়। পড়তে পড়তে আভাসের কানে আসে বৃদ্ধা সহযাত্রীর গলা, এত জোরে চালাচ্ছে কেন ট্রেন? এখনই তো এরকম স্পিড নেয় না! রাতের দিকে জোরে চালায়।

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা ভয় পাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে ভীতু প্রকৃতির। আভাস গতিটা বেশ উপভোগ করছে। সুপারফাস্ট ট্রেন বলে কথা, মর্যাদা রাখতে জোরে তো দৌড়োবেই। রাতের দিকে স্পিড তুললে লাভ হত না, ঘুমের মধ্যে টের পেত না আভাস...ভাবনা শেষ হয়েছে কি, হয়নি, প্রবল ঝাঁকুনি সমেত হেলেদুলে চলতে লাগল ট্রেন। সাপের চলনে। রেললাইন তো এরকম আঁকাবাঁকা হয় না, এভাবে চলবে কেন? শিরদাঁড়ার বেজায়গায় মোচড় লাগছে, প্রবল যন্ত্রণা। বাচ্চা এবং মহিলা প্যাসেঞ্জারদের আর্ত চিৎকার... গোটা ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ট্রেন পুরোপুরি থেমে গেল। বিষম আতঙ্কে আভাস কুপের দিকে তাকায়, ভয়ে সাদা হয়ে গেছে গ্রুপের চারজন আর বৃদ্ধার মুখ। কেউই বুঝতে পারছে না, কী ঘটেছে? আবার একবার দুলে উঠে স্থির হয়ে গেল ট্রেন। ভয় এতটাই গ্রাস করেছে সবাইকে, 'কী হল' কথাটা পর্যন্ত উচ্চারণ করে উঠতে পারছে না কেউ। মনে হচ্ছে এই বুঝি দুলে উঠল আবার...এইভাবে ঠিক কত মিনিট বা সেকেন্ড কাটল, কে জানে! আভাসের বার্থ লাগোয়া দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, একটা লোক, রক্তে ভেজা আর সাদা টি-শার্ট। ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করছে, পটরি সে গিড় গেয়ি ট্রেন। পটরি সে গিড় গেয়ি... বলতে বলতে করিডোর ধরে এগিয়ে গেল লোকটা। তার মানে ট্রেন ডিরেলড। এই কামরাটা লাইন থেকে নেমে গেলেও সোজা দাঁড়িয়ে আছে। নয়তো আভাসরা এতক্ষণে হেলে পড়ে যেত। রক্তমাখা লোকটা ওভাবে হেঁটে যেতে পারত না। আভাস কী করণীয় ভাবছে, ঝপ করে অন্ধকার হয়ে গেল গোটা কামরা। পাওয়ার কাট হয়ে গেল। এসিও চলবে না। আবার বাচ্চাদের কান্না, বড়দের আর্তরব। মৃদু আলো জ্বলে উঠল আভাসদের গ্রুপ যে কুপে আছে। লাইটার জ্বালিয়েছে রূপময়দা, বাকিরা বজ্রাহতর মতো স্থির। আভাসের উদ্দেশে ধ্রুবদা বলে, চলো, বাইরে গিয়ে দেখি, কাণ্ডটা, কী হল!

দেখতে তো হবেই কতটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। বার্থ থেকে নামে আভাস। লাইটার নিভিয়ে এগিয়ে এল রূপময়দা। কান্নাছোঁয়া গলায় রঞ্জনাদি বলে, কোনো দরকার নেই এখন বাইরে যাওয়ার।

প্রতাপদা বলল, কী অবস্থা হয়ে আছে বাইরে, কে জানে! আমরা সবাই এক জায়গায় থাকা ভাল।

আভাস, রূপময়দা কানে নিল না ওদের কথা। কামরার গেট টেনে

BanglaBook.org

বাইরের প্যাসেজে গেল। ট্রেন থেকে নামার ডানদিকের দরজা খুলল আভাস, মুখ বাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে, তাদের সামনের দুটো কামরা লাইন থেকে নেমে হেলে পড়েছে।

—বাকি কমপার্টমেন্টগুলো গেল কোথায়? বিষম বিস্ময়ে বলল রূপময়দা, আভাসের পাশ দিয়ে মাথা বাড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

আভাস বলল, ওপাশের দরজা দিয়ে দেখা যাক।

বাঁদিকের দরজা দিয়ে ঘটনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করা গেল। দু'জনেই স্তব্ধবাক। প্রায় সশব্দে ধড়াস ধড়াস করছে আভাসের বুক। সন্ধের আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে কোনো বগি কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, একটার উপর একটা উঠে গেছে কামরা। প্রায় চার-পাঁচ তলা সমান। কোনো কামরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে খানিক দূরে। তুমুল চিৎকার-কান্না যাত্রীদের।

—একটুর জন্য বেঁচে গেলাম আমরা। আমাদের পরের কামরা থেকেই লাইনের বাইরে রয়েছে ট্রেন। নিশ্চয়ই বিশাল আওয়াজ হয়েছিল, এসি কমপার্টমেন্টে ছিলাম বলে তেমন টের পাইনি। বলল রূপময়দা। সহজ বাচনভঙ্গিতে বোঝা গেল খুব একটা ঘাবড়ে যায়নি। তাতে আভাসও বিহ্বলতা কাটিয়ে স্বাভাবিক হল। ফের রূপময়দা বলে, যা অবস্থা দেখছি রেসকিউ করতে অনেক সময় লাগবে। রেলের রেসকিউ টিম কখন আসবে, তারও কোনো ঠিক নেই। আমাদের জল এবং খাবার সবই ফুরোবে। রাত্রের খাবার প্যান্ট্রি থেকে নেওয়া হবে ঠিক হয়েছিল। বেশিক্ষণ চলার মতো খাবার, জল স্টকে নেই আমাদের। কিনতে হবে।

—এখানে দোকান কোথায়? দু'পাশে তো ফাঁকা।

শুধুই অন্ধকার, বলল আভাস।

রূপময়দা বলে, কাছাকাছি হাইওয়ে আছে। আমি জাজপুরে ছিলাম, জানি। হাইওয়েতে একটা না একটা দোকান পেয়ে যাব। যেতে দেরি করলে এই গাড়ির প্যাসেঞ্জাররাই দোকানটা খুঁজে নিয়ে সব মাল শেষ করে দেবে। লুঠ হয়ে যাবে দোকান।

—চলুন তা হলে, খোঁজা যাক দোকান। বলার পর আভাস বলে, যাই, প্রতাপদের একবার জানিয়ে আসি।

—কোনো দরকার নেই জানাবার। যেতে দেবে না। খাবার না পেয়ে

BanglaBook.org

পরে আবার কষ্টও পাবে। বলে রূপময়দা বাঁদিক ছেড়ে ডানদিকের দরজা লক্ষ্য করে এগোল। হাইওয়েটা তার মানে ওই সাইডে।

ঝুঝকো অন্ধকারে পাশের রেললাইন ধরে আভাসরা এগিয়ে চলেছে। পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বেশ কিছু আতঙ্কগ্রস্ত প্যাসেঞ্জার। তাদের পরিজনরা হয়তো সামনের দিকে আছে। পিছনের কয়েকটা বগি বাদে পুরো গাড়িটাই তো উলটে গেছে।

সাদাটে শাড়ি পরিহিতা একজনকে দৌড়ে যেতে দেখে থমকে গেল আভাস, রূপময়দা। একে অপরের দিকে তাকাল। রূপময়দা জিজ্ঞেস করল, তুমি নিশ্চয়ই একই জিনিস দেখলে?

ঘাড় নাড়ল আভাস। ট্রেনের সেই সহযাত্রী বৃদ্ধাকে এখনই তাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখল। রূপময়দা বলে উঠল, অসম্ভব, উনি তো ভাল করে হাঁটতেই পারছিলেন না। আমরা কি তা হলে ভুল দেখলাম? —একটু থেমে নিজেকেই প্রশ্ন করে রূপময়দা, দুজনের একই ভুল হল?

ট্রেনের দিকে তাকায় রূপময়দা। আশংকার গলায় জানতে চায়, আভাস, আমরা পিছন থেকে কত নম্বর কামরায় ছিলাম?

গলা শুকিয়ে গেছে আভাসের, ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে সে-ও। কোনোক্রমে বলে, ছিলাম চার নম্বর কমপার্টমেন্টে। এখন তো দেখছি সেটা মাটিতে। লাস্ট দুটো কামরা লাইনে। তাহলে আমাদেরটা সমেত আর একটা এখনই পড়ল?

—না, পড়লে বিকট আওয়াজ হত। চিৎকার করত প্যাসেঞ্জাররা। আমরা কি সত্যিই সশরীরে নেমে আসতে পেরেছি?

বুক ফাঁকা হয়ে যায় আভাসের। বৃদ্ধাও কি আর শরীরে নেই, তাই ওভাবে দৌড়োতে পারছেন? গাঢ় বিষাদের সঙ্গে রূপময়দা বলল, কোথাও একটা বড় গণ্ডগোল হয়ে গেছে আভাস। একটু আগে আমি আমার সেজ কাকাকেও দৌড়ে যেতে দেখলাম। বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন কাকা। খুড়তুতো ভাই রেলে মাথা দিয়েছিল। এই ভাবেই দৌড়ে গিয়েছিলেন কাকা।

ভীষণ শীত লাগছে আভাসের। ভয় যে এত ঠাণ্ডা হতে পারে, ধারণা ছিল না! খানিক আগে সে-ও একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে, পায়েল ছেলেকে নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া ট্রেনটার দিকে। আভাসের মনে

BanglaBook.org

হয়েছিল মনের ভুল। এখন মনে হচ্ছে, না। ট্রেনের মতো তাদের কাছে সময়টা তালগোল পাকিয়ে গেছে। রূপময়দা দেখছে অতীত, আভাস ভবিষ্যৎ। বৃদ্ধার দৌড়ে যাওয়াটা বর্তমান। আচমকাই আভাসের মাথায় একটা প্ল্যান আসে। রূপময়দাকে বলে, আচ্ছা, আমরা বেঁচে আছি কিনা বোঝার জন্য একে অপরকে ছুঁয়ে দেখি না।

প্রস্তাবটা মনে ধরে রূপময়দার। মুখোমুখি হয় দুজনে। হাত তুলতে গিয়েও থমকে যায় দু-পক্ষই। ভূত বিশ্বাস করে না এরা। অথচ একে অপরকে ছোঁয়ার মতন সহজ কাজটাও করে উঠতে পারছে না। ছুঁলেই যদি প্রমাণ হয়ে যায় তারা নেই। নেই হয়ে যেতে কেউই চায় না। ঘোর আতঙ্কে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সময় বয়ে যায়। এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে দুজনে? অবশ্য এদের জীবনে সময়ের মূল্য আদৌ আর আছে কি? কে জানে!

BanglaBook.org

# জলদানব

ভগীরথ মিশ্র

## এক

মৃত্যুর রঙ নীল, এটা ছেলেবেলা থেকে আমার পুরাণ-পটীয়সী মায়ের মুখেই শুনেছি। মৃত্যুর রাজা যমের গায়ের রঙ নাকি নীল। তিনি নাকি সর্বাঙ্গে মৃত্যুর রঙ ধারণ করে থাকতেই ভালোবাসেন। তাঁর পোশাকের রঙও নাকি গাঢ় নীল। ওই রঙেই বিচরণ করেন তিন ভুবনের সর্বত্র।

কিন্তু বিচরণকালে তাঁর পায়ের শব্দটি ঠিক কেমন হয়, এতকাল সে-বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। মাও কোনো প্রসঙ্গে কিছু বলেননি ওই নিয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে কোনোরূপ সংশয়ই নেই, মৃত্যুর পায়ের আওয়াজ ছলাৎ-ছলাৎ...ছলাৎ-ছলাৎ...। কারণ, অনেকক্ষণ ধরে, আমি যতই তিলতিল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই ওই পায়ের আওয়াজ আরও সুস্পষ্ট, আরও অবিরাম হয়ে উঠছে আমার চারপাশে। ছলাৎ-ছলাৎ... ছলাৎ-ছলাৎ...।

কতক্ষণ ধরে আসছে সে, কে জানে! খানিক আগে অবধিও টের পাইনি। কারণ, তখনো অবধি আরও দুটো শব্দ জেগে ছিল, বেঁচে ছিল, আমার কাছেপিঠে। পিনাকী আর মুকুলের অক্ষম জামা ঝাপটানির আর ওদের গলার ক্ষীণ কাতরানির আওয়াজ। ওই আওয়াজ দুটোকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছিলাম আমি। কারণ, অনেকক্ষণ যাবৎ ওই আওয়াজ দুটোই ছিল, আমার কাছে বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন। খানিক আগে ও-দুটোও থেমে গিয়েছে পুরোপুরি। প্রথমে থেমে গেল পিনাকীর আওয়াজ, তারপর...একসময় মুকুলও পুরোপুরি থেমে গেল। আর, তারপর থেকেই আমার চারপাশে শব্দ বলতে মৃত্যুর ওই হিমশীতল পদধ্বনি, ছলাৎ...ছলাৎ... ছলাৎ-ছলাৎ...। এতক্ষণে আমি পুরোপুরি বুঝে ফেলেছি, সে আসছে। একেবারে অবিরাম পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে নিশ্চিতভাবে, আমার দিকেই।

অথচ আজ সকালের সঙ্গে এই মুহূর্তটার বুঝি কোনো তুলনাই চলে না। বাস্তবিক, কতই না রঙিন হয়ে দিনটা হাজির হয়েছিল আমাদের কাছে! কতই না আশা জাগিয়ে!

BanglaBook.org

রাতভর ছুটে ছুটে আমাদের বাসটা যখন দীঘায় পৌঁছল, ততক্ষণে সবে ভোর হয়েছে। তড়িঘড়ি বাস থেকে নেমে আমরা জনাতিরিশেক দৌড়তে লাগলাম সমুদ্রের দিকে। ততক্ষণে সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে একেবারে ডগোমগো সিঁদুরের টিপটি হয়ে সূর্যটা উঠছে। আমাদের চোখের সামনে গোটা দিগন্তটা একটু একটু করে লাল হয়ে উঠচে। তৎসহ বইছে শনশন হাওয়া। ভোরবেলার ওই গা-জুড়োনো হাওয়ায় আমাদের শরীরটা একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছিল।

তখন ভাঁটা চলছিল। সমুদ্রটা পালিয়ে গিয়েছিল আমাদের থেকে অনেক দূরে। আর কী শান্ত ছিল ওর রূপ! গিরীশ কাকা বলেছিলেন, এখন এত শান্ত, জোয়ারটা শুরু হোক, দেখবি ওর আসল রূপ। দেখবি, কেমন করে এই শান্ত ঝিলটি এক দুরন্ত জলদানব হয়ে ওঠে!

সমুদ্রের পাড় থেকে কিছুটা দূরে একটা ক্লাবঘরে আমাদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। রান্নার ঠাকুরকে নিয়ে গিরীশকাকা জলখাবার বানাতে চলে গেল। আমাদের তিনজনেরই ইচ্ছে করছিল, তক্ষুনি নেমে পড়ি সমুদ্রে। সেটা বুঝতে পেরেই পারুলদি, আমাদের পাড়ার প্রায় সব বয়েসের ছেলেমেয়েদেরই পারুলদি তিনি, চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন, এই যে জলের পোকা-তিনটে, এক্ষুনি যদি নেমে পড়বার ধান্দা করছ তো, ভুলে যাও সেটা। গিরীশ-কাকা বলে গিয়েছে, আগে সবাই জলখাবার খাবি, তারপর নাববি সমুদ্রে।

পারুলদি যে আমাদের জলের পোকা বললেন, তার সঙ্গত কারণ রয়েছে। গোটা পারিজাতপুর এলাকায় আমাদের তিনজনকে জলের পোকাই বলা হয়। আমরা যেমনি পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটতে পারি, তেমনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভেসে থাকতেও পারি। গরমের মরসুমে থাকিও। বাস্তবিক, সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি, গরমের মরসুমে, তিনজনের বাড়ির বড়রা সায়রদিঘির জল থেকে আমাদের তুলতে একেবারে হিমসিম খায়।

আরও একটা কথা। সাঁতার কাটা এবং নাগাড়ে জলে ভেসে থাকবার ক্ষেত্রে আমাদের তিনজনের মধ্যে এক জাতের চাপা রেষারেষি রয়েছে, রোজদিন সায়েরদিঘিতেই সেটা ফুটে বেরোয়। অন্য সময় আমরা তিনজনাতে পরস্পর হরিহর আত্মা। কিন্তু জলে আমরা কস্মিনকালেও কেউ কারোর নই। সেখানে আমরা তিনজনেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে কেউ কাউকে তিলমাত্র রেয়াত করিনে।

BanglaBook.org

সেই কারণেই যখন দীঘা-ট্যুরের কথা উঠল, তিন বাড়ির বড়দের মনেই দুর্ভাবনাটা চাগিয়ে উঠেছিল, কিনা, সমুদ্রে নেমে আমাদের চিরাচরিত রেষারেষিটা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছবে, কে জানে! তাই রওনা দেবার আগে ক'টা দিন তাঁরা সারাক্ষণ পইপই করে আমাদের পাখিপড়ানো পড়িয়েছেন, কিনা, খবরদার জলে নেমে রেষারেষি করিসনে। রেষারেষির জায়গাই নয় ওটা। মনে রাখিস, সমুদ্র আমাদের কোনো অহংকারই সহ্য করে না। সবশেষে গোটা ব্যাপারটা সামলাবার দায়িত্ব গিরীশকাকা ও পারুলদির ওপর চাপিয়ে তবেই আমাদের ছেড়েছেন ওঁরা। কাজেই, আমাদের ধান্ধাটা আগাম আন্দাজ করাটা পারুলদির পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। আমরা যে সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছনোর পর থেকে পরস্পর তাল ঠুকতে শুরু করেছি, সেটা ঠিকঠাকই বুঝেছে পারুলদি।

পারুলদির ধমক খেয়ে আমরা তখনকার মতো গুটিয়ে নিলাম নিজেদের। অকারণেই বীচের ওপর রেষারেষি করে দৌড়লাম খানিকক্ষণ। ওই করেই মনের আশ মেটাতে লাগলাম। একসময় সবাইয়ের সঙ্গে চলে গেলাম খাওয়ার জায়গায়।

BanglaBook.org

## দুই

জলে নামবার আগে পারুলদি আমাদের বয়েসি সবাইকে একত্র করলেন। তারপর আমাদের তিনজনের ওপর চোখদুটোকে তাক করে একেবারে হুকুমের স্বরে বললেন, শোন্, এখন ক'টা বাজে? সাড়ে ন'টা। ঠিক সাড়ে বারোটায় একটা লম্বা হুইসল বাজাব। সঙ্গে সঙ্গে যারা উঠে আসবি, তারা জলে নাব্। যারা উঠবিনে বলে মনে করছিস, তারা ও-ই ঝাউগাছগুলোর তলায় গিয়ে বোস। অন্যরা স্নান করুক, ওরা কেবল পাড়ে বসে তা দেখুক। আর একটা কথা। কোমরজলের বেশি কাউকেই যেন যেতে না দেখি। দেখ মাত্রই নুলিয়া দিয়ে জবরদস্তি তুলে আনব জল থেকে।

কিন্তু সত্যিটা স্বীকার করাই ভালো, ততক্ষণে আমাদের মধ্যেকার রেষারেষিটা মনের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনজনেই মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, অন্য দু'জনের চেয়ে একহাত অন্তত আগে যাব, আর একমিনিট অন্তত বেশি থাকব জলে। যাতে করে এলাকায় ফিরে সেই তথ্যটা বুক

বাজিয়ে বলতে পারি সবাইকে। কাজেই রওনা দেবার সময় মা-বাবার চেতাবনি, আর পারুলদির শাসানি আমাদের মধ্যে তিলমাত্র রেখাপাত করেনি। আমরা কেবল মনে মনে তাল ঠুকছিলাম। কাজেই, উপস্থিত পারুলদির চোখরাঙানিকে বাইরে বাইরে খুব সমীহ করলেও, তিনজনেই মনে মনে বলেছিলাম, দাঁড়াও, জলে একটিবার তো নামতে দাও, জলে পা দিলেই তো আমরা তোমাদের শাসনের আওতার এক্কেবারে বাইরে। ওখানে তো আমরাই আমাদের অধীশ্বর।

পারুলদির কথায় নিমরাজি হয়ে আমরা সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ জলে নেমেছিলাম। এবং, তৎক্ষণাৎ যে-যার মতো নিজমূর্তি ধরেছিলাম। মুখ ফুটে বলিনি, তবে প্রত্যেকেই মনে মনে স্থির করেই রেখেছিলাম, তেমন একটা সুযোগ যখন আকস্মিকভাবে জুটিয়েই দিয়েছেন ওপরওয়ালা, আজকের জলবিহারে এমন একটা কীর্তি রেখে যাব, যা নিয়ে সারাটা জীবন গুমোর দেখাতে পারি। বাস্তবিক, তিনজনে একত্রে সমুদ্রের জলে নামবার সুযোগ তো বারে বারে আসে না। আজ এসেছে, আবার কোনোদিন আসবে কিনা কে বলতে পারে! কাজেই, আজকেই সমুদ্রের বুকে ওই অখণ্ড কীর্তিটা স্থাপন করে তবে জল থেকে ওঠার ব্যাপারে আমরা তিনজনেই ছিলাম একেবারে বদ্ধপরিকর।

দুটো গভীর বিশ্বাস নিয়ে জলে নেমেছিলাম, এক, যত দূরেই যাই, দূর থেকে হলেও তীরটাকে তো দেখতে পাবই। সেই অনুসারে বুঝতে পারব, কতটা দূরে চলে গিয়েছি। দুই, সমুদ্র যা দেয়, সবটাই তীরে ফিরিয়ে দেয়। কাজেই, কেবল সামনের দিকে এগোবার জন্যে যেটুকু ক্লেশস্বীকার, ফেরার জন্য আমাদের কিছুই করতে হবে না। শরীরটাকে ভাসিয়ে দিলেই একসময় পাড়ে পৌঁছে যাবই। আর, শরীরটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের ওপর ভাসিয়ে রাখা, ওতে আমরা তিনজনেই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আমাদের দুটো ধারণাই যে ভুল, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝেছিলাম।

প্রথম ভুলটা ভেঙেছিল, যখন তীরভূমিটি একটু একটু করে অদৃশ্য হতে লাগল। প্রথমে সৈকত, তারপর উঁচু বালিয়াড়িগুলো, সবশেষে উঁচু উঁচু ঝাউগাছগুলোও একটু একটু করে ডুবতে লাগল জলের তলায়। এবং একসময় গোটা সৈকত এলাকাটাই পুরোপুরি চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল। ভূগোলের কোন্ নিয়মে সমুদ্রের মধ্যে কিছুদূর যাবার পরই গোটা

BanglaBook.org

সৈকত এলাকা এমনকি উঁচু ঝাউগাছগুলো অবধি পুরোপুরি হারিয়ে যেতে পারে, ওই নিয়ে গবেষণা করবার ওটা যথার্থ সময় ছিল না। আমরা কেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলাম, আমাদের চারপাশে কেবল দিগন্তবিস্তৃত গোলাকার থইথই জলরাশি। ওই সীমাহীন গোলাকার বিশাল জলরাশির মধ্যিখানে আমরা তিনটি মাত্র ক্ষুদ্র পোকার মতো প্রাণী।

আন্দাজ ঘণ্টা দুই আমরা প্রবল পরাক্রমে এগিয়ে চললাম। আমাদের চোখের সামনে থেকে সৈকতখানি পুরোপুরি হারিয়ে যাবার পরও ঘণ্টাটাক সাঁতার কেটে কেটে এগিয়েছি। আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে আন্দাজ করেছিলাম, সাড়ে-এগারোটা বারোটা মতো হবে।

ওই মুহূর্তে আমাদের চারপাশে কেবলই গোলাকার জলরাশি। একেবারে সুদূর দিগন্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। দেখে আমরা সামান্য ভয় পেয়েছিলাম প্রত্যেকেই। এই বিশাল জলরাশির মধ্যে আমরা তিনটে মাত্র প্রাণী। আমাদের চারপাশে আর কেউ নেই, কিছু নেই। ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল।

ততক্ষণে আমার আরও একটা চিরকেলে ভুল ভেঙে চৌখান। চিরটাকাল পাড়ে দাঁড়িয়ে ঢেউগুলোকে যত দূর থেকে ছুটে আসতে দেখেছি, তাতে করেই বিশ্বাস করেছিলাম, সমুদ্রের বুকে অনেক দূর অবধি কেবল ঢেউ আর ঢেউ। বরং মাঝসমুদ্রে একেবারে দশদিক খোলা জায়গা পেয়ে হাওয়ার তোড়ে মাঝসমুদ্রে ঢেউগুলো আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। কিন্তু দেখলাম, পাড় থেকে খানিক এগোতেই ঢেউগুলো আকারে-প্রকারে কমে গেল। একসময় জলের বুকে কেবল খেলনা ঢেউগুলো ছলাৎ...ছলাৎ...।

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর, আমার মনে হল, আর না এগোনোই ভালো।

আমি অন্যদের উদ্দেশে বিড়বিড় করে বললাম, আমাদের বোধ হয় এবার ফেরা উচিত। অনেক দূর এসে পড়েছি।

শুনেই পিনাকী আর মুকুল তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছিল আমার কথায়। হ্যাঁ, ঠিকই, ফেরাই উচিত। কথাগুলো বলল বটে, তবে ওর মধ্যেই ওরা একটুখানি এগিয়ে গেল। দেখাদেখি আমিও।

BanglaBook.org

আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে মনে মনে আন্দাজ করলাম, সাড়ে বারোটা অতিক্রান্ত নির্ঘাত। পারুলদি হয়তো হুইসল বাজিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু আমরা তা শুনতে পেলাম না কেন? তবে কি আমরা এতটাই দূরে চলে এসেছি যে, তীক্ষ্ণ হুইসলের আওয়াজও আমাদের কাছ অবধি পৌঁছল না! আবার ভয়টা জাঁকিয়ে বসল মনে। আবারও বলে উঠলাম, এবার আমাদের ফেরা উচিত রে। আর এগোনো মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

এবারেও একই ব্যাপার ঘটল। আমার প্রস্তাবে পিনাকী আর মুকুল তৎক্ষণাৎ সায় দিল বটে, তবে ওই অবস্থাতেই আরও খানিক এগিয়ে গেল। দেখাদেখি আমিও।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনই এটা করাচ্ছে। মনোগত ইচ্ছেটা হল, যদি ফিরতেই হয়, তার আগে আমি খানিক এগিয়ে থাকি না কেন! পাড়ে পৌঁছে তবে এমনটা দাবি করা যাবে যে, শেষ অবধি আমিই বেশিদূর গিয়েছিলাম। অন্যরা আমার পেছনে ছিল।

আমার নিশ্চিতভাবে মনে হল, এমনটা করলে আমরা কেবল একটু একটু করে এগোতেই থাকব। অথচ মাথার ওপর সূর্যটা ততক্ষণে মধ্যগগন থেকে সামান্য হেলে পড়েছে পশ্চিমের দিকে। অর্থাৎ চোখের আন্দাজে বুঝলাম, বেলা একটা-দেড়টা মতো হবে। সাড়ে ন'টা থেকে দেড়টা—আমরা কেবল এগিয়েছি। মনে আছে, জলে নামার আধঘণ্টার মধ্যেই পায়ের তলার মাটিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাকি সময়টা স্রেফ সাঁতরে সাঁতরেই এগিয়েছি।

একসময় আমি পুরোপুরি থেমে গেলাম। পিনাকী ও মুকুলের উদ্দেশে বললাম, দ্যাখ, বুঝতে পারছি, আমাদের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বী মনটাই আমাদের একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরও গভীর সমুদ্রের দিকে। ইতিমধ্যে প্রায় চারঘণ্টা ধরে এগিয়েছি আমরা। সূর্য হেলে পড়েছে। কাজেই আর এক ইঞ্চিও না এগিয়ে, আয়, আমরা তিনজনেই এক লাইনে দাঁড়াই, যাতে ফিরে গিয়ে কেউই বলতে না পারি যে, আমিই বেশিদূর গিয়েছিলাম।

সবাই যেহেতু ওই মুহূর্তে একই কথা ভাবছিল, আমার প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ লুফে নিল। আমরা তিনজনায় একই সরলরেখায় এসে দাঁড়ালাম।

বললাম, আয়, এবার ফিরি। আর এক পা'ও এগোনো নয়।

BanglaBook.org

## তিন

একেবারে উলটোদিকে পিছু ফিরে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিলাম আমরা। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক পরও যখন সৈকত তিলমাত্র দৃশ্যমান হল না, তখন মনে প্রমাদ গুনলাম আমি। আর, আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বাসটাও যে পুরোপুরি ভুল, সেটাও এতক্ষণে বোধগম্য হল। সমুদ্র সব সময় পাড়ের দিকে সবকিছু ফিরিয়ে দেয় না।

বললাম, এতক্ষণে বুঝতে পারছিস, বেশিদূর অবধি যাবার নেশায় আমরা কতদূরে চলে এসেছি! প্রায় একঘণ্টার ওপর সাঁতার কেটেও এখনো অবধি বিচটাকেই দেখতে পাচ্ছি না।

ওই মুহূর্তে পিনাকী বলে উঠল ওই সর্বনেশে কথাটা।

বলল, আচ্ছা, আমরা যে পাড়ের দিকেই এগোচ্ছি, সে ব্যাপারে কি একশোভাগ নিশ্চিত?

—এমনটা বলছিস কেন?

—বলছি এই কারণে যে, এই গোলাকার জলরাশির মধ্যে কোন্‌দিকটা সামনের দিক, কোন্ দিকটা পেছনের, সেটা আমরা বুঝছি কেমন করে? কাজেই, এই যে ঘণ্টাটাক সাঁতার কাটলাম, এমনটাও তো হতে পারে, আমরা পিছু ফিরছি বলে যেদিকে সাঁতার কেটে চলেছি, সেটা হয়তো আদপেই পাড়ের দিকই নয়।

—মানে?

—মানে, আমরা যে এতক্ষণ সমুদ্রটাকে লম্বালম্বি অতিক্রম করছিলাম না, সে বিষয়ে আমরা কি নিশ্চিত?

—লম্বালম্বি মানে? বলতে গিয়েই আমার গলার স্বরটা সহসা কেঁপে যায়।

—মানে, দীঘা বিচের দিকে না এগিয়ে আমরা পুবে শঙ্করপুর-জুনপুটের দিকে, কিংবা পশ্চিম বরাবর চাঁদিপুরের দিকে এগোতেও তো পারি। নইলে, পাক্কা একঘণ্টামতো সাঁতার কেটেও গাছের চুড়োগুলো অবধি দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—তা কী করে হয়? আমি খানিক ভূগোলের জ্ঞান ফলাই, সূর্য যেদিকে

BanglaBook.org

হেলে পড়েছে, ওটাকে পশ্চিম দিক ধরলে, তার উলটো দিকটা পুব হতে বাধ্য। বাকি রইল উত্তর আর দক্ষিণ। যাবার বেলায় আমরা সারাক্ষণ দক্ষিণ দিকেই এগিয়েছি। ফিরতি পথে তার উলটোদিকে সাঁতার কাটছি। অর্থাৎ—।

—বোকা! আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পিনাকী বলতে থাকে, প্রথমত, আমাদের দেশে সূর্য কখনোই ঠিক পুবদিকে ওঠে না, অস্তও যায় না এক্কেবারে পশ্চিমে। কাজেই, এখন যেদিকে সূর্য, সেটাকে পুরোপুরি পশ্চিমদিক বলে ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া, ওই গোলাকার জলরাশির মধ্যে আমরা যে সারাক্ষণ দক্ষিণদিকেই এগিয়েছি, তারও কোনো মানে নেই। কাজেই, ফিরতি পথে যে ঠিক উত্তর বরাবর ফিরছি, সেটাও ঠিক নাও হতে পারে।

অন্যদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু পিনাকীর কথাগুলো শোনামাত্র আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসছিল। ওর কথাগুলো যদি সত্যি হয়, তবে তো আমরা কখনোই পাড়ে পৌঁছতে পারব না।

কিন্তু ততক্ষণে এও বুঝে ফেলেছি, ভয়টাকে বড় একটা পাত্তা দেওয়া চলবে না। তাহলেই হাত-পা নিজের থেকেই অসাড় হয়ে আসবে। লড়াইয়ের সমস্ত শক্তিই একেবারে ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যাবে শরীর থেকে। এও বুঝে ফেলেছি, পিনাকীদের কাছে ভয়টাকে প্রকাশ করাও চলবে না। কারণ, আমি তো জানি, এই মুহূর্তে আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটা হল মনের জোর। ওই আত্মবিশ্বাসটাই আমাদের লড়াই করবার শক্তি জোগাবে।

কাজেই শুকনো হেসে বললাম, না, না, তা কী করে হয়? আমরা যেদিক থেকে শুরু করেছিলাম, ফেরার বেলায় ওদিকে পিছু ফিরেই তো সাঁতরাতে শুরু করেছিলাম।

—কিন্তু ওটাই যে আমাদের পেছন দিক ছিল, সেটা হলফ করে বলবে কে? পাশ থেকে বলে ওঠে মুকুল, চারঘণ্টা নাগাড়ে সাঁতার কেটেছি আমরা। তার মধ্যে তিনঘণ্টাই আমাদের চারপাশে কেবল গোলাকার জলরাশি? বিশাল জলের ওই বৃত্তের মধ্যে কোন্‌টা পেছনের দিক, কোন্‌টা সামনের দিক, কোন্‌টাই বা ডানদিক, কিংবা বাঁ-দিক, খেয়াল রাখা কি সম্ভব? আমাদের সামনে তো কোনো নিশানা প্রথম থেকেই ছিল না। পেছনের অর্থাৎ পাড়ের

BanglaBook.org

দিকের নিশানাগুলিও তো একঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সত্যি সত্যি নিশানাহীন এগোলে আমরা যেকোনো দিকেই এগোতে পারি। সামনে, পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে...।

—পেছনের দিকে যে এগোইনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। পিনাকী বলে ওঠে, পিছু ফিরে ঘণ্টাটাক সাঁতার কেটেও এখনো অবধি পাড়ের কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না। এমনকি, লম্বা ঝাউগাছগুলোর চুড়ো অবধি নয়।

পিনাকীদের কথাগুলো শুনতে শুনতে স্পষ্ট অনুভব করছিলাম, বুকের মধ্যেকার ভয়টা একেবারে শীতের রাতের কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আরও জমাট বাঁধতে চাইছে নিজের মধ্যে। এমনকি, ওই মুহূর্তে পিনাকীদের মিথ্যে স্তোক দেবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি আমি। আরও লক্ষ্য করলাম, ততক্ষণে পিনাকী আর মুকুলের সারা মুখমণ্ডল জুড়েও কেবলই ভয়। ওদের আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে আসা মুখদুটি দেখতে দেখতে আমার সহসা কেন জানি মনে হল, আমরা আর কখনোই তীরে গিয়ে পৌঁছতে পারব না।

ততক্ষণে অনুভব করছি, শরীরটা কেমন জানি ক্লান্ত লাগছে। হাত-পাগুলো একটুখানি অসাড় লাগছে। তাও পিনাকীদের দিকে তাকিয়ে বললাম, এখন ওইসব অলক্ষুনে কথাগুলো ভাববার দরকার কি? কখনোই ফিরতে পারব না, এমনটা আগাম ভেবে নিয়ে হাত-পাগুলোকে থামিয়ে দেব নাকি? যেদিকটাকে পাড়ের দিক বলে ভাবছি, সেদিকেই প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টাটা তো চালিয়ে যাই, তারপর যা থাকে কপালে। মনে রাখিস, পুরোপুরি ডুবে যাবার আগে কিছুতেই থামাব না হাত-পা।

কথাগুলো তখন নিজের কানেই হাস্যকর লাগছিল, তাও ওই সামান্য টনিকে তখনকার মতো কাজ হল, আমরা প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলাম আবার। সূর্য ততক্ষণে পশ্চিম আকাশে অনেকটাই হেলে পড়েছে।

## চার

কতক্ষণ ওইভাবে সাঁতার কেটে চলেছি, খেয়ালই পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, বহুকাল ধরে দু'জোড়া যন্ত্রের মতো ভাবলেশহীন নড়েচড়ে চলেছে হাত আর পা'দুটো। কিন্তু পুরোপুরি অনুভব করছিলাম, শরীরে আর তিলমাত্র বল নেই।

BanglaBook.org

ওই সঙ্গে অতি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে পাড়ে পৌঁছনোর তাবৎ আশা। আর, ওই ভাবনাটাই অতিদ্রুত শুষে নিচ্ছে মনের তাবৎ জোর। একরাশ হতাশা অতি দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে আমার শরীর, মন...। প্রতি মুহূর্তে হাত-পা'গুলো পুরোপুরি থেমে যেতে চাইছে।

চোখের সামনে একটি গোলাকার আকাশ। আকাশের একদিকে খাণ্ডার রমণীর ললাটের টিপের মতো সূর্যটা জ্বলছে, তবে ততক্ষণে তার শরীরে ঈষৎ কমলা রঙ ধরেছে। আর, আমাদের চতুর্দিকে, যতদূর দৃষ্টি যায়, একটি গোলাকার নোনা জলের পৃথিবী।

বুকের ওপর থেকে ফুটখানেক জল সামান্য উষ্ণ। তার তলায় বিশাল জলরাশি ক্রমশ শীতল। একেবারে পায়ের দিকটায় তা একেবারেই পাঁকের মতো কনকনে। তারও কত নীচে যে তল, কোনো ঠাহরই পাচ্ছিনে।

অনেকক্ষণ ধরে পিনাকী আর মুকুল নিথর হয়ে ভাসছিল। ভাসছিল মানে, কেবল মুণ্ডুদুটিই দেখতে পাচ্ছিলাম ওদের। একটু বাদেই একটি মুণ্ডু হারিয়ে গেল জলের তলায়।

সারাক্ষণ আমার চতুর্দিকে চলছে একটা জলদানবের তাণ্ডব। তারা আমাদের প্রতি মুহূর্তে গিলে ফেলতে চাইছে। দৃশ্যটা বেশিক্ষণ চোখ মেলে দেখা যায় না। ভয়ে, আতঙ্কে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে। সেই কারণেই মাঝে মাঝেই চোখদুটি পুরোপুরি মুদে ফেলছিলাম। সেই ফাঁকে সেই দানব নিঃশব্দে কেড়ে নিয়েছে আমাদের একজনকে। সেটা বেশ খানিক আগের কথা। তখনো আমাদের থেকে হাতবিশেক দূরে প্রাণপণে লড়ছিল সে। বলছি বটে, লড়ছিল, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, কোনো লড়াই-ই ছিল না ওটা। নাক অবধি ডুবে যাওয়া মুণ্ডুটাকে কোনো গতিকে ওপরের দিকে ভাসিয়ে রাখবার প্রাণপণ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা। এবং দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ক্ষণিকের জন্য চোখ মুদেছিলাম আমি। চোখ খুলেই দেখেছিলাম। আমার থেকে হাত বিশেক তফাতে দুটো মুণ্ডুর একটা নেই।

কার মুণ্ডুটা নেই, সেটাই বুঝে উঠতে বেশ খানিক সময় লেগেছিল আমার। কারণ ততক্ষণে দু'চোখে অল্প অল্প ঝাপসা দেখতে শুরু করেছি আমি। তাও বেশ খানিক বাদে নিশ্চিত হয়েছি, ওই মুণ্ডুটা পিনাকীরই ছিল।

কেন জানি, অনেকক্ষণ ধরে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, পিনাকীই

BanglaBook.org

আগে মৃত্যুর করাল জিহ্বার তলায় হারিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ যাবৎ চিঁ-চিঁ করে কথা বলছিল। আর, দুটো-একটা কথা বলেই হাঁফাচ্ছিল। সেটা অনেক আগের কথা। তারপর...অনেকক্ষণ যাবৎ কোনো কথাই বলছিল না ও। আমরা দুজনে লক্ষ্য করছিলাম, কিছু একটা বলবার চেষ্টা করেও কিছুতেই পারছে না পিনাকী। আর, ওর ডানার ঝটপটানিও মৃদু হতে হতে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ এক্কেবারে থেমে যাবার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। শেষের দিকে ওই ডানা ঝাপটানোর মধ্যে কোনো ছন্দ ও লয় ছিল না। তখনই প্রায় নিশ্চিত হয়েছিলাম, মৃত্যুর গহ্বরে ঢুকে পড়াটা, তলিয়ে যাওয়াটা ওর ক্ষেত্রে কেবল সময়ের অপেক্ষা।

আকাশে রোদ্দুরে যখন গাঢ় কমলা রঙ ধরেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার থেকে সামান্য তফাতে ভেসে থাকা মুকুলের মুণ্ডুটাও নিঃশব্দে ডুবে গেল। ওই বিশাল গোলাকার উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে সহসা আমি এক্কেবারে একা হয়ে গেলাম।

ততক্ষণে বৈকালিক হাওয়ার বেগটা খানিক বেড়েছে। আর, তাতেই আমার চারপাশে ছলাৎ...ছলাৎ...ঢেউয়ের বেশে মৃত্যুর হাজার হাজার লকলকে করাল জিহ্বা আরও উদ্দাম নৃত্য জুড়েছে। ফলত ক্রমশ ভয়ানক হয়ে উঠছে আমার দশদিক। ভয়ে দু'চোখ মুদে ফেলেও স্বস্তি ছিল না। কারণ, তাতে করে ভয়টা আরও শতগুণ জাঁকিয়ে বসতে চাইছিল। কিনা, এই বুঝি আমার চোখ মুদে থাকবার সুযোগে ওই জিহ্বাগুলো আরও অনেকখানি এগিয়ে এল আমার দিকে।

অনেকক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে বিশ্বাসটা দৃঢ় হচ্ছিল, এ যাত্রা আমি মরছি। আমার চারপাশে বিশাল নৃত্যশীলা জলরাশি যেন চারপাশ থেকে আমাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। এতক্ষণে আমার এও মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে সে আসছিল। কিন্তু আমি বড় একটা খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন আর খেয়াল না করে উপায় নেই, কারণ, এখন এই বিশাল জলসমুদ্রে আমি একেবারেই নিঃসঙ্গ, একলাটি। এই মুহূর্তে আমার চারপাশে আর অন্য কোনো শব্দই নেই।

কিছুক্ষণ যাবৎ মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমায় নিচের দিকে সমানে টানছে। প্রথমটা ভেবেছিলাম, কেউই টানছে না। আমার অসাড় শরীরটাই

BanglaBook.org

আর নিজেকে জলের ওপর তুলে রাখতে পারছে না। কিন্তু একসময় মনে হল, তা নয়। আমার শরীরের অসাড়তার সুযোগে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমায় একটু একটু করে আকর্ষণ করছে জলের আরও তলায়। পায়ের অনুভূতি থেকেই আমি আন্দাজ করতে পারি, সেখানে একেবারে তলদেশ অবধি হিমের মতো ঠাণ্ডা কনকনে জল!

তখন আমার চতুর্দিকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শনশন হাওয়ার সঙ্গে কেবল অবিরাম ছলাৎ...ছলাৎ শব্দ। আর, আমার দশদিকে কেবল মৃত্যুর হাজার হাজার লেলিহান জিহ্বা। সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন একেবারে শতমুখে হাঁ করে দশদিক থেকে গিলতে চাইছে আমায়। যেন প্রতি মুহূর্তে আমি একটু একটু করে সেঁধিয়ে যাচ্ছি ওর লকলকে জিহ্বার আকর্ষণে। যেমন করে ক্ষুধার্ত টিকটিকির জিহ্বার আকর্ষণে ক্ষুদ্র পোকাটি নিরুপায় সেঁধিয়ে যায় ওর মুখ গহ্বরে।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখা যায় না দৃশ্যটা। অথচ ভয়ে চোখ বন্ধ করতেও পারছি না। কারণ, চোখ বুজলেই আতঙ্কটা শতগুণ বেড়ে যায়।

ওই মুহূর্তে কত কথা মনে পড়ছিল আমার! ক—ত ক—ত কথা সব! মাথামুণ্ডু নেই সেসবের। কত স্মৃতি...অজীর্ণ, অদাহ্য...কত আক্ষেপ। কতকিছু করতে পারলাম না। কত ইচ্ছে, কতজনের জন্য কত সাধ! কতজনের প্রতি কত-কত অভিমান...! কত অপরাধবোধ! ওই অকূল সমুদ্রে মুণ্ডুখানা ভাসিয়ে রেখে চটজলদি কতজনের কাছে যে মাফ চেয়ে নিলাম আমি!

কিন্তু এতকাল বাদে কেনই বা মনে পড়ছে এতসব কথা? আজকের এই প্রেক্ষাপটে কীসের এমন প্রাসঙ্গিকতা ওগুলোর? তবে কি সত্যি সত্যিই চলে যেতে হচ্ছে আমায়! সত্যি কি আর কোনোদিনও ফিরে যেতে পারব না আমার চেনা পৃথিবীতে! ভাবতে ভাবতে অপরিসীম কষ্টে গলাটা ধরে আসে আমার। দিগন্তব্যাপী অগাধ জলরাশির মধ্যে আরও দু'ফোঁটা নোনা জল অজান্তে ঝরে পড়ে।

সহসা বাড়ির কথা মনে পড়ে। বাবা, মা, ভাইবোন, বন্ধুরা...। সবাই একে একে ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে। বুক জুড়ে কান্না ঘনিয়ে আসে। কেমন করে আমি যেন নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলি, একটু একটু করে তলিয়ে যাবার একেবারে মুহূর্তটি আমার জীবনে উপস্থিত। প্রাণঘাতী আততায়ীর মতো নিশ্চিতভাবেই আসছে সে। তার পায়ের শব্দ খুব স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি।

BanglaBook.org

আততায়ী শত্রু সাধারণত পেছন থেকেই আসে। খুব ডেসপারেট হলে সামনের থেকেও। আমার ক্ষেত্রে আমার ঘাতকটি আসছে দশদিক থেকে।

## পাঁচ

তখন রোদ্দুরে গাঢ় কমলা রঙ ধরেছে। সূর্যটা পশ্চিম দিগন্তে পুরোপুরি ঢলে পড়েছে। আমার চারপাশের অসীম জলরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। আমি কেবল নির্বিকার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখে চলেছি সেসব। কিন্তু ওই নিয়ে কোনো গূঢ় ভাবনা খেলছে না মনে। বাস্তবিক, মগজটা কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ভয়, ভ্রান্তি, সূক্ষ্ম ভাবনা, অনুভূতিগুলো সবই যেন পুরোপুরি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। ওই মুহূর্তে আমি যেন স্রেফ একটি হাত-পা নাড়ানো যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘদিনের অভ্যেসবশত ওই দু'জোড়া প্রত্যঙ্গকে একেবারে যান্ত্রিক লয়ে নাড়িয়েই চলেছি।

সহসা একটি ডিহি নৌকো আমার ঝাপসা দৃষ্টির সীমানায়! আমার থেকে বহু দূরে নৌকোটি ঠিক ছবির নৌকোর মতো দুলছে।

প্রথমে মনে হল পুরোটাই ভুল। আমার বিকারগ্রস্ত মনের বিভ্রম। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় মনে হল, দৃশ্যটা বাস্তব হলেও হতে পারে।

সহসা যেন আমার সবগুলি ইন্দ্রিয় পূর্ণোদ্যমে জেগে উঠতে চায়! প্রাণপণ চেষ্টায় তাকিয়ে থাকি নৌকোটির দিকে। এবং দেখতে পাই একটা রোগাপানা লোক ওই নৌকো থেকে প্রবল বেগে হাত নেড়ে নেড়ে আমাকে প্রাণপণে কী যেন বোঝাতে চাইছে। কিছু একটা বলছেও লোকটা, কিন্তু প্রবল বাতাসের শোঁ...শোঁ...আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছে তার মুখের আওয়াজ। আমি কেবল তার হাত নাড়াটাই দেখতে পাচ্ছিলাম। আর তাতে করে বুঝেছিলাম, সে আমাকে একটা বিশেষ দিকে সাঁতার কাটবার জন্য বারংবার উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। এবং আমি যেদিকে সাঁতার কাটছি, তার বিপরীত দিকটাকেই দেখাচ্ছে। মরণের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকটিকে বিশ্বাস করতে খুব সাধ জাগল মনে। আমি দিক পরিবর্তন করে বিপুল উদ্যমে সাঁতার কাটতে লাগলাম। তাই দেখে ডিহি নৌকোটি একটু একটু করে দূরবর্তী হতে থাকল। একসময় হারিয়েই গেল আমার দৃষ্টি থেকে।

BanglaBook.org

কতক্ষণ এভাবে সাঁতার কেটেছিলাম, মনে নেই। সহসা আবিষ্কার করলাম, আমার চোখের সামনে লম্বা ঝাউগাছের চুড়োগুলি উঁকি মেরেছে।

সহসা প্রবল উত্তেজনায় আমার সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। সারা শরীর জুড়ে যেন ফিরে এল অযুত হস্তীর বল। মনের তাবৎ অবসন্ন ভাবটি নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। হাত-পা'সহ শরীরের তাবৎ প্রত্যঙ্গগুলি সহসা শতগুণ জঙ্গী হয়ে উঠল। আমি প্রবল উদ্যমে সাঁতার কাটতে লাগলাম।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমার দৃষ্টির সামনে উঁচু ঝাউয়ের চুড়োগুলো আরও প্রকট হল।

বুকের মধ্যে একরাশ আনন্দ আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল।

প্রাণের শেষ স্পন্দনটুকুকে সমস্ত শরীর দিয়ে উপভোগ করতে করতে ক্রমশ নিশ্চিত হলাম, এ যাত্রা আর মরতে হচ্ছে না আমাকে।

BanglaBook.org

# বাঘের ডেরায় পৌঁছে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারি ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমরা যারা সুন্দরবন এলাকায় চাকুরিসূত্রে কাজ করেছি, তাদের বরাতে কখনো জুটে যায় আরও রাজকীয় যাওয়া। প্রায় চল্লিশ বছর আগের ঘটনা, কিন্তু আজও মনে হয় এই তো সেদিন—ক-দিন আগেই যেন ওতপ্রোত হয়েছিলাম সুন্দরবনের কত-কত জঙ্গলে!

সেসময় বহুবার সুন্দরবনের নানা এলাকায় ঘুরেছি, জল আর জঙ্গলের দেশটাকে চিনছি একটু একটু করে, কিন্তু সেবার নামখানার ফরেস্ট রেঞ্জারের সৌজন্যে ঘোরার সুযোগ পেলাম সুন্দরবনে জঙ্গলের একেবারে ভিতরে যাওয়ার। তার মধ্যে একটি 'নরম' জঙ্গল লোথিয়ান, অন্যটি গরম 'জঙ্গল', সেটি কলস। গরম অর্থ যে-জঙ্গলে বাঘ থাকে। যে-জঙ্গল বনবিভাগের কাছে সমীহ করার মতো।

লোথিয়ান জঙ্গল নামখানা থেকে খুব কাছেই, কিন্তু কলস অনেকটাই দূরে। বলা যায় গভীর সুন্দরবন। কলস জঙ্গল মাইলের হিসেবে অনেকখানি দূর তা নয়, তবে রোমাঞ্চের যদি কোনো মাপকাঠি থাকে তবে সেই মাপকাঠিতে অনেকখানি।

পশ্চিমবাংলার মানচিত্রের দক্ষিণে যে-হিজিবিজি রেখা থাকে, সেটাই বাস্তবে সুন্দরবন। এই গহন জঙ্গল চিরকালই রহস্যে ঢেকে রেখেছে মানুষকে। হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানায় অ্যাডেভেঞ্চার-পাগলদের। সুন্দরবনের জঙ্গলে যেতে হয় নদীপথে। এখানকার সব ক-টা জঙ্গলই তো এক-একটা দ্বীপ। জঙ্গল ঘন, কিন্তু গাছগুলো তেমন উঁচু নয়, গড়ে কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট তার উচ্চতা। উত্তরবঙ্গের তরাইয়ের উচ্চতার কাছে নিতান্তই শিশু।

সুন্দরবনের জঙ্গলের চারদিকে নদী বলে এসব জায়গা দুর্গম। তার উপর নদীতে প্রতিদিন দুবার জোয়ার ভাঁটা খেলে। ফলে জোয়ারের সময় জল ঢুকে যায় জঙ্গলের অনেক ভিতর পর্যন্ত। তাতে সারা বছর কর্দমাক্ত হয়ে থাকে গোটা দ্বীপ।

তখন সদ্য আলাপ হয়েছে নামখানা ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জার মি. খাস্তগীরের সঙ্গে। খুব আলাপী মানুষ দরাজ হৃদয়ের, অনেকদিন ধরেই

BanglaBook.org

উসকোচ্ছিলেন, চলুন, একদিন দেখে আসি কলস জঙ্গল। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রেসর্ট। বরাত ভালো থাকলে তেনাদের দেখা পেলেও পেতে পারেন। দেখা না পান, অন্তত তেনাদের ডাক বা গায়ের গন্ধ কিছু একটা জুটে যাবে নিশ্চয়।

মনের মধ্যে সেই অদৃশ্য বাঘের উপস্থিতি কী জানি কেন ছুঁয়ে গেল সেই মুহূর্তে। বাঘ সর্বদাই মনে উত্তেজনার খোরাক জোগায়, কী ছোটো কী বড়ো সবাইকার মনে।

মি. খাস্তগীর কথায় কথায় জানালেন জঙ্গল তদারকি ও সুন্দরবনের বিট-অফিসগুলিতে মাসপয়লার বেতন বিতরণ করতে যান নামখানা থেকে পাথরপ্রতিমা-কুলতলি পেরিয়ে হেড়োভাঙার দিকে। পথে ঠাকুরান নদীর বিশাল তরঙ্গ পেরিয়ে মাতলার মুখে বাঁয়ে চুলকাটি জঙ্গল ও ডাইনে কলস জঙ্গল।

মধুসংগ্রহকারী বা মউলে বা কাঠুরেদের মুখে শোনা ছিল কলসে এখনো বাঘের ডাক শোনা যায় প্রতিনিয়ত। মাটিতে অনবরত তাদের পায়ের ছাপ, আর সন্ধের লগনে বা ভোরের দিকে জঙ্গলের ভিতর মিঠেজলের পুকুরে তার জল খাওয়ার আনাগোনা। সেই লোভে অনুভব করি জঙ্গল দেখতে বেরিয়ে পড়ার টান। না, 'বাঘের দেখা'-র লোভে নয়, যদি লঞ্চ থেকে অন্তত একবারও বড়মিঞার দর্শনলাভ হয়।

অতএব এক শীতস্নিগ্ধ সকালে দুদিনের সফরে বেরিয়ে পড়া গেল নামখানা ঘাটের উদ্দেশে। রেঞ্জার ছাড়াও আমাদের সঙ্গী হলেন রেঞ্জার সাহেবের এক নিখিলমামা। ঢাউস চেহারা তাঁর, নাকের নীচে বুরুশের মতো কাঁচাপাকা মস্ত গোঁফ। নীল জিন্‌সের উপর সাদা আর নীল স্ট্রাইপের টি শার্ট। তাতে বেশ ইয়াং লাগছে তাঁকে। কাঁধে ঝোলানো একটি পুরোনো দিনের রাইফেল। জানা গেল তিনি একসময় জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরতেন শিকার করতে। হাতে নাকি বেজায় টিপ।

যাচ্ছি গহন জঙ্গলে। সঙ্গে একটা রাইফেল থাকা ভালো।

কাকদ্বীপ থেকে জিপে নামখানা, সেখান থেকেই নদীপথের যাত্রা শুরু। নামখানা ঘাট বেশ বর্ণময়। নদীর নাম হাতানিয়া দুয়ানিয়া। ঘাটের লম্বা জেটি ঘিরে অপেক্ষমাণ সার-সার লঞ্চ—তাদের মধ্যে আছে সেচদপ্তর ও

BanglaBook.org

বনবিভাগের অনেকগুলি অহংকারী লঞ্চ। অহংকারী, কেন না তাদের রক্ষণাবেক্ষণ হয় বহু অর্থ ব্যয় করে। তা ছাড়া মহকুমা শাসকের অধীনে আছে বেশ কয়েকটি স্টিমার ও লঞ্চ। আরও আছে পুলিশ বিভাগের লঞ্চ। তাদের গম্ভীর উপস্থিতির পাশে পাশে মাঝিমাল্লাদের হাঁকডাকে সরগরম হয়ে থাকে রঙিন পালতোলা মজবুত কেবিনওলা বোট ও ছোট ছোট ডিঙির রাশি।

আমাদের যাত্রা বনবিভাগের 'বনরানি' লঞ্চে। সেই সুদৃশ্য ও আরামদায়ক লঞ্চে উঠতেই ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, কলস যেতে তো সন্ধে হয়ে যাবে, তার আগে যাওয়ার পথে আপনাকে আর একটা সারপ্রাইজ দেব, মি. ব্যানার্জি।

কী সারপ্রাইজ তা অবশ্য তখনই ভাঙলেন না ফরেস্ট রেঞ্জার। উত্তেজনা দমন করতে হয় তখনকার মতো।

বনবিভাগের লঞ্চ হাতানিয়া দুয়ানিয়ায় ঢেউ ছড়িয়ে ক্রমে বাড়াতে থাকে তার গতি। পুবে বা দক্ষিণের হাওয়া থাকলে লঞ্চে শুরু হয় দোলা। ডেকের উপর বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে অনুভব করছি হাওয়ার দাপট। লঞ্চ দুলছে ঠিকই, কিন্তু মাঝবয়েসী সারেং খুবই চালাকচতুর, শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ভাঁটার সপ্তমুখীর মাঝে কোথায় চোরা-চড়া আছে তা বাঁচিয়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। পার হয়ে যাচ্ছে নদীর দুপাশে একের পর এক দ্বীপ, তার চারপাশে উঁচু বাঁধ। ভিতরে ধানের মাঠ ও কোথাও কোথাও লোকালয়।

হাতানিয়া দুয়ানিয়া নদী বরাবর কিছুক্ষণ এগোলে ডাইনে লোথিয়ান জঙ্গল, বাঁয়ে প্রেন্টিস আইল্যান্ড। দুদিকেই ঘন জঙ্গল ঝুঁকে আছে নদীর স্রোতের মধ্যে। ঘড়িতে নজর ফেলে দেখি ইতিমধ্যে অনেকখানি সময় অতিক্রান্ত। রেঞ্জারের সুদৃশ্য লঞ্চ 'বনরানি' লোথিয়ানের ঘাটে পৌঁছোতে সময় নিয়েছে দু-ঘণ্টা। নদী অতঃপর রওনা দিয়েছে সপ্তমুখী বরাবর।

আমাদের প্রথম গন্তব্য লোথিয়ান জঙ্গল। এখানেই রেঞ্জারসাহেব দেবেন তাঁর প্রথম সারপ্রাইজ। লঞ্চ তার মুখ ঘুরিয়ে ল্যান্ড করল ডানদিকের সবুজ ঝোপ-ঝোপ চেহারার জঙ্গলের জেটির কাছাকাছি। আমরা ডেকের উপর উঠে দাঁড়াই লোথিয়ান জঙ্গলের জেটিতে নামব বলে।

কিন্তু নামব কি! এখন ভাটার লগন, অনেকখানি জল নেমে যাওয়ায় জেটির মুখে বেশ কিছুটা চড়া। লঞ্চের শরীর প্রায় পাঁচফুট জলে ডুবে থাকে

BanglaBook.org

বলে জেটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না লঞ্চটা। কাছাকাছি একটা মাছের নৌকো ছিল, মাছ ধরা শেষ করে তারা তখন উদ্যোগ করছে নামখানা ফেরার, তাকেই ডাক দিলেন রেঞ্জার সাহেব, এই যে ভাই, আমাদের একটু পার করে দাও না। ওই যে জঙ্গলের কিনারে গরান কাঠের লম্বা জেটি দেখা যাচ্ছে, ওখানেই যাব আমরা।

জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এসব নৌকো, সঙ্গে বেড়াজাল, ছইয়ের ভিতর থাকে কম করে হপ্তার খাবার রসদ, রান্নার সরঞ্জাম। রেঞ্জারকে এ-তল্লাটের সব্বাই চেনে, তাঁকে ডেকের উপর দেখার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রম করে আমাদের সবাইকে নামিয়ে নিল নৌকোয়, তারপর উজান ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল কিনারের দিকে। দখ্‌নে তুখোড় হাওয়ায় ডিঙি টালমাটাল, ভাগ্যিস ডিঙিতে চড়া অভ্যেস ছিল, তাই বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল সপ্তমুখীর ঢেউয়ে ডিঙিনৌকোর নাচ। মাত্র একহাঁটু জল, ক্রমে বৈঠা ঠেকে গেল মাটিতে। অতঃপর লগি ঠেলে ঠেলে ডিঙিনৌকো পৌঁছে গেল জেটিতে।

একেবারে নতুন তৈরি গরানকাঠের লম্বা জেটি নদীর ভিতর থেকে ডাঙায় সেঁধিয়ে গেছে সোজা। যেখানে মাটি, সেখান থেকে বনবিভাগের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে নতুন বাঁধ, জঙ্গলের বুক চিরে গহন বনের মধ্যে এগিয়ে গেছে সেই বাঁধ। রেঞ্জার সাহেবকে বললাম, জেটি, বাঁধ সব একেবারে হালের তৈরি মনে হচ্ছে! এর আগে লোথিয়ানের পাশ দিয়ে বহুবার ঘোরাঘুরি করেছি, কই নজরে পড়েনি তো?

রেঞ্জার হেসে বললেন, ঠিকই অনুমান করেছেন। এই তো, কাজ এখনো চলছে। দেখছেন না, বাঁধের দুপাশে সবে কাটা হয়েছে গাছ। এখনো আধ-শুকনো হয়ে পড়ে আছে দুদিকে।

রেঞ্জার সাহেবের আসার খবর বোধ হয় হাওয়ায় চলে আসে তাঁর রাজত্বে। জেটির শেষে অপেক্ষায় তাঁর বিট অফিসার, ওয়াচার, সেপাই— সবাই। সেই সঙ্গে যারা কাজ করছে সেই লেবাররা।

জেটি পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাঁধ বরাবর হেঁটে আমরা ঢুকে পড়ি অসাড় জঙ্গলে। বাঁধের দুপাশে জলে ভেজা মাটি। ভরা কোটাল পার হয়েছে ক-দিন আগে। কোটালের জল জঙ্গলের ভিতর বহুদূর ঢুকে ভিজিয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

গেছে জঙ্গলের বুক। বাঁধের দুপাশে ঘন জঙ্গল। সুন্দরবনের কয়েকটি বিশেষ গাছ যারা নোনা জলে বেঁচে থাকতে পারে সেরকম লম্বা-লম্বা গাছ সবুজ ভেলভেটের ছাতার মতো ঢেকে আছে সমস্ত দ্বীপটা।

বাঁধের ওপর হাঁটতে হাঁটতে রেঞ্জার সাহেব বললেন, ক-বছর আগেও মাঝিমাল্লারা নাকি বাঘের গর্জন শুনেছে এই বনের ভিতর। তারা দেখেছে নদীর কিনারে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ।

গা ছমছম করে ঘন জঙ্গলের ভিতর এমন আচমকা উক্তিতে, বলে উঠি, তাই নাকি? আর এখন?

—বনবিভাগের হিসেব অনুযায়ী এখন এ বনে বাঘের চিহ্ন নেই আর। নিশ্চয় মানুষের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় তারা নদীতে সাঁতার কেটে সেঁধিয়ে গিয়েছে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে। বেশ কয়েক বছর কোনো পায়ের ছাপ দেখতে না-পাওয়ার ফলেই এই জঙ্গলে দখল নিতে পেরেছে বনবিভাগ।

—অন্য কোনো জন্তু-জানোয়ার?

—আমার লোকজন গত দু-তিনমাস এই বাঁধ তৈরি করেছে, জেটি তৈরি করেছে, আর একটু এগোলেই দেখতে পাবেন বানানো হয়েছে নতুন একটি টাওয়ার। দু-চারটে মোরগ ছাড়া আর কিছুই নেই এখন।

তবুও নিশ্চিত হতে পারলাম না, ছমছম করতে লাগল গা, সামনে-পেছনে যেদিকে তাকাই অসাড় জঙ্গল। মানুষজনের দৌরাত্ম্যে তেনারা নিজেদের দখল ছেড়ে চলে গেলেও সাঁতার কেটে ফিরে আসতে কতক্ষণ! সুন্দরবনের বাঘ সাঁত্‌রে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাওয়ার গল্প তো এদিকে হামেশা শুনতে পাই। ধইঞ্চি বা কলস জঙ্গলের দ্বীপ কি এখান থেকে খুব বেশি দূরে!

কিন্তু বাঁধ বরাবর আর একটু এগোতে আমার বিস্ময়ের পালা। জঙ্গলের ভিতর অনেকখানি জায়গা গোল করে পরিষ্কার করে ফেলা, সেই পরিষ্কার জায়গার একদিকে কাটা হয়েছে একটি চমৎকার পুকুর। ঠিক মাঝখানে একেবারে আধুনিকতম কায়দায় একটি সুদৃশ্য টাওয়ার, উচ্চতায় কুড়ি ফুটের ওপর। সজনেখালির টাওয়ারের চেয়ে অনেক অনেক চমৎকার। নদী থেকে প্রায় এক কিলোমিটার ভিতরে এমন একটি মন-জুড়োন দৃশ্য।

BanglaBook.org

রেঞ্জার মুচকি মুচকি হাসছিলেন, কি, অবাক করে দিয়েছি তো! বনবিভাগের কর্মী ছাড়া আপনি আর নিখিলমামাই দুই ব্যক্তি যাঁরা আমাদের এই টাওয়ার দেখতে পেলেন। এখনো মন্ত্রীকে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করানো হয়নি। টাওয়ারটা এখনো রং করতে বাকি আছে কিনা!

ভাবাই যায় না, নামখানা ঘাট থেকে এত কাছে এমন গা-ছমছমে পরিবেশ!

টাওয়ারের উপর উঠতে আরও এক বিস্ময়। হঠাৎ বড়ো হয়ে গেল দিগন্ত। দেখতে পাচ্ছি অনেকটা দূর পর্যন্ত। গোটা লোথিয়ান দ্বীপটাই তখন যেন হাতের মুঠোয়। সুন্দরবন এলাকায় বসবাস করতে করতে জেনে গেছি কোন্‌টা গেঁউয়া, কোন্‌টা কেওড়া, কোন্‌টা হেঁতাল, কোন্‌টা বাইন। সেই গাছগুলো ডাঁটাল চেহারা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে এত বড়ো দ্বীপটা। সমস্ত দ্বীপের জঙ্গল তখন দেখাচ্ছে একটি বৃহৎ সবুজ ছাতার মতো। একটু দূরেই— যেখানে জঙ্গলের শেষ, দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর তখন একেবারে খুব কাছে। যেন হাত বাড়ালেই তার ফিরোজা নীল জল।

কিছুক্ষণ পরে টাওয়ার দেখা শেষ হলে আমরা ফিরে আসি 'বনরানি'র কাছে। ততক্ষণে কিছুটা জোয়ার আসায় লঞ্চ চলে এসেছে জেটির কাছে। লঞ্চের খালাসিরা অপেক্ষা করছিল তাদের সাহেবের ফিরে আসার জন্য। লঞ্চের ডেক থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি জেটির উপর বিছিয়ে দিতে আমরা একে একে উঠে আসি লঞ্চের ডেকের উপর। সারেং প্রস্তুত ছিল, অমনি তীব্র স্বরে ভটভট শব্দ তুলে ঘুরিয়ে দিল লঞ্চের মুখ। লঞ্চ চলল পাথরপ্রতিমার দিকে।

একদিকে লোথিয়ান, অন্যদিকে প্রেন্টিস আইল্যান্ড ফেলে লঞ্চ তখন চলেছে সপ্তমুখী নদীর জল কেটে কেটে। সকালের নরম রোদ একটু একটু তীব্রতা ধারণ করছে। ক্রমে দুপাশেই লোকালয়। নদীবাঁধের ওপাশে দেখা যাচ্ছে পৌষের হলুদ হয়ে আসা ধান। দূরে দূরে গাছে ঢাকা গ্রাম দেখা যাচ্ছে দু-একটা। পাথরপ্রতিমার দ্বীপবহুল অঞ্চলে ঢুকে পড়ে লঞ্চ এখন গতি তুলছে তার শরীরে।

ইতিমধ্যে মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়। বনবিভাগের খালাসিদের মধ্যে কেউ কেউ রন্ধনশিল্পে অতি পটু। তাদের আঙুলের গুণে অচিরেই নীচের

BanglaBook.org

কেবিনের সামনে পাতা ডাইনিং টেবিল সেজে ওঠে গরম গরম সাদা দুধের সর চালের ভাত, ফুলকপির ডালনা, তোপসের ফ্রাই আর বাগদা চিংড়ি মালাইকারি সহযোগে লোভনীয় প্লেট। নিখিলমামা বেশ খাউন্তে মানুষ। সাতখানা প্রমাণ সাইজের বাগদা খেয়ে ঢেকুর তুললেন মস্ত করে।

আমাদের খাওয়ার মধ্যেই পার হয়ে যাচ্ছি এক-একটি দ্বীপ।

পর পর বনশ্যামনগর, জি-প্লট, কে-প্লট, ব্রজবল্লভপুর। রেঞ্জার একের পর এক দ্বীপে লঞ্চ ভিড়িয়ে তাঁর বেতন-দেওয়ার কাজ সারলেন অতিদ্রুততায়। সব ঘাটেই অপেক্ষা করছিল তাঁর বাহিনী।

শেষ লোকালয় সীতারামপুর, যার ধার ঘেঁষে আর এক 'ঘোষড়' জঙ্গল। ঘোষড় অর্থে অতিঘন। রেঞ্জার বললেন, এটা ধইঞ্চি জঙ্গল। মাঝিমাল্লাদের ভাষায় 'গরম চট', অর্থাৎ কিনা এই জঙ্গলে বাঘের বসবাস। ধইঞ্চি হল লোকালয়ের সবচেয়ে কাছের দ্বীপ যেখানে বাঘের আস্তানা। এই বাঘেরা কেউ কেউ খাবারের খোঁজে গিয়ে হাজির হয় ওপারের কোনো লোকালয়ে। তখনই তারা খবর হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বা টিভির নানা চ্যানেলে।

সীতারামপুরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিট-অফিস। এখানে জঙ্গল কেটে বিশাল অঞ্চলে কোকোনাট প্ল্যানটেশনের পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে, সজাগ পাহারায় আছে বিট-অফিসার। একদঙ্গল ওয়াচার অনবরত টহল দিচ্ছে নারকেল বনে। ততক্ষণে সন্ধে পেরিয়ে রাত। হ্যাচাক জ্বালিয়ে বিতরণ হল সব্বাইকার বেতন।

ইচ্ছে করলে এখানকার একটি বাংলোয়ে কাটানো যেত রাত। রেঞ্জার সাহেব প্রতিবার তাই করেন, কিন্তু এবার আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন অ্যাডভেঞ্চারে। লঞ্চ চলেছে এক নদী থেকে আর এক নদীতে।

ইতিমধ্যে কত যে নদী পার হয়ে এলাম, কত যে লোকালয় ছুঁয়ে এলাম পথে, কত যে জঙ্গলের বুনো গন্ধে ওতপ্রোত হলাম কয়েক ঘণ্টা!

ঠাকুরানের মুখে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত নটা। হিসেব করে দেখলাম প্রায় তেরো ঘণ্টা কেটে গেছে লঞ্চের কেবিনে বসে। সন্ধের দিকে অন্ধকার ছিল, এখন জ্যোৎস্না উঠছে ধীর লয়ে। লঞ্চের সার্চলাইনে যা দেখা যাচ্ছে তাতে শুধু জল জল আর জল। ইস্, কী বিশালাকার ঠাকুরান নদী!

ঠিক সেই মুহূর্তে লঞ্চের গতিবেগ কমে যেতে রেঞ্জার সাহেব ব্যস্ত হয়ে

BanglaBook.org

বললেন, একলব্য, এখানে নোঙর করার দরকার নেই। ঠাকুরানটা পার হয়ে চলো।

সারেং অবাক হয়ে বললেন, স্যার, এত রাতে ঠাকুরান পার না-হওয়াই ভালো। আপনি তো জানেন এদিকে রাতের বেলা জলডাকাতরা ঘোরাঘুরি করে নৌকো নিয়ে। কখন কী হয় না হয় তার ঠিক আছে!

নিখিলমামা তখন রেঞ্জার সাহেবকে বলছেন, সে কী, রেঞ্জার সাহেব, রাতে কলস-এ থাকব বলে এই প্রোগ্রাম, এখন এই নদীর ধারে রাত কাটাতে হবে! জ্যোৎস্নারাত্রিটাই তো মাটি!

রেঞ্জার সাহেব তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারেংকে বললেন, একলব্য, আমাদের সঙ্গে তো একটা রাইফেল আছে। একজন সিপাহি সঙ্গে আছে, তার হাতেও তো আছে একটা বন্দুক। ডাকাত এলে তখন ভাবা যাবে, তুমি এগিয়ে চলো।

সারেংকে বেশ ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল, কিন্তু কলস জঙ্গলে রাত্রিবাস করতে আসা, কোনোক্রমেই তার অন্যথা হতে দেওয়া চলবে না। একলব্য আবার ইঞ্জিনে বসা ড্রাইভারকে ঘণ্টি নাড়িয়ে ইঙ্গিত করতে ইঞ্জিনের শব্দ গাঢ় হল, লঞ্চ তখন হু-হু করে পার হচ্ছে ঠাকুরানের বিশাল জলরাশি।

তখন আকাশের চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্রমশ, জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে নদী, জল চিকচিক করছে, এই পটভূমিতে শুধু রোমাঞ্চিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

যখন লঞ্চ ঠিক ঠাকুরানের মাঝ বরাবর, তখন আগে পিছে কোনো দিকে কূলের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু ধোঁয়া-ধোঁয়া, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, চলছি তো চলছিই! কিন্তু ঠাকুরান পার হতে কি এই এত সময় লাগে!

নিখিলমামা সংশয়-সংশয় কণ্ঠে বললেন, কী হে, রেঞ্জার সাহেব, বঙ্গোপসাগরে ঢুকে পড়লাম না তো! তাহলে তো সাড়ে সর্বনাশ! সারা রাত ধরে চললেও কূল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মি. খাস্তগীরকেও চিন্তিত দেখা গেল, কিন্তু সারেং একলব্যের উপর তাঁর ঢের আস্থা। সারেং একটু ক্ষেপে আছে, তাঁকে এ সময় না ঘাঁটানোই শ্রেয়।

কিন্তু না, আমাদের আশঙ্কাকে সামুদ্রিক হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লঞ্চ ঢুকে পড়ল একটা খালে। রেঞ্জার সাহেব স্বস্তির শ্বাস

BanglaBook.org

ফেলে জানালেন এই খালটা ঠাকুরান ও মাত্‌লার সংযোগরক্ষাকারী, খাল পার হলেই ওপাশে মাত্‌লা নদী। সেখানেই কলস।

ছোট্ট খাল, দুপাশে জঙ্গল ঝুঁকে আছে নদীর জলে, সেই ডালপালা কখনো ছুঁয়ে যাচ্ছে লঞ্চের ডেকও। লঞ্চ যখন তীরের কাছ ঘেঁষে চলছে, তখন গেঁউয়া বা বাইনের গাছ হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় দেখতে পাচ্ছি অদূরে হেঁতালের ছোটো ছোটো ঝোপ, কিছু বনঝাউ। জোয়ারে যতখানি জল জঙ্গলের ভিতরে ঢোকে, সব কাদা-কাদা।

টানা চোদ্দ ঘণ্টা এ-নদী ও-নদী ঘুরে অবশেষে এসে পৌঁছলাম যে-জঙ্গলের কাছে, রেঞ্জার জানালেন, এটাই সেই বিখ্যাত কলস জঙ্গল।

জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছতে একটা খাঁড়ির কাছাকাছি নোঙর করা হল লঞ্চ। অবশ্য জঙ্গল সেখান থেকে অনেকটাই দূরত্বে। কলস জঙ্গলে বাঘ আছে, অতএব সবুজ গাছগাছালির মধ্যে চোখ চালিয়ে চেষ্টা করি তেনাকে কোথাও দেখা যায় কি না! বেশ শিহরনও হচ্ছে শরীরে। ভাবছিলাম বড়ো নদীতে নোঙর না করে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে নোঙর করা যায় কি না, তা হলে জঙ্গলের আরও কাছে থাকা যাবে। কিন্তু সারেং বলল, এত কাছে নোঙর না করাই ভালো, কারণ বাঘ ভালো সাঁতার জানে। কখন নিঃশব্দে সাঁতার কেটে আসে কে জানে।

খাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে চাইছিলাম কেন না শুনেছি রাতের দিকে বাঘ নদীর ঘাটে জল খেতে আসে, অতএব খাঁড়ির কাছাকাছি থাকলেই বাঘকে মুখোমুখি দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা। সুন্দরবনের এত ভিতরে এসে বাঘ না দেখে ফিরে যাওয়াটা কোনো কাজের ব্যাপার নয়।

গন্তব্যে পৌঁছোতে সারেঙের মেজাজ ততক্ষণে শরিফ। একগাল হেসে জানায় তার পনেরো বছরের লঞ্চজীবনে মাত্র একবারই বাঘের দেখা পেয়েছিল, তাও গোটা বাঘ নয়, তার লেজের অগ্রভাগমাত্র। তাই তার অভিজ্ঞতা বলে, বাঘের দেখা পাওয়া খুবই অসম্ভব ব্যাপার। খুব বেশি লোকের ভাগ্যে বাঘ দেখা হয়ে ওঠে না।

রেঞ্জার সাহেব হেসে বললেন, একলব্য কথাটা খারাপ বলেনি। আমারও তো এখানে পাঁচ বছরের উপর চাকরি হয়ে গেল, এখনো চাক্ষুষ করে উঠতে পারিনি দক্ষিণরায়ের সেই বাহনকে। আসলে কী জানেন!

BanglaBook.org

বাঘ দেখব এরকম ভাবাটাই রোমাঞ্চের। বাঘ দেখা মোটেই নিরাপদ নয়।

ততক্ষণে থেমে গেছে লঞ্চের একটানা ঘর্ঘর শব্দ, ইঞ্জিন নিশ্চুপ হতে অমনি কানে যায় রকমারি পাখির ডাক। কিন্তু আমরা তো পাখির ডাক শুনতে আসিনি, তাই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। রাত গভীর হলে সারেং এসে জানাল, স্যার, কান পাতুন ভালো করে, হরিণ ডাকছে। হরিণ? সত্যিই তো, জঙ্গলের ভিতর থেকে এক দারুণ মধুমাখানো সুর 'টু-উ', 'টু-উ' ভেসে আসছে। কিন্তু হরিণের ডাকে আপাতত মন ভরলেও সারারাত জ্যোৎস্নায় ভিজতে ভিজতে আমরা হরিণ নয়, বাঘের ডাক শুনতে চাই।

আমার তখনো বিশ্বাস নিশ্চয় রাতের কোনো এক সময় তেনারা আসবেন জল খেতে, অতএব ডিনারের আগে এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে ডেকের চেয়ারে বসে থাকি নিখিলমামা আর রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে। অনেক রাত পর্যন্ত লঞ্চের ডেকে বসে কাটালাম, কিন্তু কী বরাত, নিষ্ফল সেই প্রতীক্ষা। একটু পরে চাঁদ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, জ্যোৎস্নায় চাপুড়চুপুড় হয়ে ভেসে গেল লঞ্চের ডেক, চারপাশের নদী, জঙ্গল। সব মিলিয়ে এমন চমৎকার দৃশ্য যে বাঘ না-দেখার কষ্ট ভুলে গেলাম সেই মুহূর্তে।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ জলে চকাস চকাস শব্দ হতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। দেখি বাঘ নয়, একদঙ্গল সাদা ধবধবে হরিণ এসে জল খাচ্ছে জঙ্গলের কিনারে। ছোটো বড়ো মিলিয়ে চারটি। কী ফুটফুটে চেহারা তাদের। জলজ্যান্ত একটা বিপুলাকার লঞ্চ অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখেও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

জঙ্গলে এমন স্বাধীনচেতা হরিণের দল দেখে আমরা চমৎকৃত। ওদের মনে হয় কিন্তু একটুও ভয় নেই, বরং আমরাই ভয় পাচ্ছিলাম, বুঝি হঠাৎ একটা বাঘ এসে ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হরিণগুলো জল খেয়ে বনে ফিরে যাওয়ার পর বাকি রাত আমরা ডেকের উপর বসে কাটাই। কিন্তু নাহ্, বাঘ আর আসবে না।

নিখিলমামা রেঞ্জার সাহেবকে দুয়ো দিতে বললেন, কলস-জঙ্গলে বাঘ নেই, বাপু। তোমরা মিছিমিছি রাত জাগালে।

ডেকের উপর চেয়ারে হেলান দিয়ে থাকতে থাকতে ভোররাতের দিকে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি একসময়।

BanglaBook.org

ঘুম ভাঙতে বেলা আটটা। চা খেয়েই নিখিলমামা বললেন, চলো রেঞ্জার সাহেব, আমরা এবার কিনারে নামি। ঘুরে ফিরে দেখি জঙ্গলটা। এদিকটায় বেশ বালি আছে, পায়ে কাদা লাগার ভয় নেই।

কিন্তু যদি সত্যিই বাঘ আসে!

সারেং একলব্য নিষেধ করে বলল, যাবেন না স্যার। এ জঙ্গল ভালো নয়!

নিখিলমামা কাঁধে বন্দুকটা ঝুলিয়ে বললেন, আমিই তো আছি, বাঘের মহড়া নিতে পারব নিশ্চয়। তোমার সঙ্গে সিপাহি আছে!

রেঞ্জার সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, বাঘ সামনে এলেও বন্দুক চালানো যাবে না, নিখিলমামা। বাঘ মারা নিষেধ।

নিখিলমামা মানতে চাইলেন না, বললেন, কিন্তু আত্মরক্ষার্থে তো বন্দুক চালানো যায়।

—তাও যায় না, নিখিলমামা। জঙ্গলে এভাবে যাওয়াই তো নিয়মবিরুদ্ধ।

কিন্তু তখন সমবেত চাপে রেঞ্জার সাহেব চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। আমরা সবাই মিলে জঙ্গলের ভিতর সেঁধিয়ে যাই। রীতিমতো কাঁপছি উত্তেজনায়—একদম 'গরম চট' জঙ্গলের ভিতরে পা রাখছি প্রবল হঠকারীর মতো। পায়ে পায়ে অনেকটা ভিতর পর্যন্ত চলে যাই। চারপাশে কত নাম-না-জানা গাছ। কিছু কিছু চেনা! ক্যাওড়া, বাইন, গেঁয়ো ছাড়াও এখানে চারদিকে বনঝাউ। বনঝাউ-এর ডালে দুটো বিশাল সাইজের মৌচাক।

ঝাউ-এর বনে মৌমাছির গুনগুন শব্দও কানে আসে। কিন্তু রেঞ্জার সাহেব বললেন, এই শব্দ ঝাউপাতার, ঝাউয়ের মিহি পাতায় বাতাস বয়ে গেলে এরকম সুরেলা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

পরক্ষণে নিখিলমামা ঝোপের মধ্যে কী এক সরসর শব্দ শুনে 'ওরে ব্বাপ' বলে লাফিয়ে উঠে সরে যান নিরাপদ দূরত্বে। চমকে উঠে দেখি কালো ফিনফিনে চেহারার একটি সাপ।

নিখিলমামা হিসহিস করে বললেন, ভেরি পয়েজনাস!

হেঁতালের বনে এরকম একটি বিষধর সাপের সরসর সরে যাওয়ার দৃশ্য দেখে ছাঁত করে ওঠে বুকের ভিতর। রেঞ্জার সাহেব বললেন, লোকে

BanglaBook.org

বলে সুন্দরবনের জঙ্গলে পায়ে-পায়ে মৃত্যু। আর বেশি না-যাওয়াই ভালো।

কিন্তু আমাদের মাথায় তখন যেন অ্যাডভেঞ্চারের প্রবল নেশা। ভিতরে ঢুকছি তো ঢুকছিই।

হঠাৎ ঝোপঝাড় ঠেলে সশব্দে ছুটে গেল ধূসর রঙের কী ওটা! হুঁ, একটা বনশুয়োর!

নিশ্বাস কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার বুকের মধ্যে ফিরে পেলাম বাতাস।

হাঁটতে হাঁটতে বোধ হয় এক কিলোমিটার মতো ঢুকে এসেছি, হঠাৎ দেখি একটা পুকুর, তার অর্ধেক ভর্তি জল। পুকুরের কিনারে যেতে রেঞ্জার সাহেব বললেন, এই পুকুরগুলো কাটা হয়েছে আমাদের দপ্তর থেকে। চারদিকের নদীনালায় নোনাজল, কিন্তু এই পুকুরের জল মিষ্টি।

কেন তা ব্যাখ্যাও করলেন তিনি, বললেন সুন্দরবনের বাঘ নোনাজল খায় বলেই তার প্রকৃতি এত হিংস্র। তাদের হিংস্রতা কমানোর লক্ষ্যেই মিষ্টিজল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে বনবিভাগ।

তাঁর বিবরণের মধ্যে হঠাৎ আমার চোখে পড়ে নদীর কিনারে সারি সারি পা-ছাপ।

চমকে উঠে বলি, দেখুন তো রেঞ্জার সাহেব, ওগুলো কীসের ছাপ! হরিণের কি!

নিখিলমামা তৎক্ষণাৎ বললেন, মাই গুডনেস! হরিণের পায়ের ছাপ তো আছেই, কিন্তু তার পাশে এ তো বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ। রেঞ্জার সাহেব, আর এখানে একটুও থাকা নয়। চলো, লঞ্চে ফিরি।

বলতে বলতে তিনি তাঁর কাঁধের রাইফেল, তুলে নিলেন দু-হাতে।

রেঞ্জার সাহেব চমকে উঠে কণ্ঠ নামিয়ে বললেন ঠিকই বলেছেন, মামা। চলুন, চলুন। সারেং ঠিকই বলেছিল ভিতরে যাওয়া ঠিক হবে না।

বুঝতে অসুবিধে হয় না আমরা পৌঁছে গেছি রয়েল বেঙ্গলের খাস ডেরায়। তৎক্ষণাৎ পা চালিয়ে ফিরতে থাকি নদীর দিকে। দ্বীপের ভিতর ঢোকার সময় ছিল এক ধরনের রোমাঞ্চ, কিন্তু ফেরার পথে উসকে উঠছে প্রবল ভয়। কথায় বলে, বাঘের দেখা আর সাপের লেখা। একবার বাঘের মুখোমুখি হলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।

BanglaBook.org

সঙ্গের সিপাহিটি তার হাতের বন্দুক বাগিয়ে বলল, স্যার, আমি যখন আছি, আপনাদের ভয় নেই। সাবধানে পা ফেলুন।

কিন্তু বিপদের মুহূর্তে ফেরার পথ সবসময়েই খুব দীর্ঘ হয়। মাতলার দেখা আর পাচ্ছিই না যেন! তা ছাড়া পথ তো সহজ নয়, ঝোপঝাড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে ভিজে-ভিজে মাটি পার হয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাতলার দেখা পেতে একটু স্বস্তি। খালাসিরা প্রস্তুত ছিল, তৎক্ষণাৎ বিছিয়ে দিল কাঠের সিঁড়ি। ধুপধাপ করে উপরে উঠতে এতক্ষণ সবার মুখে প্রাণ ফিরে পাওয়ার হাসি।

সেদিনের সেই অ্যাডভেঞ্চার বোধ হয় আমার জীবনের বিপন্নতম। একটি বিষধর সাপের সরসর করে পার হয়ে যাওয়া, একটি বন্যোওয়োরের চকিত দেখা দিয়ে পালানো, সবকিছুর মধ্যে বোধ করেছিলাম সাংঘাতিক ভয় আর রোমাঞ্চ। কিন্তু সবচেয়ে দম-আটকানো দৃশ্য সেই মিঠে পুকুরের তীরে বাঘের টাটকা পা-ছাপ, হরিণদের পায়ের পাশাপাশি।

বাঘ দেখা হয়নি আমাদের, অবশ্য লঞ্চ থেকে জঙ্গলে ঢোকার পর কেউই আর বাঘ দেখতে চাইনি আমরা।

BanglaBook.org

# শীত-বসন্ত

## অনিতা অগ্নিহোত্রী

স্বপ্ন দেখছিল রিমা, সজল-এর বউ, বিজির মা। মেয়ের নাম রাখা হয়েছিল, বড় করে; সেকেলে নয় ক্ল্যাসিক্যাল নাম—বিজয়লক্ষ্মী।

মুখে মুখে, দেশে ও বিদেশে সে এখন বিজি। শীত রাতের ঘুম সাধারণত গভীর হয়, আর দীর্ঘ। দেশের রাজধানীতে শীত তীব্র, যেমন কঠোর গ্রীষ্মকাল। রিমা ভালো করে ঘুমোতে পারছিল না, ওর শীত করছিল, লেপের নীচ দিয়ে যেন ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে আসছে। ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরছিল,

জেগে যাচ্ছিল, অথচ কী আশ্চর্য, লম্বা একটা ট্রেনের মতো স্বপ্নটা ছুটে যাচ্ছিল ওর ঘুমের ভিতর দিয়েই।

স্বপ্নে রিমা দেখছিল, ও কাচের দরজা দিয়ে নিজেদের খিড়কি বাগানটার দিকে তাকিয়ে আছে—জংলা ঘাসে ঢাকা অগোছাল লন, তিন চারটে ঝুপসি পেয়ারা গাছ, লম্বা সরু একটা সবজির খেত। বাগানে অন্ধকার খুব ঘন নয়, বরং জ্যোৎস্নায় যেমন আলো-ধোয়া রং আসে চরাচরের— তেমনই। বরফ পড়ছে বাগানে। পেয়ারা গাছগুলির পাতা, ডাল নুয়ে গেছে সাদা বরফে। সবজির খেতে মাটি জুড়ে বরফ। লনের ঘাস ঢেকে যাচ্ছে বরফের পুরু আস্তরণে। অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্নটা চলেছে বলে রিমা ঘুমের মধ্যে একটু ভাবনারও সুযোগ পাচ্ছিল। হিমাচল প্রদেশে বরফ পড়েছে ক'দিন আগেও, কাশ্মীরে আরম্ভ হয়েছে—ওখানকার রেলওয়ের সুড়ঙ্গপথ বন্ধ হয়ে গেছে বরফের জন্য—কিন্তু দিল্লিতে কি বরফ পড়ে? কখনো পড়েনি কি? রিমা ঘুমের মধ্যে ভেবে মনে করতে পারছিল না।

হঠাৎ বাগানের মধ্যে যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠেছে একটা মানুষ। রোগা, লম্বা। গেঞ্জি আর পাতলুন পরা। আরে এ তো মালি গোবিন্দরাম। বুড়ো মানুষ, অথচ খুব গরমেও মাথায় বেঁধে রাখে মাফলার। লোকটা যেন ঠক ঠক করে কাঁপছে, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, ভয় পাওয়া...ওর মায়ের গোছ পর্যন্ত ডুবে গেছে বরফে, মাথার মাফলারে বরফের স্তর...

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল রিমা। মাথার বালিশের কাছে মোবাইল থাকে। সময় দেখল, রাত আড়াইটে। লেপে ভালো করে মাথা পর্যন্ত ঢেকে পাশেই ঘুমোচ্ছে সজল। সজল ঘুমের মধ্যে পুরো লেপটা টেনে নিয়ে নেয় বলে আজকাল রিমা নিজের লেপ আলাদা করে নিয়েছে। তাতে শীতের বোধ বেড়েছে বই কমেনি। সজলকে না জাগিয়ে ভিতর-বারান্দায় চলে এল রিমা।

ওয়াইফাই অন করে নিজের আইপ্যাড খুলে বসল। এসব খেলনাপাতির খুব বেশি কিছু জানে না রিমা, তবে বছর কয়েক আগে ই-মেল করতে শেখার পর আজকাল গুগ্‌ল সার্চটা রপ্ত করেছে। গুগ্‌ল খুলে আগে বিজির ফ্লাইটটা ট্র্যাক করল রিমা। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে যাত্রা করে বিজিদের প্লেন এখন সোজা উত্তরে গিয়ে নর্থ পোল-এর ওপর দিয়ে আকাশ পেরোচ্ছে

BanglaBook.org

মেরুপ্রদেশের। আরো ছ-সাত ঘণ্টা পর কানাডার কাঁধের উপর দিয়ে নেমে শিকাগোতে ল্যান্ড করবে। প্লেনের যাত্রাপথের দিকে তাকালেই যেন বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে। এত দূরের পথ, তার ওপর এত শীত!

আবহাওয়া নিয়ে প্রতিদিনের, সপ্তাহের, মাসের ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য একটি ওয়েবসাইট আছে। এই সব ভবিষ্যৎবাণীর সত্যমিথ্যা যাচাই করে কেউ মতামত দেয় না—কিন্তু সাইটগুলো বেশ জনপ্রিয়। সেইটা খুলে আগামী কালের তাপমান দেখল রিমা।

শিকাগো—মাইনাস একুশ ডিগ্রি! গতকালও দেখেছে। যতবারই দেখে, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ভয়ের স্রোত নেমে যায়। তাপমান দেখতে দেখতেই আঙুলের স্পর্শে চালু হয়ে গেল আর একটা সাইটের ভিডিও।

খুবই উত্তেজিতভাবে ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছেন একজন আমেরিকান আবহাওয়া তাত্ত্বিক—

ঝোড়ো হাওয়া বইছে—আসছে তুষারঝড়—সাত-সাতটা লেয়ারের পোশাক পরে আছি—তাই গায়ে লাগছে না—আমার পিছনে ওটা কি দেখতে পাচ্ছেন? না, না মাঠ নয়—বরফে ঢাকা মিসিগান লেক—জমে শক্ত হয়ে গেছে—দেখবেন, গিয়ে হেঁটেও আসতে পারি—

ধারাভাষ্যের ভল্যুমটা হয়তো একটু জোর হয়ে গেছিল। সজল বিছানা ছেড়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, গায়ে একটা শাল। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল রিমার দিকে—একি, সোয়েটার নেই, শাল গায়ে দাওনি—এখুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে তোমার!

—কিচ্ছু লাগবে না, কিচ্ছু হবে না, মেয়েটা কি করবে বল তো, মাইনাস একুশ ডিগ্রি ঠাণ্ডা ওখানে!

সজল সোফাতে রিমার পাশে বসে ওকে জড়িয়ে ধরল।—ওখানে সবাই অভ্যস্ত হয়ে যায়—দেখছ না ইথিওপিয়ার মতন দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এসে মানিয়ে নিচ্ছে অত শীতে!

—ওয়েদার ভিডিওর লোকটা বলছিল—মিনিট দশেক বাইরে থাকলে নাকি ফ্রস্টবাইট হয়ে যাচ্ছে!

—তুমি বুঝি ঠাণ্ডায় ফ্রস্টবাইট হওয়ার জন্য বসে আছ! আরে পাগল, সজল ওর পিঠে থপ্ থপ্ চাপড় মারল—শোনোনি—দেয়ার্জ্ নাথিং কল্ড্

BanglaBook.org

আ ব্যাড কোল্ড্, দেয়ার্জ্ ওনলি ইনঅ্যাডেকোয়েট ক্লোদিং—অর্থাৎ কিনা, যদি ঠিকঠাক পোশাক পরো, যে কোনো ঠাণ্ডার মোকাবিলা করতে পারবে!

সজল রিমাকে জোর করে তুলে নিয়ে লেপের তলায় শুইয়ে দিল—তখনো সামান্য সময় গরম পোশাক না পরে বাইরে থাকার ফলে ওর দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

রিমা শুয়ে শুয়ে ভাবছে, কেবল টাকার জন্য পিছিয়ে এল ওরা, বিজির টিকিটটা বদলানোর ঝুঁকি নিতে পারল না। সজল যদি একটু বেহিসেবী হত! গতকাল ভোরে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে শিকাগো যাওয়ার জন্য টিকিট কাটা ছিল বিজির।

ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখ থেকে জানুয়ারির মাঝ পর্যন্ত—ক্রিসমাসের ছুটি য়ুনিভার্সিটিতে। তিন সপ্তাহের মতো টানা ক্লাস বন্ধ—তাই এইসময় ক্যাম্পাসে কেউ থাকে না। আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা চলে যায় নিজের অথবা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। বিদেশীরা ফিরে যায় দেশে। এই সময় টিকিটের দাম হয়ে ওঠে আকাশছোঁয়া—তাই সকলেই প্ল্যান করে আগেভাগে টিকিট কেটে রাখে। বিজিও কেটেছিল। দিল্লির ডিসেম্বর জানুয়ারি বেশ ঠাণ্ডা—তবে আমেরিকার শীতের তুলনায় নস্যিই। ছুটিতে বাড়ি এসে খুব এনজয় করেছে বিজি। পথে বরফ নেই, বরফগলা কাদা নেই, পরত পরত সোয়েটার আর জ্যাকেট পরার ঝামেলা নেই—রিমা আর সজলও কিছুদিন মেয়েকে কাছে পেয়ে নিশ্চিন্ত। শীতের মাসগুলোয় দুবেলা মেয়ের সঙ্গে স্কাইপ করে আর রোজ ওয়েদার রিপোর্ট দেখেও রিমার মনে শান্তি থাকে না। রিমার নিজের অবশ্য ভালোই শীত করে দিল্লির ডিসেম্বরে। এদেশে তো আমেরিকা-য়ুরোপের মতো সেন্ট্রাল হীটিং নেই! ইট পাথরের বাড়িগুলি শীতের গোড়া থেকেই বাইরের যাবতীয় ঠাণ্ডা টেনে নিয়ে হিমশীতল হয়ে বসে থাকে। তাই দিনে-রাতে দুবেলাই বাইরের চেয়ে ঘরে বেশি ঠাণ্ডা। এইরকম শীতের অনুভূতি অবশ্য রিমার একারই—বিজি দিব্যি ছুটে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে, সজলেরও তেমন ঠাণ্ডার বোধ নেই।

দেখতে দেখতে বিজির ফিরে যাবার দিন চলে এল। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ। মকর-সংক্রান্তির পর ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে শীত, এই আশায় দিন গুনছে বস্তির বাসিন্দা আর বেঘর পরিবারগুলি। অথচ এই সময়েই ভয়টা

BanglaBook.org

ঘন হয়ে আসছিল রিমার শরীরে মনে। সজলের ভাষায় এটা যুক্তিহীন প্যানিক। যাই বলুক সজল, নিজের ভয়ের বোঝা নিয়ে রিমা যায় কোথায়?

ঠিক এই সময় আরম্ভ হয়ে গেল উত্তর মেরু থেকে বয়ে আসা শৈত্যপ্রবাহ—উত্তর-পূর্ব আমেরিকার হাড় কাঁপিয়ে। তুষার ঝড়, বরফপাত এবং ভয়ংকর ঠাণ্ডা। কানাডা-আমেরিকার সীমা বরাবর যে রাজ্যগুলি, সেইসব অঞ্চলে শীতের দাপট বহুগুণ বেড়েছে। এয়ারপোর্টে উড়তে না পেরে গ্রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে প্লেন। পথে গাড়ি চলাচল বন্ধ—জমে ওঠা তুষারের কঠিন স্তূপ সর্বত্র। বিজি যাবে শিকাগোর দক্ষিণ-পূর্বে, এয়ারপোর্ট থেকে তিন ঘণ্টার রাস্তা—শিকাগো এয়ারপোর্টের বাইরেই বাস দাঁড়ায়। ওর য়ুনিভার্সিটির ক্যাম্পাসটা বিশাল, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-গীর্জা সব মিলিয়ে বৃহৎ ব্যাপার, কিন্তু শহরটা ছোট। ছোট শহরের কিছু নিজস্ব অসুবিধে আছে— নামগোত্র হীনতার—এটাও ভয় ধরাচ্ছে রিমার মনে।

কাজেই মেয়ে যখন ফিরে যাবে বলে ছোটখাট শপিং করছে আর ব্যাগ গোছাচ্ছে, তখন থেকেই রিমা বার বার বলে যাচ্ছে, ওরে এখন যাস্ না, যাস না...

মেয়ে বিরক্ত হয়। বলে, কখন যাব তবে? পড়াশুনো শেষ করতে হবে না? ডিগ্রি নিতে হবে না?

ক'দিন পরে যাস্। ঠাণ্ডাটা বয়ে অন্য কোথাও চলে যাক্!

বিরক্ত হয় সজলও।

এটা অর্থহীন প্যানিক হয়ে যাচ্ছে না, রিমা? মেয়ে যখন ওখানে অ্যাডমিশন নিল, তুমি তো ওর সঙ্গে শীত বসন্ত গ্রীষ্ম সব ঋতুর ছবিটবি দেখেছিলে। দেখোনি? বরফে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির লন, গাছপালা, বাসস্ট্যান্ড—তখন তো দেখে কী সুন্দর, কী সুন্দর বলছিলে! তারপর সুন্দর সবুজ মাঠ, ফুল, বড় বড় গাছ, গথিক বাড়িঘর—সে সবও তোমার কত ভালো লেগেছিল! ঠিক আছে, মেয়ে পড়তে গেছে এমন একটা শহরে যেখানে বছরে ছ মাস শীত—আর চার মাস ভীষণ শীত—তাপমান তখন মাইনাস দশ থেকে পঁচিশের মধ্যে ওঠানামা করে—ওখানে তো দুনিয়ার নানা দেশ থেকে আরো কত ছেলেমেয়ে পড়তে এসেছে। আজকাল তো আরো ছোট্ট বয়সে ছেলেমেয়েরা আন্ডারগ্র্যাড করতে যাচ্ছে কানাডা, রাশিয়া,

BanglaBook.org

মঙ্গোলিয়া, আইসল্যান্ডে—উত্তর নরওয়েই বা কী এমন আহামরি—যদিও মেরুপ্রদেশের আলোর খেলা দেখা যায় ওখান থেকে—তাদের সবার বাবা-মা বুঝি সারাক্ষণ ওয়েদার রিপোর্ট দেখে আর রাতে না ঘুমিয়ে এপাশ ওপাশ করে? মেয়েকে নিজের মতো করে মানিয়ে নিতে দাও, বড় হতে দাও লড়াই করে...

রাত দুটোর সময় বিজির প্লেন ছাড়বে। প্লেন বিজিকে নিয়ে যাবে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট। সেখানে কয়েকঘণ্টার জন্য থামা। তারপর প্লেন বদল। অন্য প্লেনটি যাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে শিকাগো। দিল্লিতে তখন বেশি সন্ধে ঢলে পড়বে গভীর রাতে ও রাত হয়ে ভোরের দিকে।

সকাল থেকেই উত্তেজিত রিমা। কেবলই মেয়েকে, সজলকে বলছে—আচ্ছা টিকিটটা ফেরত দিয়ে পরশুর টিকিট কাটলে হয় না? ওয়েদার রিপোর্ট বলছে পরশু থেকে ঠাণ্ডা কমে মাইনাস চোদ্দ হবে, তুষার ঝড় হবার আশঙ্কাও থাকবে না।

বিজি অদ্ভুত হাসল, হো হো করে! আচ্ছা মা, তোমার কাছে মাইনাস একুশ আর চোদ্দর তফাত কি? তুমি বুঝতে পারবে কোন্‌টা কত?

ওরে আমার জন্য বলছি না—অত ঠাণ্ডায় তুই যাবি—হাত পা জমে যাবে যে! আমার এক বন্ধু মিনেসোটা গিয়েছিল তার চোখের পাতা এঁটে গিয়েছিল বরফে—

তুমি বুঝি সব বন্ধুদের ফোন করছ এখন? কানাডায় গেছিল এমন কাউকে জানো—ওখানে মাইনাস পঁয়ষট্টি হয়ে যায় কয়েকটা জায়গায়—

হৃদয়হীন মেয়ের কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে সজলের দিকেই ছলছল চোখে তাকায় রিমা।

সজল বলে, বেশ তো, দেখ না, যদি টিকিট বদলে পরশুর টিকিট পাওয়া যায়?

দেখ না, মানে দেখতে হবে রিমাকেই। সজল বা মেয়ে কেউই তাকে কোনোভাবে সাহায্য করবে না। বিরাট যন্ত্রণা।

যতটুকু গুগ্‌ল সার্চ সে জানে, তারই জোরে, এক ধাপ এগিয়ে, দু ধাপ এগিয়ে পরশুর টিকিটের জন্য চেষ্টা করতে চাইল রিমা। মাঝে মাঝে ভুল অপশন টেপার জন্য গন্তব্যের দিক হারিয়ে যায়। আজকাল সব টাচ্ স্ক্রিন।

BanglaBook.org

পলকের মধ্যে ভেসে যায় স্ক্রিনের ছবি, ফুটে ওঠে অন্য কিছু—রিমার মতো আনাড়ির কাজ নয় এ।

তবু পেয়ে গেল।

একই বিমান কোম্পানির পরশুদিনের টিকিট। একটিমাত্র সীট এখনো খালি আছে। আজকের টিকিট বাতিলের খরচ ও নতুন টিকিট কাটার খরচ মিলিয়ে পড়বে—হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছে রিমা—তিন লক্ষ টাকা।

সজলের দিকে আবার তাকাতে হয় রিমাকে। সজলই তো যাওয়ার টিকিট কেটেছে, বদলে কাটতে হলে আবার তারই ক্রেডিট কার্ড।

—অত টাকা খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সজল বলে। প্রায় পাঁচগুণ বেশি খরচ টিকিট বদলালে। তাছাড়া কারণটাই বা কি? আবেগের মাথায় ভাবনা না করে বিজিকে গরম জামাটামা কি বেশি করে দেবে, তাই ভাবো তো?

কাজেই ওইভাবেই হাতব্যাগ গোছানো হল মেয়ের। ভিতরে ফার্মাল ওয়্যার, তার উপর টি শার্ট, তারপর ঢোলা শার্ট, প্লেন থেকে শিকাগোয় নেমে তড়িঘড়ি তার উপর ফুলহাতা সোয়েটার, জ্যাকেট আর কোট, মাথায় টুপির উপর মাফলার বেঁধে তার উপর কার-টুপি, পায়ে ফ্রস্টবাইট থেকে বাঁচতে পরতের উপর পরত—যন্ত্রের মতো বিজি গুছিয়ে নিচ্ছে সবকিছু, কোনো কথা বলছে না। তার এখন কিছুই ভালো লাগছে না, ফলে মায়ের সঙ্গে ঠাট্টা, ইয়ার্কি, তর্ক সব বন্ধ, ইচ্ছে করছে বাড়িতেই থেকে যেতে, মা বাবার সঙ্গে লেপের গরমের মধ্যে, অতদূরে, ডিগ্রি পেতে যাওয়ার মোহ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, শীতল আকাশের গভীর নীলে, কুয়াশায়...

শেষে রিমা যখন নিজের একটা নরম উলের স্কার্ফ এনে বলল, আর শোন্, যখন এয়ারপোর্টের বাইরে বাস্-এর জন্য ওয়েট করবি, এইটা জড়িয়ে নিবি নাকেমুখে...

তখন আর থাকতে না পেরে মাকে জড়িয়ে ধরে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে থাকল বিজি—ছোট্টবেলার মতো!

এয়ারপোর্টে মেয়েকে ছেড়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দুটো। প্লেনও এখনি ছেড়ে যাবে, উড়বে জার্মানীর আকাশ পথে। সজলের কষ্ট হচ্ছিল রিমার দিকে তাকাতে। মেয়ে যখন গতবছর প্রথমবার রওনা হয়, তখনো

BanglaBook.org

কেঁদেছিল রিমা। কিন্তু তখন আমেরিকায় শরৎকাল, নরম সুন্দর, পত্রঝরণের রঙে রাঙানো পৃথিবী। এমন আতঙ্ক আর কষ্ট মিশে ছিল না সেই কান্নায়—আজ রিমাকে জড়িয়ে আছে ভয়। উত্তরমেরু-সংলগ্ন পৃথিবীর কঠিন, যুক্তিহীন শীত, তুষারপাত, তুষার ঝড়—আর জাগতিক উষ্ণায়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষের জীবন নিয়ে প্রকৃতির নির্মম খেলা। এ সবই তো ভৌগোলিক কার্যকারণের প্রকাশ, জানে রিমা, সে অবোধ নয়। তার মন কেবল মানতে পারে না যে তাদের ছোট্ট বিজি একা হাতে ভারী সুটকেস দুটো টানতে টানতে ওই প্রতিহিংসার দুর্যোগের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে...

জার্মানি পর্যন্ত ঠাণ্ডা নেই। প্লেনের মধ্যেও আবহাওয়া সহনীয়। কাজেই ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে কেটে যায় রিমার রাত। হাত চলে না, তবু কোনোমতে কেটে যায় দিনও। আতঙ্ক নিয়ে আসে আরো একটা রাত। ঘড়ি দেখে পর পর—আর হিসেব করে, কতক্ষণে মেয়ে পৌঁছবে মাইনাস একুশ ডিগ্রির দেশে? যদি বাস্‌টা ঠিক সময়ে এসে না দাঁড়ায়? যদি এয়ারপোর্টের বাইরে বিজিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কুড়ি মিনিট, আধঘণ্টা? বাসটা গিয়ে থামবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসস্টপে। জায়গাটার ছবি দেখেছে রিমা। বড় একটা গোল লনের ধারে, সুন্দর গাছে সাজানো বাগানটা। তার একদিকে ফুটপাথ। সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় দূরপাল্লার বাস। এখন ওখানে কঠিন তুষার, গাছগুলি বরফে ঢেকে গেছে, রাস্তাও বরফে ঢাকা থাকবে, ওরই মধ্যে যানবাহন চলাচল করে। কখনো অত্যধিক তুষারপাত হলে সে সবও থেমে যায়। রাত নটা নাগাদ ওখানে গিয়ে নামবে মেয়ে। ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছে আগেভাগে। কিন্তু এত ঠাণ্ডায় ট্যাক্সিও দেরি করতে পারে—কতক্ষণ দাঁড়াবে বরফের মধ্যে কে জানে? পারবে তো? ওই স্ট্যান্ড থেকে ওর অ্যাপার্টমেন্ট তিন কিলোমিটার। শরতে, গ্রীষ্মে ওইটুকু পথ হেঁটে যাওয়া যায়—এখন সে প্রশ্নই ওঠে না।

বিজির রওনা হওয়ার দ্বিতীয় রাতে বাগানে বরফ পড়ার স্বপ্নটা এল রিমার ঘুমে। আতঙ্কে উঠে পড়ে তখন প্লেনের যাত্রাপথের ম্যাপ দেখছিল রিমা। সজলের সাধাসাধিতে শুতে অবশ্য গেল লেপের নীচে—কিন্তু ঘুম আর আসে কই! টিকিট বদলাতে তিন লক্ষ টাকা লাগত। সে টাকা কি আর অতই বেশি—রিমার বুকজোড়া উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার কাছে।

BanglaBook.org

রিমা একসময় চাকরি করত। এখন আর করে না। সেই সময়কার জমানো টাকাও বেহিসেবী খরচ করে কবেই শেষ হয়ে গেছে। টাকাটা থাকলে, অথবা নিজে চাকরি করলে রিমা টিকিটটা বদলেই দিত। সজলের মতামতের জন্য বসে থাকত না।

আচ্ছা, সজলও যেন কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। নাকি বাবারা এইরকমই হয়, তাদের লোকদেখানো সাহস, বুকের পাটা থাকতে হয়। বুক ঢিপঢিপ করলেও তারা হো হো করে হাসবে, রিমাকে খ্যাপাবে—সজল কেমন সুন্দর দাড়ি কামাচ্ছে, স্নান সারছে। পরিপাটি হয়ে এল অফিসের পোশাকে। এবার বেরোবে—আর রিমা? সে বসে আছে ঝুপসি হয়ে ডাইনিং টেবিলের পাশের সোফায়, কোলে আইপ্যাড পায়ের নীচে সকালের খবর কাগজ ফরফর করে নড়ছে। চুলে চিরুনি নেই, চোখের কোলে কালি, রাতের পোশাক ছাড়া হয়নি, চা দেখলে গা গুলোচ্ছে...

সকাল আটটা নাগাদ টুং করে শব্দটা হল ফোনে। ভাইবার-এ মেসেজ এলে এমন শব্দ হয়। মেয়ের এতক্ষণ শিকাগোয় ল্যান্ড করার কথা। ভয়ে ফোন করেনি রিমা—হয়তো বাইরে তুষারঝড় হচ্ছে, হয়তো ওর দেওয়া স্কার্ফটা নাকে জড়িয়ে হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে মেয়ে অপেক্ষা করছে, করেই যাচ্ছে, বড় কোচ মানে বাস্‌টা আসছে না, হয়তো চোখের পাতা, নাক ঠোঁট নীল হয়ে যাচ্ছে ওর, ঠাণ্ডার মধ্যে, মাইনাস একুশ ডিগ্রি...

একটা গ্লাস থেকে গলায় জল ঢালতে যাচ্ছিল রিমা। হাত কেঁপে উঠল, গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে—কী? সজলের চোখেও প্রশ্ন। বাথরুম থেকে বেরিয়েছি, ওইটুকু 'টুং' শব্দ সজলেরও কান এড়ায়নি; জেনে ভালো লাগল রিমার। 'বাসে উঠেছি। বাস চলছে। আরো দু ঘণ্টা।'

মেসেজটা কাছে গিয়ে দেখাল সজলকে। এখানে ঝকঝকে দিন, শীতার্ত হলেও। অন্য গোলার্ধে রাত। তুষার কঠিন।

সজল রেডি হল। ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসল। ওর জন্য জামাকাপড় বদলে চুল আঁচড়ে আসতে হল রিমাকেও। কিছু খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হল। দু ঘণ্টা যেন অন্তহীন কাল। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে, সজল এখন যাবে না, বিজি বাড়ি পৌঁছলে তারপর আরম্ভ হবে ওদের স্বাভাবিক জীবন।

দু ঘণ্টা কেটে গেল। মেসেজ এল না।

BanglaBook.org

সজলের হাত চেপে ধরে আছে রিমা, ওকে উঠতে দিচ্ছে না। এর মধ্যে ফোন করে অফিসে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছে সজল। বারোটার সময় একটা ইম্পর্ট্যান্ট মিটিং রেখেছিল, সেটা অন্য কাউকে নিতে বলছে—ওদের দুজনেরই এখন অপেক্ষা।

সাড়ে তিন ঘণ্টার মাথায় মেসেজটা এল—'দীর্ঘতম পথ পার হয়ে বাড়ি ঢুকলাম। ভাবিনি সত্যিই পৌঁছতে পারব। এখন ঘুমোতে যাচ্ছি। ভালোবাসা'।

সজল আর রিমা দুজনে জড়িয়ে ধরেছে দুজনকে। রিমা কাঁদছে। সজলের আঙুল ওর পিঠে, চুলে।

কিছুক্ষণ পর বাড়িটা শান্ত। সজল অফিস চলে গেছে। অল্প দুটি খেয়ে স্নান সেরে ঘুমোচ্ছে রিমা। লেপ টেনে নিয়ে বুক পর্যন্ত। রোদ আসছে জানলার কাচ দিয়ে। কিন্তু রোদের কোনো তাত নেই এখন।

অনেকটা বেলায় ঘুম থেকে উঠে স্কাইপ-এ মাকে ফোন করেছিল বিজি। এখানে রিমাদের তখন সন্ধেরাত। সজল দেরি করে অফিস গেছে, ফিরবেও দেরিতে। রিমা বাড়িতে একা।

স্কাইপের ছবিতে দেখছিল চারদিকের সাদা বরফের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বিজিদের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটা। বরফের উপর দিয়ে গাড়ি চলছে। হয়তো গাড়ির চাকার নীচে কিছুটা তরল হয়েছে পথের বরফ।

বিজি বলছিল, মা, কাল বাস থেকে নেমে দেখি বাসস্ট্যান্ডে আমি একা। ফোনে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের অ্যালার্ট আসছে। ভীষণ হাওয়া। ট্যাক্সিকে ডেকেছি শিকাগোতে ঢুকেই। ট্যাক্সি আসছে না। তখন খুব ভয় করছিল মা, তোমার দেওয়া স্কার্ফটা দিয়ে নাকমুখ ঢেকে ছিলাম, যেন ওটা তোমারই আদর...

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, একটু দূরে একটা আলো। ওটা হচ্ছে গার্ড রুম। মহিলা একজন রক্ষী ওখানে ডিউটি দিচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, এই চেয়ারে বসো, হিটারের কাছে, বাইরে জমে যাবে। তারপর ট্যাক্সিটা এল—আমি তো ভয় পাচ্ছি আমাকে বাসস্ট্যান্ডে না পেয়ে চলে না যায়! ট্যাক্সিটা খুব বকুনি খেল মহিলা গার্ডের কাছে—কেন আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে রাস্তায়, ঠাণ্ডার মধ্যে—

নির্জন বরফমোড়া রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা যাচ্ছে, আর আমি ভাবছি, যদি স্কীড্ করে যায়—যদি না পৌঁছতে পারি—

BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের নীচে আমাকে জিনিসপত্র সুদ্ধু নামিয়ে ট্যাক্সিটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল, যে আমি বলতেই পারলাম না, আমাকে একটু উপরে পৌঁছে দিয়ে যাও—

আবার একা। কাঠের সিঁড়ির উপর জমাট বরফ। ভারী দুটো ব্যাগের একটা নীচে রাখলাম, অন্যটা টেনে পা ব্যালান্স করে উঠতে গিয়ে দেখছি, অসম্ভব! পিছল বরফমোড়া সিঁড়ির ওপর ব্যাগ টেনে তোলা যাচ্ছে না, আমাকে সুদ্ধু টেনে নেমে আসছে নীচে। সামনে লম্বা সিঁড়ি। সব কটা ধাপে বরফ। নীচে নেমে এলাম। মুখ, গ্লাভস্ খোলা হাত জমে যাচ্ছে। হু হু হাওয়া ছুটে আসছে—মনে হচ্ছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবার।

তারপর—

তারপর হঠাৎ নীচের ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে গেল। ওখানে থাকে আমাদের ব্যাচের জিম্—ও মাথা বাড়িয়ে বলল ইউ নীড হেল্প্? এর আগে কতবার ভদ্রতা করে ওকে বলেছি—নো থ্যাংকস্। আজ চেঁচিয়ে উঠে বললাম—ইয়েস্স্!

টপাটপ করে বরফের সিঁড়ি পেরিয়ে জিম একটা করে সুটকেস পৌঁছে দিল ওপরে। আমি পা টিপে টিপে সাবধানে উঠে দরজার চাবি খুললাম—ততক্ষণে নিঃশ্বাস নিতে পারছি ঠিক করে। হীটারটা চালু করে দিয়েছিল লীজিং কম্পানি, নাহলে—যাই হোক মা, তোমাকে নিয়ে আমি, বাবা ঠাট্টা করছিলাম, কিন্তু তোমার ভয়ের একটা কারণ ছিল—ইট্ ওয়াজ রিস্কি—

রিমা মেয়েকে হাসতে হাসতে বলল, তোমার কনভোকেশনে যাব—যখন তুমি ডিগ্রি পাবে, তখন তো সব বরফ গলে গিয়ে গরম এসে গেছে...

আইপ্যাডটা বন্ধ করে চুপ করে সোফায় বসে ভাবছিল রিমা। মেয়ে ফিরে গেছে দিনের কাজে, পড়াশুনোয়—সজল বাড়ি এসেছে। বিকেল রান্নার সুগন্ধ আসছে রান্নাঘর থেকে। রিমা ভাবছিল, ভয়ের সঙ্গে ভালোবাসার লড়াইতে শেষপর্যন্ত ভালোবাসা জিতে গেছে। এখন পৃথিবী সুন্দর। এবার শীত গিয়ে বসন্ত আসবে দুই গোলার্ধে।

BanglaBook.org

# জঙ্গল

প্রচেত গুপ্ত

আলোর মতো অন্ধকারও যে কোনো সময় খুব ভালো লাগে জানতাম না।

অন্ধকার এতটাই ঘন যে মনে হচ্ছে, কেউ শিশি উলটে পুরো কালিটাই দিয়েছে ঢেলে। অমাবস্যা? নাকি অমাবস্যার কাছাকাছি কোনো সময়? আকাশে চাঁদ নেই। মিটিমিটি করে জ্বলা তারাগুলো ঝাপসা। যত রাত বাড়ছে অন্ধকারও বাড়ছে। এইবার বোধহয় হাত বাড়ালে হাতে অন্ধকার লেগে যাবে। কাছের জঙ্গল আর দূরের পাহাড়গুলোও সব একেক রঙের অন্ধকার মেখেছে। কেউ গাঢ়, কেউ ফিকে। আমাদের দারুণ লাগছে। গা ছমছম করছে, বুক ঢিবঢিব করছে। আমরা কলকাতার ছেলে। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। লোডশেডিং-এর বিচ্ছিরি, গা জ্বালানো অন্ধকার দেখেছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর ভালো অন্ধকার আগে দেখিনি। একেই কি আঁধার বলে? বাংলোর বাগানে চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আছি। কনকনে শীত। বাংলোর কেয়ারটেকার-কাম-কুক ভিম এক ঝুড়ি বড়া ভেজে দিয়েছে। ডিমের বড়া। ভিম মনে হয় মন্ত্র জানে। এত শীতেও ডিমের বড়াগুলো কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না। আমরা খাচ্ছি আর নিচু গলায় গল্প করছি। এখানে পৌঁছোনোর পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবাইকে কথা বলতে হবে নিচু গলায়। জঙ্গলের আওয়াজ যেন চাপা না পড়ে। পাখির ডাক, পাতার আওয়াজ, ঝর্নার কলকল, রাতের নিস্তব্ধতার যেন অসুবিধে না হয়। অসুবিধে হচ্ছিলও না। গোলমালটা হল হঠাৎই। আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে কী যেন নড়ে উঠল। অনুপম প্রথম দেখল। ফিসফিস করে উঠল।

'কী ওটা!'

অনুপমের গলায় আতঙ্ক ছিল। আমরা সবাই তাকালাম। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, সত্যি কিছু একটা নড়ছে। কী নড়ছে? ঠিক যেন এক চাপা অন্ধকার নড়ে উঠল!

এত ভয় পেলাম যে মুখ দিয়ে আওয়াজও করতে পারলাম না। মনে হল, কেউ যেন আমাদের কথা বলবার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আমার ঠিক পাশেই বসে ছিল সন্দীপন। আমার হাত খিমচে ধরল। তারপর...।

BanglaBook.org

আচ্ছা, প্রথম থেকে বলি।

সেবার আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম কাঁকড়াঝোড়। পাহাড় আর জঙ্গল। দারুণ সুন্দর একটা জায়গা। পাহাড়ের ওপর আরো দারুণ সুন্দর একটা বনবাংলো। পাহাড় উঁচু কিছু নয়, কিন্তু একটা আদিম ভাব আছে। সর্বক্ষণ শাল, মহুয়ার পাতায় পাতায় আওয়াজ। সর্‌সর...সর্‌সর...। লাল পথ হাঁটলে পায়ের নিচে শুকনো পাতা খচমচ করে ওঠে। বুনো গন্ধে ঝিম্‌ঝিম্‌ ভাব। যে কোনো সময় জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে আসতে পারে। তার জন্য বুকের ভিতর চাপা উত্তেজনা। সব মিলিয়ে এক্সাইটিং।

ঝাড়গ্রাম থেকে ভুলাভেদা হয়ে উঠতে হয় কাঁকড়াঝোড় পাহাড়ে। অনেকেই ট্রেকিং করে। হাতে লাঠি, পিঠে ব্যাগ, গলায় দূরবীন। বেশিক্ষণের পথ নয়। ব্রেকফাস্ট করে রওনা, বনবাংলোয় গিয়ে লাঞ্চ। ঝাড়গ্রাম থেকে টানা জিপে গেলেও ভালো লাগে। মনে হয় পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছি। তারাও আমাদের সঙ্গে ছুটছে।

আমরা জিপ নিয়ে কাঁকড়াঝোড় গিয়েছিলাম। আগেরদিন ট্রেনে করে নামলাম ঝাড়গ্রাম। দুপুরে খেলাম পাইস হোটেলে। পাইস হোটেলে খাওয়ার বেজায় মজা। হিসেব রাখবার জন্য একজন পিছনে হাত রেখে টেবিলের পাশ দিয়ে ঘোরে আর নামতার মতো কী যেন আওড়াতে থাকেন। দুর্বোধ্য ভাষা। তার ওপর এত দ্রুত বলে যে চেষ্টা করলেও কিছুই বোঝা যায় না। পরে জেনেছিলাম, ওটা হল টেবিল ধরে ধরে খাবার হিসেব। কত নম্বর টেবিলে ডাল ভাত মাছ কতটা যাচ্ছে তার ফিরিস্তি। সবটাই কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। সেই কোড সবার বোঝার সাধ্যি নেই। হোটেলের লোকই খালি জানে। তারা দূরে বসে লম্বা পাতায় হিসেব লিখে লিখে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পর বাজার। লম্বা ফর্দ ছিল। বাজার টিমের ক্যাপটেন প্রদীপ। প্রদীপ ছিল দরদামে স্পেশালিস্ট। এমন দর করতে পারে যে ওর সঙ্গে যারা থাকে তারাও লজ্জায় পড়ে যায়। দশটাকার জিনিস দু'টাকা বললে লজ্জা করবে না? যাই হোক, ঝাড়গ্রামে তাকে সাহায্য করলাম শান্তনু, অনুপম আর আমি। চাল, ডাল, ডিম, পাঁউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি, বাদাম, চানাচুর, তেলমশলা। পাঁচটা ব্যাগ বোঝাই হয়ে গেল। দশজন ছেলের তিনদিনের রসদ। জঙ্গলের ভিতর তো কিছুই পাওয়া যাবে না। যদি বা পাওয়া যায়

BanglaBook.org

তাহলে দূরে কোনো আদিবাসী গ্রামে যেতে হবে। গেলেও মনের মতো, প্রয়োজন মতো সব মিলবে না। তার থেকে রসদ নিয়েই ওঠা ভালো। বাংলোর কেয়ারটেকার-কাম-কুককে দিয়ে দিলেই ঝামেলা ঘাড় থেকে নেমে গেল। আমাদের মেনু মতো রান্না করে দেবে। সবাই তাই করে। সবশেষে কিনলাম মুরগি। দরদাম করে পাঁচটা মুরগি নেওয়া হল। শান্তনু বলল, 'পাঁচটায় হবে? আর দুটো নিয়ে নিলে হত না?'

অনুপম বলল, 'দরকার হলে কেয়ারটেকারকে বলব। সে আশপাশের গ্রাম থেকে জোগাড় করে দেবে। আদিবাসী গ্রামে মুরগি পাওয়া যাবে না এমন তো হতে পারে না। এখন থেকে অত মুরগি নিতে গেলে গাড়িতে জায়গা হবে না। তাহলে আমাদের আর যেতে হবে না, কাঁকড়াঝোড়ে শুধু মুরগিরা বেড়াতে যাবে।'

প্রদীপ জিভ বের করে ঠোঁট চেটে বলল, 'জংলী মুরগির টেস্ট ফ্যান্টাস্টিক হবে।'

এরপর জিপ ভাড়া। বাজারের মতো সেখানেও দরদাম হল এক চোট। তার ওপর আবার সব ঢাকাঢুকি জিপ চলবে না। গাড়ি খোলামেলা হওয়া চাই। কাপড়ের হুড যেন খোলা যায়। আমরা কেউ বাইনোকুলার হাতে দাঁড়াব। কেউ ঝুলব। জঙ্গলের মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে না গেলে জিপে চড়বার মজা কোথায়?

রাত কাটালাম ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছে সস্তার হোটেলে। ডর্মেটারিতে কম্বল মুড়ি দিয়ে সারি সারি শুলাম ঠিকই কিন্তু ঘুমোতে পারলাম কই? অনুপম সন্দীপনকে চিমটি কাটতে লাগল। শান্তনু কম্বলের ভিতরই অনির্বানের সঙ্গে ঘুষোঘুষি শুরু করল। অরিদীপের সুটকেশে বাড়ি থেকে খানকতক নলেন গুড়ের কড়াপাক সন্দেশ দিয়েছিল। রাত দুটোয় সেই সন্দেশ চুরি করে খাওয়া হল। ভোর রাতে ঠান্ডা যখন ভয়ঙ্কর, প্রশান্ত সবার মুখে জলের ছিটে দিয়ে বলতে লাগল—

'ওঁ কাকড়াঝোড়ায় নমঃ, ওঁ কাকড়াঝোড়ায় নমঃ, ওঁ কাকড়াঝোড়ায় নমঃ।'

এরপর ঘুমোনো যায়? সত্যি কথা বলতে কী, আমরা ঘুমোতে চাইছিলামও না। ঘুমোলেই তো একরাতের মজা খতম। তারপরেও আলো

BanglaBook.org

ফোটবার পর সকলেরই চোখ গেল লেগে। কখন যে জিপ এসে হর্ন দিল কেউ বুঝতেও পারলাম না। জানতে পারলাম হোটেলের লোকজন টানাটানি করে ঘুম থেকে তুলে দেবার পর।

কাঁকড়াঝোড়ের পথ কেমন সুন্দর আগেই বলেছি। জিপ যত এগোচ্ছে সেই 'সুন্দর' বাড়ছে। জঙ্গল ঘন থেকে আরো ঘন হচ্ছে। পাহাড়ের আলো আর গাছের ছায়া মাখা এক রহস্যময় পথ ধরে আমরা ঘুরে ঘুরে, ওপরে উঠতে লাগলাম। লম্বা লম্বা শাল, মহুয়া পাহাড়টাকে যেন আদর করে ঢেকে রেখেছে। সেই সঙ্গে উড়ছে লাল ধুলো, জঙলি পথের রেণু। জিপ খোলামেলা নেওয়া হয়েছে বলে সেই ধুলোয় ভরে যাচ্ছে আমাদের জামাকাপড়। গায়ে, মুখে, চুলে মাখামাখি কাণ্ড। লাল মাটির ধুলো। আমাদের যে কী ভালো লাগছিল! মনে হচ্ছিল, এমন ভালো আর কখনো বুঝি লাগবে না। বিশ্বনাথ খোলা গলায় গান ধরল।

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়...।'

একমাত্র ধুলো ছাড়া এই গানের সঙ্গে আমাদের জঙ্গল যাত্রার কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বনাথের গলা ভালো, কিন্তু তার এই এক দোষ। কিছুতেই সিচ্যুয়েশন অনুযায়ী গান গাইতে পারে না। বিরাট গাধা। কিন্তু তারপরেও কী কারণে জানি, খানিকক্ষণের মধ্যে দলের বাকিদের গানটা মনে ধরে গেল। সম্ভবত আমরা বিশ্বনাথের থেকেও বড় গাধা। আমরা সবাই সুরে বেসুরে বিশ্বনাথের সঙ্গে গলা মেলালাম।

'দেহমনের সুদুর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে...।'

গাইতে গাইতে এক সময় বুঝতে পারলাম, ঠিক গানই গাইছি। এমন দিনের জন্য এই গানই মানায়। সত্যি তো আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি।

মোড় ঘুরে জিপ এসে থামল বনবাংলোর নিচে। আমরা ঝটাপট নামলাম।

আহা! এই কাঁকড়াঝোড়! আর ওই বনবাংলোয় আমরা থাকব!

তমাল মুগ্ধ গলায় বলল, 'বাড়ির পাশে' এমন জায়গা থাকতে লোকে কেন হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া যায়!'

তখন আমাদের বয়স কম। পৃথিবীর ভালো জায়গা কিছুই দেখিনি। সেই

BanglaBook.org

সময়ে টিভির এরকম রমরমা ছিল না। চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড, জাপানের স্পট দেখব সে উপায় নেই। কম্পিউটার, ইন্টারনেটও ছিল না। তাই অল্পতেই মুগ্ধ হতাম। অল্পেতে মুগ্ধ হওয়া ভালো না মন্দ? মনে হয় মন্দ। এখন অল্পতে খুশি হওয়া একটা লজ্জার ব্যাপার। এখন সব 'বেশি বেশি'। পরীক্ষায় বেশি নম্বর চাই। বেশি ভালো চাকরি চাই। চাকরিতে বেশি মাইনে চাই। আশপাশের যোগ্যদের বেশি করে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাই। বুড়ো বাবা-মাকে বেশি করে অবহেলা করতে চাই। এখন আর অল্পের কোনো ঠাঁই নেই। অল্প হল বোকাদের সাবজেক্ট।

যাই হোক, কাঁকড়াঝোড়ের বনবাংলো দেখে আমরা এত আনন্দ পেলাম যে আনন্দে লাফিয়ে উঠতেও ভুলে গেলাম। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম! এটাই কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা? তাই তো মনে হচ্ছে।

একটা টিলার ওপর কাঠের বাংলো। লাল পথ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে বেশ অনেকটা ওপরে। তারপর সবুজ লন আর রঙিন বাগান। সেখানে চেয়ার নিয়ে বসবার ব্যবস্থা। লন শেষ হলে বাংলোর গোল বারান্দা। কাঠ আর কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে হবে। বাংলোর পিছনে গেলে আরো একটা চমক। আবার একটা ছোটো টিলার মতো। ছোটো টিলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হবে বেশ খানিকটা। ওপরে বসবার জন্য সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চ। ক্যাম্প ফায়ার আর বারবিকিউ-এর ব্যবস্থা। কনকনে শীতে আগুন জ্বেলে হই হই করো আর বারবিকিউতে মুরগির রোস্ট বানিয়ে খাও। গোটা বাংলোটাই উন্মুক্ত ধরনের। বেড়া বা পাঁচিলের বিচ্ছিরি আগল নেই। যেদিকে তাকাও পাহাড় আর জঙ্গল, জঙ্গল আর পাহাড়। সব যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

আমি প্রকৃতি বর্ণনায় অতি কাঁচা। ফলে সেই বর্ণনা পড়ে যারা জায়গাটা সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারলেন না, তাদের বলব পারলে 'চারমূর্তি' সিনেমাটা একবার দেখে নিতে। টেনিদা, কেবলা, হাবুল, পেলারাম নিয়ে তৈরি এই ছবির শুটিং হয়েছিল কাঁকড়াঝোড়ের বাংলোয়। সাদা কালো রঙে যে মারকাটারি আউটডোর দেখান হয়েছিল, তা আজকের তাবড় তাবড় রঙিন সিনেমাকে হার মানাবে।

দিনটা কিভাবে যে কেটে গেল আমরা বুঝতেই পারলাম না। বিশদে না গিয়ে বরং চটপট একটু বলে নিই।

BanglaBook.org

কাঁকড়াঝোড়ের প্রথমদিন। বেগুনি চা। তারপর চারপাশ চক্কর। ছবির থেকেও সুন্দর। জঙ্গল কোথাও পাতলা, কোথাও ঘন। কতরকম যে পাখির ডাক! বেশিটাই চিনি না। সেই কারণে আরো ইন্টারেস্টিং। অবিরত শুকনো পাতার ফিসফিসানি। গাছের ভিতর চুপ করে দাঁড়ালে মনে হয় কারা যেন কথা বলছে। এদিক ওদিক পায়ে চলা পথ চলে গেছে পাহাড়ের ভিতর। আদিবাসী গ্রামে। সন্দীপন বলল, সে নাকি বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। কাঁকড়াঝোড়ে বাঘ! সবাই চাঁদা করে চাটি মারল সন্দীপনকে। বাংলোয় ফিরে ঠান্ডা জলে স্নান। ভিমের হাতের মুরগির ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেতেই চোখ জড়িয়ে গেল। আগের রাতে তো ঘুমই হয়নি। ঘুম ভাঙল বেলা গড়িয়ে যাবার পর। জঙ্গলের বিকেলবেলার আলো কেমন যেন মন কেমন করা। ভিম ঘরে ঘরে গরম চা আর হ্যারিকেন সাপ্লাই করল। আর সাবধান করল।

'বাংলো থেকে কিন্তু একা বেরোনো চলবিনি। যেখানে যাবে দল বেঁধে যাবে। বেশিদূরও যাবে না মোটে এই বলে রাখলুম। পরে কিছু হলে বলতে পারবে না।'

আমরা বললাম, 'কেন? কেন?'

ভিম বলল, 'কেন আবার কী? হাতির সঙ্গে মোলাকাত হলে সর্বনাশ বটেক। ভল্লুক আছে, বন বিড়াল, শিয়াল আছে। সুতরাং কাছাকাছি চক্কর দিয়ে বাংলোর মধ্যে থাকাটাই মঙ্গল বটেক। ভল্লুক মহুয়া খেতে আসে।'

আমরা বললাম, 'পিছনের টিলাতে?'

ভিম বলল, 'ওখানে যাওয়া যাবে বটেক। তবে আগুন জ্বলাতে হবে।'

ভিমের কথায় ভয় ছিল, আবার মজাও ছিল। চা খেয়ে আমরা সিঁড়ি বেয়ে বাংলো থেকে নেমে এলাম। যে পথে সকালে গাড়িতে উঠেছি, হাঁটতে লাগলাম। বেশিক্ষণ নয় মিনিট কুড়ি। তার মধ্যেই ঝুপ করে অন্ধকার নামল। সে যে কী প্রবল অন্ধকার! মনে হল, সামনে একটা অন্ধকারের পাঁচিল। সেই পাঁচিল টপকানো যাবে না। আমরা দলে বড়। গোবিন্দ আর অনি ছাড়া সবাই এসেছি। তারপরেও আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ঠান্ডার মধ্যে আরো শীত করতে লাগল। যদি বাংলোয় ফিরতে না পারি? অন্ধকারে পথ হারাই যদি? যদি হাতি বেরিয়ে আসে? ভল্লুক এসে দাঁড়ায় পথ আটকে।

আমি কাঁপা গলায় বললাম, 'চল ফিরে যাই।'

BanglaBook.org

বনবাংলোর বাগানে এসে জমিয়ে বসলাম। ভিম ডিমের বড়া ভেজে, বাংলোর পিছনে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। রাতের রান্না হচ্ছে। এখান থেকে রান্নাঘরটা অনেকটা দূরে। আমরা গল্প করছি। বিশু গুনগুন করে গান ধরেছে। দূরের কুয়াশা মাখা পাহাড়ে একটু একটু আলো। ওখানে গ্রাম আছে। আমরা চার-পাঁচজন পরের দিনের ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরি করছিলাম। কাল ভোরবেলা জঙ্গলের ভিতর ঢোকা হবে। দেখতে হবে সত্যি পথ হারিয়ে ফেলি কিনা। ফেললে একটা দারুণ ব্যাপার হবে। প্রদীপ বলল, 'গাছের গায়ে দাগ দিয়ে দিয়ে এগোব।'

অনুপম বলল, 'ওসব সিনেমায় হয়। তুই এমন পথে ঘুরপাক খাবি যে দাগ দেওয়া গাছের কাছে আর আসতেই পারবি না।'

ঠিক এরকম একটা সময় ঘটনাটা ঘটল।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে খানিকটা অন্ধকার নড়ে উঠল। অনুপম ফিসফিস করে উঠল।

'কী ওটা!'

আমরা সবাই মুখ ঘোরালাম। সেই চাপ অন্ধকার আরো কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এসেছে। সন্দীপন আমার হাত খিমচে ধরল। আমাদের মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ভিমকে যে চিৎকার করে ডাকব, শক্তি নেই। একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ হচ্ছে না? হচ্ছে তো। অন্ধকারে পায়ের আওয়াজ? হৃদপিণ্ড এতটাই ধুকপুক করছে যে মনে হচ্ছে, বুকের ভিতর জিপগাড়ি ছুটছে। হাড় হিম করা ভয় কি একেই বলে? নাকি আরো কিছু আছে? থাকলেও দেখতে চাই না।

কয়েক মুহূর্ত। অন্ধকারে দল এবার সিঁড়ি শেষ করে বাগানে এসে দাঁড়াল। এবার বুঝতে পারলাম, একটা অবয়ব। শরীর একটা। শান্তনু কাঁপা গলায় বলল, 'পালা।'

অন্ধকার আরো কয়েক পা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। ততক্ষণে প্রদীপ চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে। এবার ছুটে পালাবে। আমিও উঠে দাঁড়াতে গেলাম। পারলাম না। মনে হল, হাত পা চেয়ারের সঙ্গে কঠিন ভাবে কেউ বেঁধে দিয়েছে। আতঙ্ক মন থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি কি ঘামছি? হ্যাঁ, ঘামছি। এত শীতেও কপাল ঘামছে।

BanglaBook.org

অন্ধকার আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'দাদাবাবুরা, আমি ছেদি।'

সন্দীপন এতক্ষণ যে কাজটা করতে সাহস পায়নি এবার করল। টর্চ জ্বালাল। রোগা প্যাংলা একটা মানুষ। গায়ে কম্বলের মতো চাদর। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। প্যান্টটাও কালো। গায়ের রঙ বেশি কালো। সব মিলিয়ে খানিকটা অন্ধকার। আমাদের ধড়ে প্রাণ এল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

ছেদি মাইল খানেক দূরে গ্রামে থাকে। বনবাংলোয় কেউ বেড়াতে এলে একবার দেখা করে যায়। দিনেরবেলাতেই আসত। আজ ঝাড়গ্রামে গিয়ে আটকে পড়েছিল। জঙ্গলে বেড়ানোর সময় তাকে গাইড হিসেবে নেওয়া হবে কিনা জানতে এসেছে। নিলে ভালো। দূরের ঝরনা, ছোট নদী, পাহাড়, জংলা ফুলের বাগান, হাতির পায়ের ছাপ, আদিবাসী গ্রাস সব দেখিয়ে আনবে। খরচ বেশি নয়। ঘণ্টা প্রতি দশ টাকা দিলেই চলবে। আর একবেলা পেট পুরে খাওয়া চাই।

আমি বললাম, 'তুমি জঙ্গল চেনো?'

ছেদি খুকখুক আওয়াজ করে হেসে বলল, 'আমার জঙ্গলেই জন্ম, জঙ্গলেই মরব দাদাবাবু। আমি জঙ্গল চিনি, জঙ্গলও আমায় চেনে। ভয় নাই।'

এ তো দারুণ! এই সুযোগ কে ছাড়বে? আমরা রাজি হয়ে গেলাম। কাল সকাল ছ'টায় বনবাংলোর সামনে আসতে হবে। চা কেক খেয়ে রওনা। ছেদি জানাল, সে আগেই চলে আসবে। তবে আজ কিছু টাকা দিলে খুশি হবে। বাড়িতে তিনটে মেয়ে। না খেয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করচে। সন্দীপন কথা না বাড়িয়ে কুড়িটা টাকা দিল।

টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে ছেদি বলল, 'ভিমকে কিছু বলবেন না দাদাবাবুরা। রাগারাগি করবে। আমাকে মোটে পছন্দ করে না। আমার দু'টা পয়সা রোজগার হোক চায় না। আমি কাল অন্ধকার কাটতে না কাটতেই আসব দাদাবাবুরা। জঙ্গলে সকাল হতে দেখা ভারি সোন্দর।'

আমরা হেসে ফেললাম। ছেদি ফের অন্ধকার হয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে মিলিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'সন্দীপন টাকা তো দিলি, কাল যদি না আসে?'

সন্দীপন বলল, 'না এলে না আসবে। আমি কি টাকা ওর গাইড হবার

BanglaBook.org

জন্য দিয়েছি? মোটেই নয়। বেটা যে ভূত নয়, মানুষ, সেই আনন্দে দিয়েছি।'

শান্তনু বলল, 'মানুষটা সহজ সরল। দেখবি ঠিক আসবে।'

প্রদীপ বলল, 'তাছাড়া এতটা পথ অন্ধকারে এসেছে তার একটা পারিশ্রমিক নেই? গরিব মানুষ। বাড়িতে তিন মেয়ে না খেয়ে আছে।'

অনি বলল, 'ভিমকে একবার জিগ্যেস করলে ভালো হত না?'

শান্তনু বলল, 'দরকার কী? ভিম হয়তো রাগারাগি করবে। ওর নিশ্চয় জঙ্গল দেখানোর আলাদা গাইড আছে। কমিশন নেয়। চেপে যাওয়াই ভালো। কাল বলা যাবে।'

আমরা আবার আড্ডা শুরু করলাম। ছেদিকে অন্ধকারের ভয় পাওয়া নিয়ে হাসাহাসি হল একচোট। ঘণ্টাখানেক পরে ভিম খাবার গুছিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার আমি বাড়ি চললাম বটেক।'

আমরা বললাম, 'নিশ্চিন্তে যাও।'

ভিম বলল, 'কাল সকালে টেইম মতো চলে আসব।'

সন্দীপন বেড়াতে যাবার কথা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। ভিম বাগান পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে হেঁটে গেল। খানিকটা গিয়ে থমকে ফিরে এল। গলা নামিয়ে বলল, 'আর বাইরে বসা নয় বটেক। ঘরে ঢুকে যান।'

আমি বললাম, 'কেন?'

ভিম বলল, 'ঠান্ডা বাড়ছে।'

অনুপম বলল, 'ভয়ের কিছু আছে? হাতি, ভল্লুক তো আর তোমার গেট খুলে সিঁড়ি বেয়ে আসতে পারবে না। চোর ডাকাত আসবে।'

ভিম বলল, 'নাহ্ সে সব চিন্তা নেই দাদাবাবু। শুধু...।'

শান্তনু বলল, 'শুধু কী?'

ভিম একটু চুপ করে রইল। তারপর কী যেন ভাবল। মাথা নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'শুনেছি মাঝে মাঝে ছেদি এসে ট্যুরিস্ট পার্টিকে বিরক্ত করে বটেক। বেটা আমি সামনে থাকলে আসে না...।'

আমি হাসি চেপে কায়দা করে বললাম, 'কে ছেদি?'

ভিম মুখ তুলে বলল, 'কেউ না। জঙ্গলের লোক ছিল বটেক। পাগলাটে, গরিব গুব্বো মানুষ। জঙ্গলে দিনরাত ঘুরে বেড়াত। তিন বছর আগে হাতির

BanglaBook.org

হায়ের তলায় মল.. লাশ চেনা যাচ্ছিল না... শুনি তারপর থেকে নাকি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়... এখানেও নাকি আসে... হারামজাদাকে যদি দেখতে পাই বটেক...।'

ভিম চলে যাবার পর ঘরে ঢুকে জবুথবু হয়ে আমরা বসে রইলাম অনেকক্ষণ। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। কীভাবে যে খেলাম, শুতে গেলাম জানি না। কে মিথ্যে বলল? ভিম না ছেদি?

পরদিন ভোর রাতে বাংলোর কাচের দরজায় টোকা পড়ল। আমরা ক'জন পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দেখলাম, কাচের বাইরে খানিকটা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। জঙ্গলের অন্ধকার।

বাকি দিনগুলো কাঁকড়াঝোরে খুব আতঙ্কে কাটিয়েছি। এই বুঝি অন্ধকার মুড়ি দিয়ে মৃত ছেদি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে। দাঁড়াবে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বলবে, 'কটা টাকা দেন, বাড়িতে মেয়েগুলো না খেয়ে আছে।' তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, কলকাতায় ফিরে আসবার পর ছেদির জন্য আমাদের মন কেমন করত। একটা অচেনা, গরিব, মরা মানুষের জন্য আতঙ্ক হতে পারে, মন কেমন কেন করবে?

জানি না।

BanglaBook.org

# আর মাত্র আধ ইঞ্চি ফাঁক

নলিনী বেরা

## প্রথম পরিচ্ছদ

### এক

দীর্ঘ পূজার ছুটির মধ্যেই একদিন আমাদের উঠোনের পূর্বদিকে অবস্থিত অঝোরঝর্ নিমগাছটার ডালে বসে একটা অলম্ভুস দাঁড়কাক তার হেঁড়ে গলায় ডাক দিয়ে গেল বারকতক। সাদামাটা পাতিকাকের তুলনায় ঈষৎ ভারী দাঁড়কাকটার শরীরের ভারে কতক বুড়ো নিমপাতা ঝরেও পড়ল ঝুর্ ঝুর্। আর অমনি আমাদের মা-কাকিমাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হল—না জানি কী খারাপ খবর আসছে! আর সত্যি সত্যিই আমাদের গ্রামের না-নারী না-পুরুষ আনন্দী, যে কী না হপ্তায় হপ্তায় 'বাঁহুকে' করে ডালায় ভরে হাঁস-মুরগী চালান দেয় খড়্গপুরের গোলবাজারে, সে-ই এসে সাতকাহন করে বলল, আমাদের ছোট পিসিমা নাকি খড়্গপুর রেল ইস্টিশানের কাছে রেলের এক বাতিল কামরার ভিতর ঢুকে দুহাত তুলে নির্ধুমসে নাচছেন! সে স্পষ্ট দেখে এসেছে। শুধু কী দেখা, হাতে ধরে টেনেওছে, কিন্তু ওই যে পাগলের খেয়াল—নাচ আর গান—ঘরের দিশা কী আর তাঁর আছে! হাজার টানাটানিতেও রেলের ভাঙা কামরা ছেড়ে বাইরে বেরুলেন না। আমাম ও ছোটকাকার উপর দায়িত্ব পড়ল যে করেই হোক আমাদের ছোটপিসিমাকে খড়্গপুর রেল ইস্টিশানের পরিত্যক্ত রেল-কামরা থেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনার।

### দুই

বাতিল কামরার হদিস যা হোক পাওয়া গেল। বোগদার উত্তর-পূর্ব কোণে বিস্তৃত রেললাইনের উপান্তে ঈষৎ টাল-খাওয়া একটা রেলগাড়ির দশ-বারোটা বগি কে জানে কতকাল রোদে-বৃষ্টিতে পড়ে আছে! চাকায়-গায়ে জঙ্ ধরে একশা। বগির মাথায় কয়েকটা কাক মজলিশ বসিয়ে দেদার ডেকে যাচ্ছে! সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। বাতিল কামরাগুলোর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলাম, ছোটকাকাই খপ্ করে হাত ধরে বললেন, "দাঁড়া! ওখানে যেতে গেলেও টিকিট লাগবে!"

BanglaBook.org

"টিকিট?" ছুটোছুটি করে আমরা অল্পদামের দু-খানা 'প্ল্যাটফর্ম টিকিট' কাটলাম। এই টিকিটেই নাকি এখানে যতক্ষণ খুশি থাকা যায়, এমনকী রাতটুকুও কাটানো যায়।

এতক্ষণে আমাদের ছোটকাকার মুখে হাসি ফুটল। গুন গুন করে গানও এসে গেল—'জীবনটা ভাই রেলের গাড়ি আমরা সবাই যাত্রী...'। অদূরে ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে সত্যিকারের ট্রেনযাত্রীরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, কেউ বা গাঁটরি-গুঁটরি নিয়ে বসে আছে সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চিতে। ট্রেন আসছে হুইসল বাজিয়ে, ট্রেন যাচ্ছেও একটানা হর্ন বাজাতে বাজাতে। আর কতরকম ট্রেন গাড়িই তো দেখলাম! বাষ্পচালিত বিদ্যুৎচালিত ডিজেলচালিত। কিন্তু কোন্ গাড়ি কীসে চলছে তা আলাদা করে চিনিয়ে দেওয়ার লোক ছিল না, সঙ্গের নাইন-পাস কেবলমাত্র আমাদের ছোটকাকা একসময় আঙুল উঁচিয়ে একটা ট্রেন দেখিয়ে আমাকে বললেন, ঐরকম একটা ট্রেনে চড়েই আমি পাঁশকুড়া যাই একশ আটটা পদ্ম আনতে। ট্রেনটা 'কারেন্টে' চলে। তখন একটা অন্ধ ভিখারীকে এই গানটা গাইতে শুনেছিলাম—'পথের ক্লান্তি ভুলে...বলো মা কবে শীতল হব—কতদূর আর কতদূর! আঁধারের ভ্রূকুটিতে ভয় নাই, তোমার চরণে মাগো পাবো ঠাঁই'।" গান থামিয়ে খানিক নিস্তব্ধ ও উৎকর্ণ হয়ে থাকলেন ছোটকাকা, তারপর একসময় উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, "ঐ শোন্...ক-ত দূ-র আর ক-ত-দূর! প-থে-র ক্লা-ন্তি ভু-লে...ঐ দ্যাক্ সেই লোকটাই গাইছে...।"

ছোটকাকার আঙুল বরাবর চোখ রেখে দেখলাম—একটা উলুরি-ঝুলুরি চুলের ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে কাঁধে ঝুলি পরনে ডোরা-কাটা লুঙ্গি-পরা একটা লোক, লোকটা বোধহয় অন্ধ, প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন ট্রেনের দিকে, পশ্চিমের অস্তগামী রৌদ্র তাদের উপর প্রতিফলিত হয়ে পূর্বদিকে লম্বা ছায়া ফেলেছে, সে-ছায়া বোধকরি আমাদের গায়ের উপরও এসে পড়েছে। পথের ক্লান্তি ভুলে কে জানে তারা কত দূরে চলেছে!

## তিন

আমরা বাতিল ও পরিত্যক্ত কামরাগুলোর কাছাকাছি উপস্থিত হলাম। ছোটকাকার মনে হয়তো তখনও—'পথের ক্লান্তি ভুলে বলো মা কবে শীতল

BanglaBook.org

হব'—কিন্তু আমি কান খাড়া করে আছি কখন শুনব, 'বারিপাদা শহরে গাড়ি চলে রগড়ে—দাদা গো দিদি গো—চল যাব টাটানগরে'! আমাদের ছোটপিসিমা এই গানটাই সচরাচর বেশি বেশি করে গেয়ে থাকেন কি না। হয়তো তাঁর মনে রগড়ের মোটরগাড়ি চাপতে টাটানগরে যাবার অবদমিত ইচ্ছা সতত ক্রিয়াশীল। টাটানগরে না গিয়ে তিনি বেভুলে এসে পড়েছেন খড়্গপুরে। রগড়ের মোটরগাড়ি ভেবে চড়ে বসেছেন বাতিল রেলগাড়িতে। আমরা বাতিল রেল-কামরার ভিতর থেকে গান না হোক, লোকজনের নড়াচড়া বা কথাবার্তার চাপা আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

কামরাগুলোর সামনে হাজির হয়ে অভ্যন্তরে উঁকি মারবার আগেই কোত্থেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে একটা কুকুর লাফ দিয়ে একটা কামরায় উঠে পরমুহূর্তেই নিরাপদে উল্টোদিকের দরজায় নেমে হ্যাল হ্যাল করতে করতে অদৃশ্যও হয়ে গেল, কেউ লগুড়-হাতে তার পশ্চাদ্ধাবন করল না বা যাত্রাকালে পৃষ্ঠদেশে 'ক্যাঁক্' করে লাথিও কষাল না। আমরা যারপরনাই আশাহত হলাম—তবে কী কামরার ভিতর একটা জনপ্রাণীও নেই? খড়্গপুরের গোলবাজার ফেরত না-নারী না-পুরুষ আনন্দী আমাদের মেজকাকাকে বাড়ি বয়ে এসে ভুল খবর দিয়ে এল? নাকি খবর দিয়েছে সেই কবে! এতদিনে অস্থিরমতি আমাদের ছোটপিসি কী আর খড়্গপুরে আছে! টাটানগর যাবার উদ্দেশ্যে কে জানে কোন্ ট্রেনে উঠে বসেছে!

না, বাতিল কামরাগুলোর প্রথমটায় উঁকি মেরে দেখা গেল লোকজন আছে, তবে কেউ বোধকরি জেগে নেই, দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পরে আরামসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই চতুষ্পদ কুকুরটি অবলীলায় ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘুমন্ত জীবগুলোকে সন্তর্পণে ডিঙিয়ে নিরাপদে নেমে গেল। ঘুমন্ত জীবগুলোর মধ্যে কী আর আমাদের ছোটপিসিমা আছেন? যদিও বাতিল কামরার ঝুলন্ত আঙটা থেকে বাদ্য বাজনার অনুষঙ্গ স্বরূপ একটা মৃদঙ্গ ঝুলছে। নিশ্চয় মৃদঙ্গ দেখে আমাদের ছোটকাকার হাত নিস্‌পিস্ করছে? কেননা গ্রামে খোল বাজাতে তাঁর তো জুড়ি নেই! খোলের 'ডাইনা' 'বাঁয়া' চাঁটিতে তাঁর হাত যেমন বাজতে থাকে, তেমন বোল ফুটতে থাকে, মুখেও—"তেরে কেটে ঝা ঝা—দাঘিনা ঘিনা দাঘিনা ঘিনা—"

আমরা অতি দ্রুততার সঙ্গে স্থানান্তরে গমন করে দ্বিতীয় বগিতে উঁকি

BanglaBook.org

মেরে দেখলাম—কামরাটিতে কিছু পোঁটলা-পুঁটলি স্তূপাকারে রাখা। তার খাঁজে-ভাঁজে প্রথম কামরার অনুরূপ কিছু লোক, কেউ বা পা ছড়িয়ে কেউ বা পা-মাথা প্রায় এক করে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে। কেবলমাত্র একজনই যে কি না কামরার পূর্ব-পার্শ্বস্থ দরজায় পা ঝুলিয়ে বসে দরজার মধ্যস্থিত দণ্ডায়মান হাতলে হাত রেখে দোদুল্যমান একটানা গেয়ে চলেছে। গেয়ে চলেছে, গেয়ে চলেছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ সে আমাদের দিকে পিঠ রেখে বসে। তার মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, অবিকল আমাদের ছোটপিসিমার গায়ের রঙ! আমি আর ছোটকাকা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে গান শুনছি—এই বুঝি শুনব, 'বারিপাদা শহরে গাড়ি চলে রগড়ে—।' না, অন্য কী যেন দুর্বোধ্য শুনছি—পুরপরদি পইরত্ গাড়ৎ পাণি নিবার ল্যাই—।' যারপরনাই বিরক্ত হয়ে ছোটকাকা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "য-ত্ত সব জার্মান পার্টি!" রাশিয়া-আমেরিকা-জার্মানী-গ্রেট ব্রিটেন—সে তো অনেকদূরের ব্যাপার, আর তাদের অধিবাসীদের গায়ের রংও সাদা, ধবধবে ফর্সা। এই সমস্ত কালো-কুলো ময়লা কাপড় পরিহিত মানুষজন 'জার্মান পার্টি', হল কী করে! ছোটকাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছোটকা, 'জার্মান পার্টি' কেন বলছেন, ওঁরা কী খোদ জার্মানী থেকে এসেছেন?"

"ধুর্ বোকা! জার্মানী কেন হবে, ওরা এসেছে ইস্ট পাকিস্তান থেকে, ঐ যেখানে এখন তুমুল যুদ্ধ-টুদ্ধ চলছে, ওরা সব রিফিউজি'। কথা শুনে বুঝতে পারছিস না—কী র'ম 'ফইরত্ গাড়ৎ-মাড়ৎ করছে?"

আমাদের চাপা স্বরে ফিসফিসানি কথা শুনে মেয়েটা ঘুরে তাকাল, তাকানো মাত্রই মনে হল অবিকল আমাদের ছোটপিসিমার মুখ! তবে ঠিক এখনকার নয়, যেন তাঁর যৌবনবেলার। 'পাঁড়রা' চুল, ফর্সা মুখাবয়ব, দন্তভাগ সামান্য উঁচু। আমাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকল। ইত্যবসরে জনৈকা বৃদ্ধা, মাথা ন্যাড়া, নাকে-কপালে রসকলি আঁকা, কাপড়ের পুঁটলির গাদা থেকে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হিবা কন?"

মেয়েটিই উত্তর দিল,—"আঁই বুঝিত নো পারির।" বলেই পুনরায় সে তার গানেই মন দিল—"পুবপরদি ফইরৎ গাড়ৎ পাণি নিবার ল্যাই...।"

গানের কী মানে কী সুর আমরাই কি বুঝতে পারছি? আচমকা কামরার ভিতরে ঘুমন্ত পুরুষগুলো ঝুপ্ ঝুপ্ করে উঠে পড়ল, যেন ঘরে ডাকাত

BanglaBook.org

পড়েছে এমনিভাবে আমাদের ঘিরে ধরল! তারা তাদের ভাষায় কথা বলছে, আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলছি, কথা বলাবলিতে ভাষার বেশ একটা জগা-খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে। 'তোঁয়ার ল্যাই' 'কিঅল্যাই' 'নাউট্যা পোয়া' 'মাইয়াপোয়া' 'বাচুইদ্দর পোয়া' 'আঁরার' 'হিতারার' ইত্যাদি শব্দগুলো পরস্পর ঠোকাঠুকি করছে। আমাদের প্রায় অনেকটা সময়ই লাগল তাদের বোঝাতে যে আমরা চোর-ডাকাত নই, আমরা এসেছি পরিত্যক্ত রেলগাড়ির বাতিল কামরায় নৃত্যরতা এক পাগলীর অনুসন্ধানে।

শোনামাত্রই তারা 'মারেম্মা' বলে হা-হুতোশ করল, একজন প্রৌঢ়া তো আমার থুত্‌নি নেড়ে দিয়ে বললেন, "অ বা আঁরা বেয়াগ্‌গুনে পাগল অই যারগই, আরারের পসন্দ নো অই?"

## চার

সন্ধ্যা আসন্ন। আশপাশের রেল ইয়ার্ডের ধূলিধূসরিত ঝোপঝাড়েও পাখ-পাখালির কল-কাকলি ক্রমবর্ধমান। তার সঙ্গে মাঝেমাঝেই রেলগাড়ির উচ্চকিত হর্ন কেমন বেসুরো ঠেকছে। তদুপরি ইঞ্জিন সান্টিংয়ের একটানা ঘ্যাঁ-এ-স্ ঘ্যাঁ-এ-স্ ঝক্ ঝক্ ধক্ ধক্ আওয়াজ। তারমধ্যেই শাঁখে ফুঁ পড়ল—একবার নয় তিনবার। বাতিল কামরার টবের তুলসীতলায় কেউ একজন বধূ খুঁটে চাবির গোছা বাঁধা শাড়ির আঁচলা গলায় জড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। এমন সময়ই ছেলেটা এল, এক বগ্গা, ঘাড় উঁচিয়ে আস্ফালন করছে, "আঁই আর টিশনত্ (ইস্টিশানে) মুট বহনের কাম নো গইজ্যম। আজিয়া এক হালায় টিয়া পইসা নো দি আঁরে খুব অপমান গইজ্যে।"

নাকে-কপালে রসকলি-আঁকা সেই বৃদ্ধা তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "হিবা কন অলইক্ষার পুত, বাআজী?'

ফুঁসতে ফুঁসতে ছেলেটি বলল, "আঁই নো চিন্নি। লেয়াপড়া জানা ও দেশিয়া এক্কান লাটের বাট অইব। আঁয়ারে কানমুল্লা দি বিয়াগ্নিনে অপমান গইজ্যে। হিতারার হাত আঁই ছেঁচি দিয়্যম!"

ছেলেটির রাগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে বৃদ্ধা তাকে আমাদের প্রসঙ্গে কিছু বললেন, বিশেষত আমাকে দেখিয়েই। কেননা ততক্ষণে আমাদের ছোটকাকা আর কোথায়! তিনি তো মেতে আছেন সেই তাদের সঙ্গে, কীর্তনে!

BanglaBook.org

বৃদ্ধা বললেন, "অ বা ইয়ানর এক্‌খান বেবস্থা গরি দওন পড়িবো।"

"হিবা কন?" এদেশের লোকেদের উপর ছেলেটির রাগ, তাই বৃদ্ধা পুলটিশ মেরে বললেন, "মনত গর আঁরার বাড়ির পোয়া, ইয়ানর পিসিমা পাগল অই গেইয়ে গই। এহন বাড়িত্তোন নিরুদ্দেশ অই গরি বেদিশা কডে ঘুরের। হিবার হদিস নো মিলে। তুঁই নো কামর লাই চব্বিশঘণ্টা টিশনত্ ঘুরর, হিতার এক্‌খান খোঁজ লওন পড়িবো, হুঁইনচ্চনি অ পুত?"

ছেলেটি একটি কথাও বলে না, উদাস দৃষ্টিতে খানিক হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর যেমনভাবে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে ইস্টিশান-প্ল্যাটফর্ম থেকে এসেছিল তেমনি এক বগ্গা ঘাড় উঁচিয়ে ইস্টিশানের দিকেই যেতে থাকল। যেতে যেতে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "খবর আঁত্তোন আছে। হিতারারে তিন নম্বর পেলাটফরমর পছিমত যাওন পড়িবো। হেহানে দুউগা চাউরগা রেলর এইরইম্যা দেভাঙা বগি আছিল। তার ভিতরত্ বউত মাথা-খারাপ মাইয়াপোয়া হেই হেদিনও নৃত্য-গীত গরের, আঁই নিজের কানে হুন্নি।" বলেই ছেলেটি দৌড়ুল, দৌড়ুল ইস্টিশানের দিকেই।

BanglaBook.org

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### এক

প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হাঁটছি, কত দীর্ঘ একেকটা প্ল্যাটফর্ম। হাঁটছি তো হাঁটছি! নাকে এসে লাগছে কাঁচা লঙ্কার ঝাঁজ। চেয়ে দেখি পায়ের কাছে বস্তা বস্তা কাঁচা লঙ্কার স্তূপ, বোধ হয় মালগাড়ি করে 'চালান' হওয়ার অপেক্ষায় পড়ে আছে। ব্যস্তসমস্ত ট্রেনযাত্রীরা অতিব্যস্ততায় লঙ্কার বস্তার উপরই পা দিয়ে ট্রেনে উঠছে আর কাঁচালঙ্কা ভেঙে চলেছে পুটুস পাটাস! তারই ঝাঁজে তারই গন্ধে প্ল্যাটফর্ম চত্বর ম ম করছে। কেউ হাঁচছে, কেউ-বা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটছে। তার মধ্যেই ফুটন্ত ডালডার কড়াইয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে ছ্যাঁক্-ছোঁক করে। প্ল্যাটফর্মের উপর পাতা রয়েছে সিমেন্টের বেঞ্চি, লোহার বেঞ্চি। যার যেমন ইচ্ছা বসে পড়ছে, যার যেমন ইচ্ছা উঠে যাচ্ছে। একটা ট্রেন অদূরে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ন যযৌ ন তস্থৌ। আসছেও না,

যাচ্ছেও না। গায়ে ঈষৎ খয়েরি ও হরিদ্রা রঙে আধাআধি রঞ্জিত। চারধারে আলোর ফুল সন্ধ্যারাতের তারাদের মতো জ্বলজ্বল করছে। এখানে রাতও যেন দিনের মতো।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমের দিকে যাওয়া তো দূর অস্ত, তার আগে এই প্ল্যাটফর্ম চত্বরেই কত যে পাগলের দেখা মিলল! কেউ বিড় বিড় করে কী সব বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মের এ-মাথা সে-মাথা পায়চারি করছে, কেউ-বা ছেঁড়া কাঁথায় পা-মাথা মুড়ি দিয়ে টান টান শুয়ে আছে! দেখে বুঝবার উপায় নেই মরে গেছে কী বেঁচে আছে! আমাদের ছোটকাকার এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি এতক্ষণে আবিষ্কার করে ফেলেছেন কাঁধে ঝুলি পরনে ডোরা-কাটা লুঙ্গি সেই অন্ধ ভিখারীটাকে, যিনি উলুরি-ঝুলুরি চুলের ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে, উঁ-হু, হাত নয় হাত নয় একটা লাঠির দু-প্রান্ত দুজনে ধরে হেঁটে চলেছেন। হেঁটে চলেছেন, হেঁটে চলেছেন। গাইতে গাইতে। এখন গাইছেন সেই গানটা, সেই যে "চাই না মা গো রাজা হতে। রাজা হওয়ার সাধ নাই মা পাই যেন দু বেলা খেতে॥" আমাদের ছোটকাকাও গলা মিলিয়েছেন, ধীরে ধীরে তাঁর গলা চড়ছে, এই বুঝি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠবেন! আশপাশের লোকজন তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, আমি তাঁর হাত টেনে ধরে বললাম, "ছোট্‌কা...!" এমনি সময়ে এক পাগল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত পাতল, "গিভ মী ওন্‌লি ওয়ান রূপী নোট!" হাত পেতে একদণ্ডও দাঁড়াল না, যেমনি এসেছিল তেমনি চলেও গেল হন্ হন্ করে।

## দুই

প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম ছেঁড়া-ফাটা পা-জামা পরিহিত এক পাগল প্ল্যাটফর্মের একধারে গলি-ঘুঁজিতে নোংরা কাপড় মুড়ি দিয়ে রাঙতার মতো একটুকরো কাগজে, বোধহয় সিগারেট প্যাকেটের অভ্যন্তরস্থ চিক্‌চিকি কাগজই হবে, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে প্রায় ফুটো করে পরক্ষণেই গাঁজা টানার মতো সিগারেট টানছে। শুধুই কী সিগারেটের ধোঁয়া? না মনে হয়, সিগারেটের ডগায় অগ্নিসংযোগে আরও কিছু মিশিয়ে নিচ্ছে। তারপরে দম ভরে সুখটান দিচ্ছে। ও কি পাগল? হ্যাঁ, পাগলই তো। হয়তো কারোর

BanglaBook.org

কাছে একটা সিগারেট চেয়ে-চিন্তে নিয়েছে। নচেৎ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো-টাকরা সংগ্রহ করেছে। তাই এখন রসিয়ে রসিয়ে টেনে যাচ্ছে। ছোটকাকার সেদিকে নজর নেই, মনে হয় এখনও "চাই না মাগো রাজা হতে" বিড় বিড় করে চলেছেন। না, কান পেতে স্পষ্ট শুনলাম আমাদের ছোটকাকা গানই গাইছেন। তবে ওই গানটি নয়, গাইছেন, "ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবীরাত আসেনি তো কভু আর, জীবনে আমার..." ঘুমকাতুরে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে না, ঝিকিমিকি তারাও ইস্টিশানের আলোর রোশনাইয়ে চোখে পড়ছে না, তবু, তবু ছোটকাকার গানে হয়তো চাঁদ-তারা এসে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ গুনগুনানি থামিয়ে আমাদের ছোটকাকা বললেন, "যাচ্ছিস চ, গিয়ে দেখবি সব 'জার্মান পার্টি'তে ভরে আছে!"

লোকগুলোকে ফের 'জার্মান পার্টি' বললেন আমাদের ছোটকাকা! কেন যে 'জার্মান পার্টি', এখনও বুঝছি না। আমরা সাবধানে রেললাইন পার হচ্ছি, পার হতে হতে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছি—কে জানে কখন হুড়মুড় করে এসে পড়ে! এতদিন যা ছিল স্বপ্নের, এখন তা যেন ভয়ের। ভয়ের, ভয়ের। ওই তো ফেলে আসা লাইনের উপর দিয়ে একটা যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনের উপর আলো ফেলতে ফেলতে এসে গেল! আমরাও পড়ি-কি-মরি দৌড়ে ঈষৎ টাল খাওয়া বাতিল বগিগুলোর গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

## তিন

এতক্ষণে বগির 'ডি-রেলড্' চাকাগুলো যে মাটিতে গিঁথে আছে ইস্টিশান চত্বরের ইতস্তত ছড়ানো লাইটপোস্টের আলোয় তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ভিতরে যে লোকজন আছে তাও বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টই। আচমকা একজন উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বহু পুরাতন বাতিল রেলবগির পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত খোলা দরজার পূর্বদিকের একটা দরজায় দৌড়ে এসে ঝাঁপ দেওয়ার ভঙ্গিতে দোদুল্যমান দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকল, দাঁড়িয়ে থাকল। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল তার গলায় ঝুলন্ত গাঁদাফুলের মালা, হাতে নারকেলের খুরি বা ওই জাতীয় মাটির মালসা কী ভাঁড় থেকে কী যেন সে তুলে তুলে খাচ্ছে। পায়ে ঘুঙুর তো নয় বাঁধা আছে সাদা কাপড়ের

দু'টুকরো ন্যাকড়া। তাই দেখে আমাদের বুঝতে আদৌ অসুবিধা হল না যে, এতক্ষণ সে ছিল নৃত্যরতা।

তার আলো-অন্ধকার মিশ্রিত মুখমণ্ডল আমাদেরই হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়ার, আমারই ছোটপিসিমার মুখ কী না তা স্পষ্টাস্পষ্টি চিহ্নিত করতে আমরা আরেকটু অগ্রসর হচ্ছি, আরেকটু, পূঁতিগন্ধময় দুর্গন্ধে আর একটুও এগোনো যাচ্ছে না, একটুও না, তখনই সে তার হাতে ধরা খুরির উচ্ছিষ্ট-আহার আকাশের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলতে লাগল, "চাঁদা মামা আ-লে-আ। দুদু-ভাত লে-লে-আ॥ হামার লুলু খা-লে-গা। গুব গুব গুব গুবা॥" আরেকটু হলেই কিছু উচ্ছিষ্ট আমাদের গায়ে এসে পড়ত, আমরা চকিতে পিছিয়ে এলাম। না, এ আমাদের ছোটপিসিমা না।

ছোটকাকা যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "আর না, চ! কাঁহাতক নোংরা-ঘাটা!"

ছোটকাকাকে কোনোমতে রাজি করালাম, "চলুন, অন্তত ওদিকটা একবার দেখে আসি!" বলেই ছোটকাকার হাত ধরে রেলবগির পশ্চিমে এদিকটায় এলাম।

BanglaBook.org

## চার

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পুবের তুলনায় রেলবগির পশ্চিম প্রান্ত কিঞ্চিৎ অধিকতর আলোকিত হয়ে আছে। রেলবগির প্রতিটি কামরায় কিছু-না-কিছু আলো পড়েছে। আর তাতেই আলো-অন্ধকারে ছায়ায় যেন রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। আমার ঘুরে ফিরে কেবলই মনে হচ্ছে—আছেন, আছেন। আমাদের ছোটপিসিমা এখানেই আছেন। হাতে একটা টর্চ লাইট থাকলে এসময় খোঁজাখুঁজির সুবিধাই হত, ভাবছি।

আচমকা ছোটকাকা তারস্বরে চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, "সুভদ্রা! সুভদ্রা! আছিস নাকি?"

সুভদ্রা? কে সুভদ্রা? হতচকিত আমি ছোটকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের ছোটপিসিমার আসল নাম যে 'সুভদ্রা', তা তো এতদিন জানা ছিল না! 'খেপী' 'খেপীবুড়ি', 'খেপীপিসি'—এসব নামেই তো ডাকাডাকি হত, গ্রামে-ঘরে কে আর আসল নাম ধরে ডাকে! এভাবেই

নবীনচন্দ্র হয় 'লাইবুকু', সত্যরঞ্জন 'টুম্পা', শ্রীকান্ত 'পেঁকা', ভুঁড়িওয়ালা শ্রীমন্ত হয়ে দাঁড়ায় 'ভণ্ডী', সুধাংশু উচ্চারণ দোষে দুষ্ট হয়ে 'সুদাইমুসুন'।

যাহোক, ছোটকাকার ডাকে যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল! বগির বাসিন্দাদের ভিতর ভনভনানি গুনগুনানি শুরু হল। পাগল-পাগলী কী আর সাধারণ মানুষের ডাকে কখনও সাড়া দেয়? দেয় হয়তো। আমাদের ছোটকাকার ডাকে তো অনেক না হোক, দুজন পাগল কামরা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এল! একজনের গলায় ঝুলানো বোঁচকা-বুঁচকি, হাতেও দু-দুটো বোঁচকা। সে টুর টুর করে হেঁটে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। যেন আরও কয়েকটা বোঁচকা তার এখনও ভরতি করতে বাকি আছে। সত্যি সত্যিই সে খানিকটা হেঁটে ঝুঁকে পড়ে এটা-ওটা কুড়োতে লাগল। মহিলা নয়, মহিলা নয়—সে পুরুষ মানুষ। এরপরে যে এল সে স্ত্রীলোক, পরনে তার শাড়ি নয়, ছেঁড়া-ফাটা শালোয়ার-কামিজ। মনে হয় কোনো হিন্দুস্তানি মহিলাই হবে। আমাদের চারপাশে চক্কর দিল নিঃশব্দে, তারপর হাতে হাতে তাল ঠুকে পরিষ্কার বাংলায় নেচে নেচে গাইতে লাগল, "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।। একবার বিদায় দে মা...।"

না, এ আমাদের ছোটপিসিমা না। ছোটকাকার মুখের দিকে তাকাচ্ছি, দেখছি পাগলীর গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও ঠোঁট দুটি নড়ছে কি না। না, ছোটকাকা খুব গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ করছেন। পাগলীটা তো আমাদের ঘিরে ধরে নেচেই চলেছে, নেচেই চলেছে। আচমকা "চা রা রা রা রা রা" করে চিৎকার জুড়ে দৌড়ে এসে আরেকজন স্ত্রীলোক পূর্বের স্ত্রীলোকটিকে প্রায় ঠেলে ফেলে আমাদের দুজনেরই অধিকার নিয়ে ফেলল। সে গাইতেও জানে না, সে নাচতেও জানে না, সে খালি আমাদের বাহু ধরে খামচা-খামচি শুরু করল। আমরা ভয়ে-ত্রাসে দৌড়ুলাম, দৌড়-দৌড়-দৌড়।

BanglaBook.org

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### এক

হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটকাকা বললেন, "রাত হয়ে গেল, আজ তো আর বাড়ি ফেরা হবে না, কোথাও থাকতে হবে।"

থাকার কথা উঠতেই আমার সবার আগে মনে পড়ে গেল বোগদার উত্তর-পূর্ব কোণের বাতিল রেলবগিটার কথা—ওই যেখানে একটা আস্ত গ্রাম ঢুকে বসে আছে! আমাদের ছোটকাকা তাঁদের 'জার্মান পার্টি' বলে যত অপদস্থই করুন না কেন, সেই বৃদ্ধার সেই কথা "মনত্ গর আঁরার বাড়ির পোয়া"—আমার বুকের মধ্যে যেন এখনও গেঁথে আছে। তাঁদের কাছে গেলে একটা রাতের মতো কী আর আশ্রয় পাওয়া যাবে না? হয়তো সেই বৃদ্ধা দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বলে উঠবেন, "আঁরার বাড়ির পোয়া, ইয়ানর এক্‌খান বেবস্থা গরি দওন পড়িবো..."

ছোটকাকাকে বলতেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার মুখের দিকে খানিক অপলক তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে আস্তে করে বললেন, "তোর যেমন রুচি! থাকতে হয় যদি থাকব রেলের ওয়েটিংরুমে।"

বেশ তো আছি খড়্গপুর রেল ইস্টিশানের ব্যস্তসমস্ত ২ নং প্ল্যাটফর্মের বাঁধানো সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে। 'ওয়েটিং রুম'-এর আর কী দরকার?

### দুই

রাত যত বাড়ছে, অদ্ভুতভাবে লোকজনও কমে যাচ্ছে। ট্রেনে চড়ে যাবার কথা ছিল যাদের, তারা চলে গেল। ট্রেনে চড়ে আসার কথা ছিল যাদের, তারাও এসে গেল। ট্রেন থেকে নেমে তারা তো আর আমাদের মতো প্ল্যাটফর্মের বাঁধানো সিমেন্টের বা লোহার বেঞ্চিতে অনন্তকাল বসে থাকল না! বড়জোর কাঁধের কী হাতের লটবহর একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে ফের কাঁধে বা হাতে জুত করে নিতে অথবা মুটের মাথায় চাপিয়ে দেয়ার প্রাক্কালে একটুখানি আমাদের পাশটিতে বেঞ্চিতে রাখল। তারপর যে-যার গন্তব্যে হুম-দুম চলেও গেল।

BanglaBook.org

আশ্চর্যজনকভাবে লোকজনও কমতে লাগল। আমরা ক্রমশ নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হতে লাগলাম। আশপাশের গাছগুলি, দূরবর্তী ঘরবাড়িগুলি ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে গেল। গৃহকর্তার বা সন্তানাদির প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় গৃহস্থবাটির সদর দরজার সম্মুখস্থ যে-বাতিটি তখনো অনির্বাণ ছিল, সফল ও সশব্দ দরজা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাও নিভে গেল। গবাক্ষ বা ঘুলঘুলি দিয়ে যৎসামান্য আলো এখনও আসছে। আসছে, আসছে। আমি দূরবর্তী বাড়িগুলোর দিকে, উঁ-হু বাড়িগুলোর যৎসামান্য আলোকিত গবাক্ষ বা ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে আছি, ছোটকাকা মুড়ির পোঁটলা খুলে ডাক দিলেন, "আয়! মুড়িটা খেয়ে নিই!"

## তিন

রাত বাড়ছে, রাত বাড়তে লাগল। সিমেন্টের বেঞ্চিটার দখল নিয়ে এধারে-ওধারে ছোটকাকা আর আমি শুয়ে আছি। আমার চোখে ঘুম নেই, চোখ আমার লটকে আছে দূরবর্তী সেই গৃহটির দিকে। নাহ্! আলো এখনও নেভে নাই! ঝম্ ঝম্ করে একটা 'এক্সপ্রেস' ট্রেন এসে গেল, বোধকরি 'ডাউন ট্রেন', যাবে হাওড়ার দিকে। গায়ে এসে ধুলো-ঝড়ের ঝাপটা লাগল। মাথা তুলে ঈষৎ উঁচু হয়ে দেখছি—বোঁচকা-বুঁচকিসহ কিছু লোক নামল। এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে যারা ঘোরাঘুরি করছিল, ইতস্তত এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসেছিল, তাদেরই কিছু লোক নেমে পড়া যাত্রীদের সঙ্গে করে চলেও গেল। এখনও কিছু লোক অবশিষ্ট পড়ে আছে, নারী-পুরুষ, সঙ্গে তাদের লটবহর। বুঝতে অসুবিধা নেই যে তারা 'আপ ট্রেন' ধরে তাদের গন্তব্যে যাবে। এইমাত্র তারা উঠেও দাঁড়াল, দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লাইনের ধার বরাবর। তার মানে ট্রেন বুঝি এসে গেল! আমার আর ট্রেন দেখার আগ্রহ নেই, মাথা নামিয়ে ফের চোখ রাখলাম সেই গবাক্ষ বা ঘুলঘুলিতে, নাহ্। আলো এখনও নেভে নাই! ট্রেন এল, নির্দিষ্ট যাত্রীদের নিয়ে ট্রেন চলেও গেল।

খড়্গপুর ইস্টিশান চত্বর অর্গলহীন, ফাঁকা। ফাঁকা। ফাঁকা। কে আর ভবঘুরেদের অর্গলবন্দী করে রাখে। রাত যত বাড়ে ততই ভয় হয়—এই বুঝি তারা বাতিল ট্রেন কামরা থেকে বেরিয়ে এল পিল পিল করে! তাও যদি আমাদের ছোটপিসিমা আসতেন! দু-চাট্টা রাতচরা, বোধহয় লক্ষ্মী প্যাঁচাই

BanglaBook.org

হবে, এদিক-ওদিক থেকে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ বেরিয়ে জ্বলন্ত লাইটপোস্টের আলোকুহকের ভিতর দিয়ে উড়ে গেল অন্ধকারে। এতক্ষণে দূরবর্তী গৃহস্থের গবাক্ষের আলোটিও নিভল, নিভে গেল। কাঁহাতক আর জেগে থাকা যায়! বোধকরি আমাদের ছোটকাকাও ঘুমিয়ে পড়েছেন, নাক-ডাকার যৎকিঞ্চিৎ আওয়াজ পাচ্ছি। তদুপরি মাথার উপর অ্যাসবেসটাস ছাদের কড়ি-বরগার গলি-ঘুঁজিতে পাখির পা-আঁচড়ানোর সর্‌ সর্‌ আওয়াজ। হয়তো রাতের কাক কড়ি-বরগার খাঁজে-খাঁজে আশ্রয় নিয়েছে। তাছাড়াও দূরাগত কিছু ধ্বনি, এই যেমন ট্রাক-লরির হর্ন, সাইকেল-রিক্সার ভেঁপু, গাছে পাখি ভদ্‌কানোর "কঁ-হ-রো-ল" "পঁ-হ-রো-ল" ডাক—মাঝে মাঝে তন্দ্রার মধ্যে এসে যাচ্ছে। সেটুকুও আর কতক্ষণ! একসময় ঢলে পড়লাম ধুল-মাদুল ঘুমে!

## চার

কে যেন জামার হাতা ধরে টান দিচ্ছে, গায়ে চিমটি কাটছে! ছোটকাকা কী? সন্তর্পণে উঠে পড়লাম। না, ধারে-কাছে কাউকেই তো দেখছি না! ফের ঘুমোবার উদ্যোগ করছি, লোকটা এল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হিলহিলে চেহারার। ফিসফিস করে বলল, "যিস্‌সে তুম ঢুড় রহা হো উনকো পতা হামারা পাশ মেঁ হ্যায়, মিলনে চাহিয়ে তো আ যা মেরা সাথ—আ যা—"। যাব কী যাব না—ভাবছি। লোকটা জানল কী করে যে আমরা মানসিক ভারসাম্যহীন আমাদের ছোটপিসিমাকে খুঁজছি? তারপর মনে হল বাতিল এ-ট্রেনের বগি সে-ট্রেনের বগি, সমস্ত প্ল্যাটফর্ম, মায় ইস্টিশান চত্বর সেই কখন থেকে ছোটপিসিমার সন্ধানে ঢুঁড়ে চলেছি, একে জিজ্ঞাসা করছি তাকে জিজ্ঞাসা করছি, লোকে তো জানবেই। সেভাবে হয়তো এ লোকটাও জেনে ফেলেছে। তা বলে এত রাতে কেন? লোকটা পাগল নয় তো? কেমন খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উশকো-খুশকো চুল, পোশাক-আশাকেরও তেমন ছিরিছাঁদ নেই।

আমাকে দোনোমনো করতে দেখে দাঁত বের করে হাসল, "ক্যায়া তুঝকো ডর লাগতা হ্যায়?" আমি তেমন হিন্দিটিন্দি বুঝি না, ছোটকাকাকে ডাকব কী না ভাবছি, লোকটা আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো হেঁটে চলেছি। বারেক হাত ছাড়াবার

BanglaBook.org

চেষ্টা করেছিলাম বৈকি, কিন্তু লিকলিকে লোকটার হাতের জোর বড়ো কম ছিল না।

আরেকবার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই লোকটা তার ডানহাতের মুঠোয় আমার হাতটা আরও শক্ত করে মুচড়ে ধরে বাম হাত পকেটে ঢুকিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় একটা 'চাক্কু' বের করে আমাকে দেখিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "তোর কাছে টাকা কড়ি যা আছে চটপট দিয়ে ফ্যাল, নচেৎ—", বলেই সে আমাকে ছুরি দেখাল!

বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আছি, মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোচ্ছে না। ছোটকাকা এখন কোথায়! প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। লোকটা আমার জামা-প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে 'সার্চ' করল, একটা পয়সাও তো পেল না! না পেয়ে আমার কপালে তার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে সামান্য ঠেলা দিয়ে ছুরিটা পেটের দিকে এগিয়ে আনল—

এগিয়ে আসছে—আসছে—আরেকটু—আ-র এ-ক-টু—

"অঁড়্‌গা-ধরা'দের কথা মনে পড়ল। অঁড়্‌গা-ধরা—তার মানে ছেলেধরা। পরমুহূর্তেই হাস্যকরভাবে মনে এল—আচ্ছা, ছুরিটা ছুরিই তো? না, পাখির পালক?

'চাক্কু'টা কিন্তু এগিয়ে আসছেই! আর মাত্র আধ ইঞ্চি ফাঁক!

BanglaBook.org

# এক টুকরো স্লিপ

## ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

এক

মুখার্জী উকিলের মুখে কথাটা শুনে শ্রীকেশ মণ্ডলের বুকে হৃৎপিণ্ড ফেরে, বাব্বা আর যাই হোক সুইসাইডের হ্যাপা থেকে বাঁচলাম মনে হচ্ছে...।

ষাট-বাষট্টি অতিক্রান্ত পিতা। তার কণ্ঠস্বরে পরিত্রাণ..., না আরো গভীর গিরিখাদে প্রবেশ ঠিক বুঝতে পারে না সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলে সুগত। তরুণীটির সঙ্গে এক বছর জীবনযাপনে তো সুগত পার করেছে কয়েক কোটি মুহূর্ত!

সামনেই ছোট্ট মাঠটায় লম্বা করে সরু শেড ডাইনে বামে কোর্ট বিল্ডিংগুলো ছুঁয়েছে। বর্ষায় উকিলবাবুদের গাউন, হাতের ব্রিফ সহজে না-ভেজে সেই ব্যবস্থা। এই মাঠে এক ব্রিটিশ সাহেব জজের হাতে রোপণ করা মস্ত বকুল গাছ...। গাছটার দুপাশে উকিল মুহুরিদের সঙ্গে হেঁটে-চলা মক্কেলদের পায়ে পায়ে সবুজ ঘাস পিষ্ট হয়ে খাবলা খাবলা ন্যাড়া মাঠ। ওপাশে পুরোনো উকিল-বারটির ছাদে ত্রিভুজ স্থাপত্য। তার মধ্যে লেখা ১৯৩৮। স্থাপত্য ডগায় ভারতের জাতীয় পতাকা হাওয়ায় ওড়ে। ওড়ে তো পতাকাটা হাওয়ার গতির আঁকবাঁকে। সে বাঁকে তাকিয়ে মনে হল সুগতর, এই দেশটার নিয়ম ও প্রথায় তো আমার জন্মধারা...এবং যাপন এই মাটিতে—অন্তত যতদিন এ মাটিতে থাকবো...!

মাঠের ওপারে গায়ে গায়ে পাঁচ-ছ তলা দুটো মস্ত বিল্ডিং। একটাতে ফৌজদারি আর একটায় দেওয়ানি। কোর্ট দুটোর মাথায় আকাশ আটকে। আটকে আছে তো সুগত। সুতরাং সুগত কাগজটা নিয়ে মুহুরির কাছে যায়, ইনফরমেশান স্লিপ ব্যাপার একটু বুঝিয়ে দেবেন?

মুহুরি ডাইরির পাতা ওলটাতে ওলটাতে পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বলে, দু-মিনিট প্লিজ। এর-টা সেরে দিই?

ছাপা কাগজটার মাথায় এক কোণে লেখা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর্ম নং ৮৭০। ফর্মটা মাঠের, না এমন আকাশছোঁয়া বিচারালয়ের জানালা দরজা গলে সওয়াল জবাবে ধারা উপধারায় ভারী বাতাসের মৃদু ধাক্কায় কাঁপে। বা দোলে। পরক্ষণে সুগত নিজেই ফর্মটা মেলে পড়তে থাকে। আন্ডার সেকশনে থার্টিন অফ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট নাইন্টিন ফিফটি ফাইভ...

পড়তে পড়তে বুকের মধ্যে চিরে গিয়ে পেটের মধ্যে পাক খায়, আরো কিছু শব্দ...বাক্য পড়া বাকি...। তখনই সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুখার্জি বলেছেন তো দরকার হলে সর্বত্র এই কাগজ...মানে এর জেরক্স কপি দেখাবে...। অরিজিন্যাল...একদম নয় কিন্তু...যদি কেউ অরিজিন্যালটা ছিঁড়ে নিয়ে পালায়! তখন...! মুখার্জির সেই নির্দেশ মনে হতেই সুগত ইনফরমেশন স্লিপটা পাকিয়ে পাঁচ আঙুলে আগলে রাখে। যেটা আগলাতে চাইল, সেটা কি শুধু ওই কাগজ...! কাগজে উচ্ছিষ্ট মানুষ তো এক তরুণী...বা প্রায় সমবয়েসি রমণী মানুষ...।

BanglaBook.org

ক'দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোনে বিপর্যস্ত সুগত। সুগতর মা বাবা মিলিয়ে এখনকার এই ক্ষুদ্র পরিবার। বাড়িতে ফিরে যে যার পছন্দের পাতনি বালিশে মাথা রেখে রাত কাটায়। ছাদের উপর দিয়ে দিনের মেঘ রাতের মেঘও মৃদু হিমে গা জুড়িয়ে ধীরে ধীরে আকাশ ডিঙিয়েছে নিজ লয়ে। গাছের কোটরে...শাখার ডগায় পাখিরা মনের মতো বাসা রচনা করেছে তো রাত পার করতে...। ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে উঠতে।

দূরের শালবন আগাছায় ভরা টিলা-পাহাড়ের গা-বেয়ে পাথুরে নদী, মফস্বলী গঞ্জ, নতুন পোঁতা ইলেকট্রিক পোস্ট, চাষের মাঠ, নোনাগাঙের জলে ফিশারি, গেরস্থর আম জাম শিরিষ বটের পাতায় পাতায় শেষ যামের ঘন অন্ধকার। হঠাৎ মোবাইলের লাল আলো জ্বলে রিং টোন...! সুগত পাশ ফিরে স্ক্রীনে চোখ রাখে। নম্বরগুলো দেখতে দেখতে তো চিনে ফেলে। আঙুল বাড়াতে গিয়ে একটু থমকে ভাবে, নম্বর...নম্বরকে দিয়ে মানুষটা কে, তো আন্দাজ করছি... কিন্তু একদিন দুদিন ফোনে কথা বলেছি, তাতে যদি মানুষটাকে খানিক বুঝতে পারতাম...! কিংবা এত দূর বিদেশ থেকে গিয়ে এক-দুদিনের মধ্যে মাত্র এক-দেড় ঘণ্টা কথা বলে ফাইন্যাল করার আগেও যদি বোঝা যেত মেয়েটির মনে...মাথায় যে কতরকম কী লুকিয়ে...বা ঘুমিয়ে আছে...! মনে, মাথায় এমন কিছু লুকিয়ে-থাকা বা ঘুমিয়ে-থাকা তো একটা ছেলে বা পাত্রের ক্ষেত্রে হতে পারে...! তখন মেয়েটি বা কন্যা পক্ষ তো নাও ধরতে পারে...! আদতে ব্যাপারটা কি ধরতে পারা? না, গোপন করা এই প্রথা...কাঠামোয়...?

এতক্ষণ বাটন অন করেনি সুগত। সুতরাং মোবাইলে আবার রিং হয়। এবং ঘুমঘোরে আলগা কথার পিঠে কথায় কোনো গোপন সূত্র বেরিয়ে পড়ে কিনা, সেটা ধরার জন্য এত রাতের কৌশল হতে পারে...! এই সম্ভাবনাগুলো সামনে রেখে সুগত বাটনে আঙুলের চাপ দেয় না। বরং বিছানা থেকে উঠে আলমারির কাছে যায়।

শাল-সেগুন কাঠের ফ্রেমে কাচ লাগিয়ে আলমারির পাল্লা। বেড ল্যাম্পের স্বল্প আলোয় নিজের ক্ষীণ ছায়া কাটে সে কাচে। বই পত্তর অন্য ফাইল সার্টিফিকেট ইত্যাদির র‍্যাকের নিচে তো কোর্টের কাগজ। সুগত কোর্ট

BanglaBook.org

ফাইলটা টেনে বাইরে আনে। খট করে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালতে শেডের মধ্যে গোলাকার আলো। কভার ফাইলের গিঁট খোলে।

আচমকা ফোনের বাজনা...! আলো জ্বলে ওঠায় তো চোখের উপর ধাক্কা। বাবা ছেলের দিকে নজর রেখে বলে, এই কী করছিস! ফাইল কি হবে?

কাগজটা মেলে চোখ বোলায়, ইনফরমেশান স্লিপের কলামটা দেখছি, কী লেখা আছে?

সুগতর চোখে মুখে ঘাম। ঘামের উপর আলোয় আর এক ঝাপটা তাপ।

চাপা কণ্ঠে বলে, কী আছে লেখাটা?

—ইনফরমেশান রিকোয়ার্ড ঘরে প্রশ্ন, পরবর্তী তারিখ কবে? কি জন্য ধার্য হয়েছে?

—উত্তর?

—পাঁচ পাঁচ দুহাজার তেরো সাল। ওদিন ডিস্ট্রিক্ট জজের কাছে ডকুমেন্টস ফাইল করতে হবে। তারপর ও-পক্ষকে নোটিশ দেবে কোর্ট।

—উম...

মোবাইলের রিং টোন। সুগত সাবধানে মুখ বাড়ায় স্ক্রীনটার চৌকো আয়তনে। চেনা নম্বর...জানা রমণী...!

এখনো রাত ফুরোয়নি। ভোর ফোটেনি। ঘুম আসে না এ-বাড়ির তিন মানুষের।

## দুই

হাতে ছোটো একটা ব্যাগ আর পলিথিন প্যাকে মিষ্টি নিয়ে কলাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়ায়। কলিং বেলটায় আঙুল চাপ দেয়। ভিতর ঘরে গির্জার ঘণ্টা বাজে।

এ শব্দে মুখ বাড়ায় চন্দনা। তাড়াতাড়ি আঁচলটা কাঁধে ফেলে গেটের কাছে আসে চন্দনা। গেট ধরে টান দিয়েই বলে, তোমাকে কত দিন পরে দেখতে পাচ্ছি মেমপিসি এত কাছে...

আবার টানতে গিয়ে বোঝে চাবি দেওয়া আছে। পিছনে এক্সারসাইজ গেঞ্জি পরে বছর নয়েকের ছেলেটা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যায়।

BanglaBook.org

সরু গলায় বলে, মা কে গো...?

—উঁ...ওই...যে...বলে চাবিটা এদিক সেদিক খোঁজে। কোনো টেবিলে, নাকি ড্রয়ারে রেখেছে, খেয়াল করতে পারছে না। টেবিলের ঢাকনা সামান্য সরাতেই চাবির রিং হাতে পায়। মুঠোর মধ্যে বড়ো রিংয়ে দুখানাই গেটের চাবি। হুক থেকে চাবিটা খুলে গেট টান দেয় চন্দনা।

পিসি বলে, মাত্র একটা চাবি কেন রে? তোদের এদিকেই তো জঙ্গলমহল। রোজ একটা কিছু...দারোগা ছিনতাই, পুলিশব্যারাক আক্রমণ, সরকারের টহলদারি বাহিনীর উপর গোপন আক্রমণ। খবরে দেখি কারা সব মেরেটেরে গুলি বন্দুক লুট করে নিয়ে পালায়...দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়...! তুই মা দুটো তালা দিয়ে থাকবি। কে ভিখিরি হোক আর পুলিশ সেজে...একলা মেয়েছেলে থাকিস এই বাচ্চা নিয়ে...

—না গো পিসি, এখানে এসব নাই। জঙ্গলমহল এইখান থেকে বেশ দূর...। তারা সাহস পাবে না, চন্দনা পালটা বোঝায়। খানিক চুপ থেকে পিসি আন্তরিক হয়, জামাই...যুধাজিৎ ফিরবে কখন?

—দেরিতেই ফেরে, তবে আমি ফোন করে দিচ্ছি অন্তত আজ যদি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলে একটু আগে আগে...

হুট করে পিসি ভাবে, আমরা ক'জন এসে উঠলাম নামমাত্র জানিয়ে, তায় আবার অফিসারকে বলে যুধাজিৎয়ের তাড়াতাড়ি ফিরে আসার তেমন তো জরুরি নেই...? কেনই বা জামাই মানুষটির বিরক্তির কারণ হই আমি...বা...আমরা...! সম্পর্কে যতই পিসিশাশুড়ি হই, জামাইয়ের নিজের শাশুড়ি তো নই? এতক্ষণ এসব ভাবছিল পিসি...। চন্দনার পিসি বিনতা। ফিঠফর্সা চেহারা তাই নাম মেম পিসি।

পিছনে সুগত। তার হাতে বড়ো ফোলিও ব্যাগ। ভেতরটা ভারী আন্দাজ হয়। সুগতর দিকে তাকিয়ে চন্দনা বলে, তুই আমাকে লজ্জা পাচ্ছিস বিয়ে করে? বউকে আনিসনি কেন?

বুক কাঁপিয়ে চকিতে মুখ কালো হয়ে যায় সাতাশ-আটাশের ছোকরার। নিজের অজ্ঞাতে এক পা সরে দাঁড়ায়! কী ভীষণ জোরে যে দশ আঙুলে ফাইলটা পেটের কাছে চেপে ধরে সুগত!

ভারী চেহারায় লম্বাটে বিনতা পিসির বুকের ভেতরটা চিরে মেমফর্সা

BanglaBook.org

মুখে রক্ত জমে। ব্লাউজ আঁচলের তলায় যে কী দপদপানি...! সে মুখ দেখে চন্দনা খাওয়ার টেবিলে চেয়ারগুলোর দিকে হাত বাড়ায়, ও মেমপিসি তুমি...তোমরা এটাতেই না হয় বসো। আমি ফ্যান চালিয়ে দিচ্ছি? সুগত বসবি তো, বলেই ধরে বসায়।

মা চন্দনার পাশে তো ক্লাস ফোরের জয়ন্ত। শ্রীকেশ মণ্ডল তখনো বসেনি। সুতরাং কৃতিত্ব নিতে জয়ন্ত মানুষটার হাত ধরে টেনে চেয়ারের সামনে আনে, দাদু তুমি বসবে তো?

সবাই জয়ন্তর কাণ্ডে হাসে। আবহাওয়া সহজ হয়।

টিভির ঘরে কার্টুন চালিয়ে তো জয়ন্ত মশগুল। চায়ের কাপে বার তিনেক চুমুক দিয়ে সবে নোনতা বিস্কুটে কামড় বসিয়েছে শ্রীকেশ মণ্ডল, পাশ পকেটের মোবাইলে রিং টোন! আধখানা বিস্কুটটা রেখে মোবাইল হাতড়ে বাইরে আসে। সবুজ বাটন টিপবার আগে হাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে। স্ক্রীনে পাড়ার নিকট প্রতিবেশির নম্বর নাম ভাসে। একটু একটু ধাতে ফিরে শ্রীকেশের চাপা উচ্চারণ, হুঁ দীনেশ কিছু খবর আছে?

—তা আছে।

—কি?

—তোর বাড়ি এক পুলিশ অফিসার আর দুজন বন্দুক কাঁধে কনস্টেবল এসেছিল রে?

—উঁ...তাই...! কখন?

—আজই দুপুর দুটো তিনটে—

—তাহলে এবার?

—রক্ষিত উকিল বলল আমি জানতাম পুলিশ কেস হবে এসব ক্ষেত্রে। কেউ ছাড়বে না যতই আগে কেসটা করুক মুখার্জি বাবু আর মেডিক্যাল পেপারস থাকুক তোদের।

—তারপর...

কথা কেটে যায়। শ্রীকেশের বুকের মধ্যে ধক ধক শব্দ। সিলিং ফ্যানের হাওয়া শ্রীকেশের মাথায়। টেবিলের কাপে চা ঠাণ্ডা হয়। বাবার মুখ দেখে ঘেমে যায় সুগতও। বিনতার চোখে চাপা আশঙ্কা। খুব গম্ভীর শ্রীকেশ। হঠাৎ বলে, চন্দনা তোমাদের বাড়ির রাস্তায় বেশ হাওয়া।

BanglaBook.org

—ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দোব পিসেমশায়?

টেবিলে প্লেটে চানাচুর, দুচারখানা নোনতা, বাটিতে সামান্য মুড়ি সঙ্গে গরম চা তো উপাদেয় হালকা টিফিন। সুগত চানাচুরে একটা দুটো বাদাম খুঁজে খুঁজে খায়।

চন্দনা বলে, সুগত থাম, তোকে আর একটু চানাচুর দিই।

সুগত পেছন পেছন গিয়ে বলে, থাক না। লাগবে না।

—তুই থাম। আমি তোর চেয়ে বড়ো। তুই আমার বাড়ি এসেছিস..., আর কিছু কথা জন্মায় না।

দূর সম্পর্কে মামাতো দিদি। বছর দুই-তিনেকের বড়ো চন্দনার দিকে তাকিয়ে কিন্তু সুগতর মনে জন্ম নেয়...সব মেয়েদের পক্ষে কি পর বাড়ি নিজের বাড়ি হয়ে ওঠে...! নাকি মেয়ের মা-বাবা পর বাড়িটা মেয়ের নিজের বাড়ি হয়ে উঠুক সেই ভালোবাসায় বিয়ে থা দেয়...! বা নতুন বাড়িটা...বাড়িটা ঘিরে সম্পর্ক টেকসই হোক সে পদ্ধতির মধ্যে সচেতনভাবে প্রবেশ করতে চায়...! অনেক ছেলের বাড়ি কি তার বউয়ের-বাপের-বাড়ি গোটা পরিবারের কাছে আপনজনের বাড়ি হয়ে ওঠার পথে যেভাবে এগোনো উচিত, সে ভাবে পদক্ষেপ ফেলে...? কত কন্যাপক্ষ বা পাত্রপক্ষ তো বিবাহ নামক প্রথা বা আইনি ব্যবস্থার পর শালগ্রাম শিলার সামনে হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে বেদ মন্ত্রের সঙ্গে খাঁটি গব্য ঘৃতাহুতি দানে এই সামাজিক সম্প্রদান-পদ্ধতি সম্পাদন করেন। সব কন্যাপক্ষ বা পাত্রপক্ষের সম্প্রদানের মধ্যে কি সমান খাঁটিত্ব বা আন্তরিকতা থাকে...! তবে...তবে কোনো মেয়ে বা কন্যাপক্ষের যাবতীয় অভিযোগ শোনা বা রাষ্ট্রীয় অঙ্গের কাছে দাখিল করা মাত্র সেই প্রতিষ্ঠান কন্যা পক্ষের উক্ত অভিযোগগুলিকে ধ্রুব সত্য, বেদ বা গসপেল ট্রুথ বলে ধরে নেয় কেন...! বহু পাত্রপক্ষ তো অত্যাচার করে। সকলে তো করে না। অনেকের বোধ ও রুচিতে বাধে। কিন্তু কন্যাপক্ষ অভিযোগ রুজু করলেই বা অগ্রিম ধারণা হবে কেন যে, এই মেয়ে বা মেয়েপক্ষের কোনো ত্রুটি নেই। সীতা সাবিত্রীর দেশে ত্রুটি থাকতে পারে না, সম্ভব নয়...। এ এক মহা সামাজিক দুর্বলতা। সত্যি কি সময়...সমাজ আগের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে...? না থাকা সম্ভব?

BanglaBook.org

টেবিলে চানাচুরের কৌটো থেকে মুঠো খানেক প্লেটে ঢালে চন্দনা। প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে চন্দনা বলে, তুই খেতে আরম্ভ কর—

শ্রীকেশ তো ফোনটা পাওয়ার পর কোন্ অতলে...! বিনতা আঁচ করে নিয়ে ভেতরে পাক খায়। সুগত বাবা মানুষটার মুখের রঙ দেখে তার বুকের ভেতরে অনেকক্ষণ সেঁধিয়ে আছে।

চন্দনা দেখে সুগত খাচ্ছে না। নিজে দু'পা এগিয়ে একদম সুগতর মাথাটা ধরে বলে, হাঁ কর, না হয় তোর বিয়েতে দিদিকে নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছিস। আমাদের গোটা বংশে কি সকলকে নেমন্তন্ন করা সম্ভব..., নে খা আমি তোর গালে..., 'দিচ্ছি' কথাটা বলার আগেই সুগত দিদির হাতটা ধরে বলে, ভুলে নয় রে দিদি...ভুল...পুরো পর্বটাই...ভুল...

চন্দনা বুঝতে পারে সুগত তার হাতটা তো আটকায়নি, বরং আঁকড়ে ধরেছে! দেখতে পায় সুগতর ভারী চোখে অনেক কথা!

চন্দনা হাত আলগা দেয়। দিদি হলেও এক রমণী মায়ায় মরমে গলে যায় যুবক সুগত। পিঠে হাত বুলিয়ে চাপা ব্যথা মোছায় দিদি, উঁ...নে খা—

পাঁচ আঙুলে দুটি খানেক চানাচুর গালে নিয়ে সুগত হাতটা ওপাশে ব্যাগে রাখে। চেন টেনে ভেতরে হাতড়ায়। সাবধানে ফাইলটা বের করে। কভারের উপর মোটা ফিতের গিঁট। গিঁট খুলতে উদ্যোগী সুগত। চন্দনা বলে, কি করবি?

কোনো উত্তর না দিয়ে কাগজটা মেলে ধরে, দ্যাখ দিদি বিয়ের মাত্র তিন মাসও কাটেনি একই দিনে সাত আটবার সুইসাইড করতে যাচ্ছে। গ্যাসের উনুনে আগুনে হাত পোড়াতে যাচ্ছে, দরজা বন্ধ করে গলায় তোয়ালে জড়াতে যাচ্ছে...

—কেন রে...!

মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ন'বছরের ছেলেটা সুগতর কথা শোনে। সবই তার কাছে অপরিচিত বাক্যমালা। তবুও সে বিস্তারে সে মনোযোগী।

—কেন আর...! বিয়ের আগে থেকে ডেলি দুবেলা হাই প্রেসারের ট্যাবলেট খায়, এসব বলেইনি বিয়ের কথাবার্তার সময়, এটুকু বিবরণ রেখে দিদির মুখের দিকে তাকায় সুগত নৈতিক সমর্থনের আশায়। দিদির ফর্সা মুখে বাক্য না ফুটলেও, মনে যে লিখিত হয়, ও প্রেসার ট্রেসার আজকাল

BanglaBook.org

অনেক অল্পবয়েসি ছেলেদের লেগে যায়। মেয়ে বলে কি তারাই দোষী...!

চন্দনার আগ্রহ জাগাবার আকাঙ্ক্ষায় সুগত কাগজগুলোর মধ্যে খোঁজে। পেয়ে যায় ডাক্তার ফাডকের সই। বলে, দ্যাখ দিদি মেয়েটির থাইরয়েড রিপোর্ট টিএসএইচ সেভেনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু...। ডাক্তার রোগীর গলায় হাত দিয়েই বলেছে, এটা ওল্ড কেস...।

মেয়েপক্ষ বলছে, ও ডাক্তার ইডিয়েট। এসব রোগ তো বিয়ের পর হয়েছে...

—তাই...চন্দনার চোখ বড়ো হয়!

—আসলে না দিদি...

চন্দনা ভাই সুগত নয়, একজন যুবক...সদ্যবিবাহিত যুবকের মুখ দেখে নিজের মাত্র ন'বছরের জয়ন্তর দিকে তাকায়। চন্দনার গলা ধরে যায়, ইস মেয়েটাকে চিকিৎসায় সারিয়ে টারিয়ে তবে দিতে পারতো...ওদিক থেকে মাত্র এইটুকু বাক্য বেয়ে সুগতর কানে আপনজনের কণ্ঠ। বেশিরভাগ আত্মীয়জন তো সুগতর বাবা-মায়ের বিবরণে দ্বিধাগ্রস্ত! সুগতর বুক ছিঁড়ে যায়। ভাবে, আমার এই এমন আপনজনদের বাড়ি এরকম সুপ্ত, ঘুমন্ত রোগ-বীজবাহী কোনো পুত্র কন্যা না জন্মালে বা প্রতিবেশী বাড়ি এমন রোগী-বউ না এলে টের পাবে না, হঠাৎ হঠাৎ কী দুঃসহ সে যন্ত্রণা... ঘণ্টা...সে সংসারে। একজন সদ্য যুবকের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষী জীবনে! সম্প্রদান পদ্ধতিতে এমন যদি কোনো যুবতী বা তরুণীর জীবনে স্বামী-পুরুষটি হত...! তিনি কী করতেন...! প্রায় একবচ্ছর বা তার বেশি ক'মাস ধরে প্রশ্ন উত্তরে তো নিজেকে দীর্ণ করেছে সুগত। চন্দনা মেয়ে বাড়ির মেয়ে না হলেও, সে তো একজন প্রাপ্ত বয়েসের মেয়ে। তার চোখের দৃষ্টিতে মায়া এই যুবক...ভাইটার জন্যে। সুগত রিপোর্ট মেলে ধরে,—দ্যাখ দিদি আমি বাইরে যেখানে কোম্পানিতে পোস্টেড ছিলাম সেখানকার মেন্টাল হসপিটালের ডাক্তার রিলিজ করার সময় অ্যাডভাইস লিখেছে, 'নেভার বি কেপ্ট অ্যালোন। চান্সেস অফ সুইসাইড এনিটাইম...' এবং ওষুধ তো কনটিনিউ চলবে...

খাওয়ার টেবিলে রিপোর্ট। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় রিপোর্টটার এক প্রান্ত নড়েচড়ে। নড়েচড়ে যে চন্দনার বুকের ভেতরটা...ইস কেন যে ও বিয়েয় নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছে...বউকে আনিসনি কেন..., এসব বলতে গেলাম!

BanglaBook.org

চন্দনার ফর্সা মুখে কুঞ্চন। সে মুখ দেখে সুগত দিদির হাতটা ধরে, —দ্যাখ দিদি আমি ওই বিদেশে প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি সামলাই, না রোগী দেখি। যে রোগ...তা কি দুদিন তিনদিনে সেরে যাবে?

—তাই তো।

দিদির এমন মত পেয়ে সুগত জারিত,—বুঝলি দিদি, কত করে বলা মেয়ের মা বাবা মামি মাসি দিদা ঠাকুমাদের, দেখবেন একদম বিদেশ বিভুঁই, আত্মীয়-স্বজনহীন জায়গা, সেখানে থাকতে হবে, সেরকম আপনাদের মেয়ে মনে ও দেহে যেন যোগ্য হয়। নাহলে বিয়ের আলোচনা এখানেই বন্ধ হোক।

—উঁম..., বলে ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—তখন...তখন ওই মা মাসি দিদারা কথা দিল, না কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের মেয়ে ঠিক পারবে।

—ওদের পছন্দের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল কদিন পর। সেই ডাক্তার লিখলেন, রিপিটেড সুইসাইডাল অ্যাটেম্পট। অ্যাডমিশন টু মনোবিকাশ কেন্দ্র...ওষুধ নিজেদের কাছে রাখবেন। নাহলে একসঙ্গে সব ওষুধ খেয়ে নেবে পেশেন্ট...

—তাই...! এরপর তোরা মেয়ের বাড়ির মা বাবাকে ডেকে আলোচনা করিসনি?

—হুঁ। ও-পক্ষ বলল, আমরা ভেবে ছিলাম বিয়ে দিলে এসব সেরে যাবে।

—তাহলে ওরা জেনেই দিয়েছে। রেজিস্ট্রি করেছিলিস?

—হুঁ। বিয়ের দিন নাইন্টিন ফিফটি ফোর হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট সেকশান থারটিন...

—আইনে পাকাপোক্ত ভদ্রলোকেরা।

—শুধু তাই রে দিদি? মেয়ে মামা কোথায় চাকরি করে, আবার কোন্ পার্টির নেতা টেতা...তিনি বলছেন, মেয়ে আর সুইসাইড করবে না। দশটাকার স্ট্যাম্প নিয়ে আসুন, লিখে দিচ্ছি এরপর মেয়ে সুইসাইড করলে, আমরা আপনাদের নামে পুলিশ কেস করব না।

—ধুস্। উনি কি দেশের আইন নাকি? ঘটিয়ে ফেললে এমনি ছেড়ে দেবে?

BanglaBook.org

দিদির এমন ব্যাখ্যায় সুগতর বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে! ভাবে, এমন কথাবার্তায় দেশের পুলিশ এস পি, জজ উকিলবাবুরা কি হাজির ছিলেন যে, আসল সত্য পর্বটা দেখেছেন? তাহলে অভিযোগ মাত্র রাষ্ট্রের বাহিনী...! একটু এসে ডেকে...আলোচনা...টনা তো মানুষ, সামাজিকভাবে আশা করে। যেহেতু সামাজিক প্রথা...পদ্ধতিতে... হুট করে চন্দনার হাতে হাত ছুঁয়ে বলে, মাইরি দিদি এখন না রাস্তায় পাড়ায় মেয়েদের দেখে বুকের মধ্যে কী সব হুড়মুড়িয়ে ঢুকে গা-হাত-পা কাঁপায়। ওদের মধ্যে চেনা মাসি জেঠিদের দেখে মনে হয় কাজ বাগানো হাসিল হলে ওরাও বোধ হয় আমার মিষ্টভাষী শ্বশুর দিদিমণি শাশুড়ি নেতা বা নেতাদের সঙ্গীসাথী মামাশ্বশুর হয়ে উঠতে পারে। ওদের অন্তরে বা দেহে হিংস্র জন্তু লুকিয়ে আছে...!

—এই আমিও তো একটা মেয়ে। তুই আমাকেও অমন চোখে দেখবি রে ভাই...

এটুকু বলতেই সুগতর চোখ ভারী। মুহূর্তে জল টলমল করে। ব্যথা বা অভিমানে নয় বরং আতঙ্ক পিছু ছাড়ে না। বিভাজন করতে পারে না, সেটা আইনের কাঠামো না, প্রশাসনের কোনো শাখার দাপট?

ঘরের আলো হঠাৎ সামান্য চোখ ঝামটা মেরে আচমকা থির। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কোনো সাময়িক ফল্ট। গোটা ঘরের চৌদিকে তাকিয়ে থিতু হতেই চন্দনার মনে হল, সুগত রে তোদের মতো কত ছেলেও যে কত মেয়েদের মিথ্যে দ্বারা প্রলুব্ধ করে..., কিন্তু যুক্তিটা সাজাতে গিয়ে চন্দনার বলতে আর ভালো লাগে না...! সত্যি তো সুগত কি এক্ষেত্রে মেয়েটিকে... মেয়েটির পরিবারকে বোকা...বরং মেয়েপক্ষ সুগতদের প্রতি যেন কোথায়... অসততা বা...., ওঘরে টিভির পাশে মোবাইলটায় রিং হয়। তাড়াতাড়ি ফোনটার সবুজ বাটনে টেপে, হ্যালো? উঁ? অফিস থেকে বেরিয়েছ?

হাসিমুখে চন্দনা বলে, তোরা ওদের আত্মীয়জনদের কাছে একটা আলোচনার ব্যাপারে ঢুকিসনি?

—বাবা মা একদিন প্রসঙ্গক্রমে কথাটা ওদের মামা মামির সামনে তুলেছিল, এক সন্তানের পরিবারে এটা আপনারা কী করলেন?

সামান্য বিতর্ক হতেই মেয়ের ভাই মামি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আপনারা মেডিক্যাল পরীক্ষা করে নেননি কেন?

BanglaBook.org

বাম হাতের দিশায় বাবা মাকে দেখায় সুগত, এরা বলেছিল আপনারা মা মাসি নাতিপুতির দিদা ঠাকুমারা বিয়ের আলোচনায় কথা দিলেন কেন...মেয়ে ঠিক থাকবে। অসুবিধা নেই।

—তারপর?

বাবা সংযোজন করে, বুঝলে চন্দনা। ওরা আমাকে আর তোমার পিসিকে ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি থেকে বের করে দিয়েছে...

পাশেই নিজের জয়ন্ত। তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চন্দনা বিড়বিড় করে, এর জীবনে এমন কিছু ঘটবে না তো...!

## তিন

রাত গভীর হয়। ওপাশে ছেলে ঘুমিয়ে কাদা। চন্দনা স্বামীর পিঠে হাত দিয়ে কাছে টানে। দুজনের শ্বাসবায়ু মুখের ত্বকে, অ্যাই একটা কথা বলবো?

যুধাজিৎ সায় দেয়, হুঁ। না বলার কী আছে?

চন্দনা কলেজ পাশকরা হলেও চাকরিবাকরিহীন মেয়ে। ঢোক গিলে গলাটা সরল করে নেয় চন্দনা রোজগেরে স্বামীর সামনে, মেমপিসি পিসেমশায়রা কদিন এখানে থাকতে চাইছে...তোমার আশ্রয়ে। তুমি ডি এম ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে কাজ করো।

—তাতে কী হয়েছে?

—তোমার কাছাকাছি থেকে ওরা একটু মনে জোর পায়।

মচকে যায় ঘাড়ের হাড়। যুধাজিৎ ধীরে ধীরে উঠে বসে বিছানায়। দেওয়ালের নাইট বাল্বের মৃদু সবুজ আভা মশারির গায়ে। উঠে বসে চন্দনা, শোবে না?

—উঁ?

—ঘুমোবে না?

—ঘুমোতে দিচ্ছো কোথায়? আমি তো একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারী। হলেই বা ডি এম কালেক্টর আমার অফিসার! তাবলে আমার ঘরে ক'জন ক্রিমিন্যাল ঠাঁই নেবে? আমার চাকরি থাকবে? তোমরা ভাত পাবে?

—দ্যাখো সুগতর কথাবার্তায় আমার মনে হচ্ছে ওদের দোষ নেই। বেচারারা...

BanglaBook.org

—তুমি কি এস পি? না, ডিসট্রিক্ট জাজ? কে সত্যি বলছে বা মিথ্যে বলছে, বিচার করে ফেললে?

চন্দনার মুখ এই আবছা সবুজে মশারির ভিতর আরো কালো।

## চার

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন চত্বর পেরোতেই রিকশার লাইন। খোয়া পিচের ঢালাইয়ে মসৃণ রাস্তা। একটা বড়ো গাছের শাখা প্রশাখায় বেশ ছায়াময়। দু-একটা পান সিগারেট দোকানের পাশে লাড্ডু বরফি। চিনির রসে ডুবানো মচমচে খাজা কাঠের বারকোশে ত্রিভুজ আকারে চুড়ো করে সাজানো। একসঙ্গে তিন জন প্যাসেঞ্জার। দুজন রিকশাওয়ালা বলে, কাঁহা জায়গি?

—আরে ভাইয়া, হোটেল, 'হোটেল লহরী' চেনো?

—সব চিনি। ওর মালিক পাণ্ডাবাবু ছিল, এখন এক বাঙালিবাবু নিছেন।

তিন যাত্রী অত অতীত না-জানলেও এটা সাব্যস্ত করে, বাঙালি ম্যানেজার আছে। তার ঘর কালীমূর্তির ক্যালেন্ডারে ছয়লাপ। এটুকু পুঁজি করে বলে, ঠিক আছে। ভাড়া কত?

—পার রিশকা পঁচিশ টংকা।

মা বিনতা সুগতর পাশে। পিছনের রিকশায় শ্রীকেশ মণ্ডল। দু-হাতে হ্যান্ডেল ধরে বেশ জোরে প্যাডেলে পা চালায় মধ্যবয়েসি চালক। তার কালো চেহারায় রোদের প্রলেপ। হাতকাটা লাল গেঞ্জিতে ঘাড় দাবনায় ঘাম। ঘামে সে রোদ নোনতা হয়ে সাদা আস্তর ফুটেছে।

খানিক পথ উজিয়ে রিকশা অনেকটা এগিয়েছে। চালককে বলে, তুমি এদেশের মানুষ এত ভালো বাংলা বলো কি করে?

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে একবার দেখে নেয়, আমার ঘর...মোকাম তো পশ্চিম মেদনীপুর।

সুগতর কানে যেতেই বুক কেঁপে মনে হয়েছিল, ও...ওই চালক জঙ্গলমহলের মানুষ...! মাওবাদী এলাকার লোক! ও কি কেন্দ্রীয়বাহিনীর তল্লাশিতে কিছু ধরাপড়ার আতঙ্কে এখানে পালিয়ে এসেছে নাকি? তাই রিকশা চালিয়ে রোজগার পাতি করছে? চালকের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবনায় এলেও উচ্চারণ করতে তো বাধে। মুছে ফেললেও, মোছে কই?

BanglaBook.org

নিজের হৃৎপিণ্ডে আর এক দপদপানি। পাশ দিয়ে চকোলেট রঙের প্রাইভেট বেরিয়ে গেলে নিজের মুখটা হাত আড়াল করে চকিতে গাড়ির ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে নেয়, কোনো পুলিশ টুলিশ আর আইডেনটিফাই করার জন্যে মেয়েবাড়ির কেউ, আছে কি না?

দুপুর ডিঙোনো সূর্য। এখন ভীষণ লাল হয়ে মাঝসমুদ্রে। সুগত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এদিকটায় মালিকের হাতে পোতা নারকেল গাছের চেরা চেরা পাতার ডগা খানিক ঝুলে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ে ভেজা হাওয়া তপ্ত বালিচর বেয়ে তে-তলার বারান্দায় দমকা মারে। দমকা মারে সুগতর বুকের ভিতর, কেন...কি জন্যেই বা এখানে এলাম আমরা...?

মা বলে, নে সুগত অল্প করে চান সেরে যাহোক কিছু খা।

সুগত তখনো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্রের চিকমিকি ঢেউয়ে চোখ থাকলেও সমুদ্র তো তার সামনে নেই।

মা আবার বলে, বেলা পড়লে ওদিকটায় বেরুবো।

শ্রীকেশ হাঁকপাকিয়ে ওঠে, উঁহু...সন্ধে পড়ুক তারপরে...।

'লহরী'র ঘর কাঁপিয়ে মোবাইলে রিং টোন। বাটন টিপতেই ওপার থেকে ভাসে, হ্যালো শ্রীকেশবাবু আমি রক্ষিত বলছি, মুহুরি পাঠিয়ে এফ আই আর দেখেছি, তোমরা নাকি মেয়েকে প্রায়ই খুব মারধোর করতে? তার বাপের বাড়ি থেকে লাখ লাখ টাকা আনতে চাপ দিতে? মানসিক...মেন্টাল টর্চার করতে? পেট ভরে খেতে দিতে না? আরো অনেক কমপ্লেন করেছে মেয়েপক্ষ...

—মেয়েপক্ষ নয়, সরস্বতীর আঁচড়-জানা উকিলদের মুসাবিদা। একবারও লেখেনি ইন্টারমিটেন্ট লুন্যাসি...ওই মাঝে তুমুল পাগলামি? সব...সব মিথ্যে...মিথ্যা ওই এফ আই আর-এ। কিন্তু এসব থেকে রেহাই... মুক্তির পথ কি? আইনে কী ব্যবস্থা?

—দেখছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...

হলি ডে হোমের যাবতীয় আয়োজনে তো এই 'লহরী'। মা বাসনকোশন আনব্রেকেবল কাপ প্লেট গুছোতে ব্যস্ত। শ্রীকেশ সুগত বারান্দা দিয়ে দূর আকাশ দেখে...।

BanglaBook.org

দরজায় খটখট শব্দ। শ্রীকেশ সুগত চমকে ওঠে! বিনতা হাতের প্লেট হাতে নিয়েই হুটপাট বারান্দায়।

সুগতর গা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে শ্রীকেশের দিকে চোখ, কি গো এবার... সত্যি কি মেয়েপক্ষ পুলিশ নিয়ে এল নাকি...!

তিনমানুষের বুক ধড়ফড়িয়ে মুখ লাল। সুগত উঠে বারান্দার পাঁচিল থেকে নিচের ভূমিতল দেখে। মা বিনতা ছেলের হাত টেনে ধরে, কী দেখছিস? এদিকে আয়।

আবার খট খট আওয়াজ। সুগত ব্যাগ থেকে স্লিপ...কোর্টের ইনফরমেশান স্লিপটা বের করে..., ভাবে..., এতদূরেও...!

শ্রীকেশ পায়ে পায়ে এগিয়ে দরজা খোলে। চোখের সামনে আচমকা বিস্ফোরক লালাধার পথ আটকে! ছোকরাটা ছোটো সিলিন্ডার ঝুলন-কাঁটা হাতে নিয়ে একদম সামনে। সে শুরু করে, নিচে ম্যানেজারবাবু পাঠাইলো, রান্নার গ্যাস লিবেন?

মা সামলে নিয়ে বলে, হুঁ।

সঙ্গে সঙ্গে ছোকরাটি হাতের ওয়েট মেশিনটাকে কাঁটায় ঝুলিয়ে দেখায়, কত হল! চার কেজি ছ'শ।

মায়ের মুখ লালচে কেটে ফর্সা, গ্যাস কেজি কত?

—আশ্‌শী টংকা।

সন্ধে কাটিয়ে রাত আটটা। পিছনে বালির উপর দিনের ছাতা এখনো খাটানো দোকানটায়। দোকান থেকে চা ডিম ভাজার সুবাস। দোকানদারের পাতা চেয়ারগুলোয় পাশাপাশি নারীপুরুষ বসে সমুদ্র দেখে। কেউ কাগজের কাপে চায়ে চুমুক দিয়ে সমুদ্র চাখে। যুবক যুবতীরা গায়ে গায়ে রাত মাখে। কোনো যুবক, যুবতীর দু-হাঁটু উরু নরম কোলে মিহি তটে এখনো উষুম রোদ পায় গালের ত্বকে। এমন রাতের আকাশে যুবকের কোলে মাথা রেখে আকাশ দেখে। তার পাঞ্জাবির উঁচু দু-বুকে রাতের মেঘ নেমেছে।

ঢেউ কাটিয়ে হাওয়ায় তো চাপা সাঁ সাঁ শব্দ। বালি পাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগোয়। হাওয়ায় জলের কুচি। চরে নোনা ঢেউ ভেঙে গাঢ় ফেনা। ফেনায় চিকমিকিয়ে ফসফরাস সমুদ্র বুকের মণিমুক্তো হয়ে জ্বলে।

BanglaBook.org

মেটাল্ড রাস্তা প্রান্তে উঁচু খুঁটির ডগায় ফ্লুরোসেন্ট আলো ক্ষীণ। শ্রীকেশ বলে, খোকা যতটা পারিস সমুদ্র ঘেঁষে চল। ওপরের দিকে অনেকরকম মানুষের ভিড়।

মা বলে, হলেই বা? না রে সুগত শুকনো বালির উপর দিয়ে ভালোভাবে হাঁট।

—উঁহুঁ..., বিনতার মুখে আঙুল চাপা দেয়...একদম না, বলেই সুগতর হাতটা টানে।

দুই মানুষ দাঁড়িয়ে শ্রীকেশের সামনে বালির ঢিবি। তাদের রুদ্ধগলায় আকুলতা, কেন...

সমুদ্রের চাপা স্বরের থেকেও আস্তে ফিসফিসোয়, ...ও নামে ডাকছ...? মেয়েপক্ষের বাড়ির কেউ..., কেউ যদি বেড়াতে এসে থাকে...

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# ইসাবেলা

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

"একটা জায়গায় দেখে যাবেন সাহেব? বহুত বড়িয়া তসবির তোলার আইটেম পাবেন।"

কথাটা বলল আমাদের ভাড়া-গাড়ির রাজস্থানী ড্রাইভার ভাঁয়রো প্রসাদ। আমরা চলেছি যোধপুর থেকে জয়সলমীর। ধু-ধু হলদে মরুভূমির মধ্যে বুক চিরে কালো পিচের রাস্তা। এই রাস্তাতেই বহুকাল আগে লালমোহন গাঙ্গুলি ফেলুদার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, উঠরা কাঁটা বেছে খায় কী না?'

আমাদের এই যাত্রার মধ্যেও অবশ্য লালমোহন গাঙ্গুলি আছেন। আমরা বলতে আমি আর অশোক। অশোক অকৃতদার। কিছুটা বোহেমিয়ান। অল্পবিস্তর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। সব মিলিয়ে খানিকটা খামখেয়ালি বলা চলে। আমাদের মতো ফ্যামিলিম্যানদের সঙ্গে বউ বাচ্চার হ্যাপা সামলিয়ে বেড়াতে যাওয়া ওর ঠিক পোষায় না। ওর জীবনে একটাই শখ। ফটোগ্রাফির। জীবনের উপার্জনের একটা বড় অংশই ঢালে ক্যামেরা, লেন্স আর সেসব নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি তোলার পেছনে। ওই কোনো একটা নির্দিষ্ট ট্যুরিস্ট স্পটে গিয়ে 'ফাইভ পয়েন্টস', 'সেভেন পয়েন্টস' দেখে জীবন সার্থক করায় ও নেই।

এবারই যেমন। খেয়াল চেপেছে সোনার কেল্লার জার্নিটার ওপর একটা নিজস্ব অ্যালবাম করবে। সেই কোন্ কালে, তখন বোধ হয় ক্লাস টু বা থ্রি-তে পড়তাম, সোনার কেল্লা দু'জনে পাশাপাশি বসে দেখেছিলাম। কোন্ সিনেমা হল্ তা আর মনে নেই। তবে স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এইটুকু মনে আছে। একদিন আমাদের ড্রয়িং রুমে সেই স্মৃতিচারণা করতে করতেই অশোকের মাথায় খেয়ালটা চেপেছিল। ফেলুদার পঞ্চাশ বছর হল এবার, আমাদেরও। ব্যাপারটাকে উদ্‌যাপন করতে দু'বন্ধু মিলে সোনার কেল্লার রাস্তায় একটা ফটো সিরিজ করার, ডাউন দ্য গোল্ডেন মেমোরি লেন। আমার গিন্নি পর্ণাকে পর্যন্ত রাজি করিয়ে ফেলল, এই গোল্ডেন মেমোরি লেন জার্নির ফটো ফিচারটা করতে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে। মাত্র তিন রাত্রির ব্যাপার। প্রথম দিন কলকাতা থেকে ফ্লাইটে যোধপুর যাওয়া। পরের দিন যোধপুর থেকে গাড়িতে জয়সলমীর। রাত্রিটা জয়সলমীরে থেকে তার পরেরদিন সোনার কেল্লা দেখে, তৃতীয় দিন আবার যোধপুর হয়ে কলকাতায় ফেরত।

BanglaBook.org

পর্ণা মাঝে মাঝে আমাকে স্পেস দিতে চায়। তাই আপত্তি করেনি, আর আমার পুত্র ক্লাস এইটে উঠেও এতদিনে ফেলুদার রসাস্বাদন করেনি। ফলে সোনার কেল্লা নিয়ে তার বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই বলে লেজুড় হওয়ার বায়না ধরেনি।

আমরা যোধপুর থেকে ব্রেকফাস্ট করে সকাল সকাল বেরিয়েছি। যোধপুর থেকে জয়সলমীরের দূরত্ব ৩০০ কিলোমিটার মতো। ভাঁয়রো প্রসাদ বলেছিল পৌঁছতে ঘণ্টা ছ'য়েক সময় লাগবে। অফিসের কাজে বহুবার জয়পুরে এলেও, রাজস্থানে আর কোথাও আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এমনিতেও বেড়াতে বেরোলে আমি ছেলেকে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট বন্ধুদের গ্রুপের সঙ্গে বেরোই। তাতে ভারতবর্ষের অনেক জায়গা ঘোরা হয়ে গেলেও রাজস্থানটা এখনো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যোধপুর ছাড়িয়ে ধু-ধু হলদে মরুভূমির মধ্যে বুক চিরে কালো পিচের একঘেয়ে রাস্তায় এই বয়সে আমি আর ততটা অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে পাচ্ছি না, যতটা অশোক পাচ্ছে। তবে এরকম রাস্তায় হাই স্পীডে চলন্ত গাড়ির এসির কুলকুলে ঠাণ্ডায় বসে দিব্যি রিল্যাক্সড লাগছে। বাধ সাধছে শুধু অশোক। থেকে থেকে গাড়ি থামিয়ে ছবি তুলছে। এই ছবি তোলা শুরু হয়েছে যোধপুর সার্কিট হাউস থেকে। অশোক ওর প্রখর কল্পনায় খুঁজে নিচ্ছে কোথায় মন্দার বোস কাচের বোতলের টুকরো ছড়িয়ে ফেলুদার যাত্রা পণ্ড করতে চেয়েছিল। কোথায় লালমোহনবাবুর মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, উটরা কি কাঁটা বেছে খায়? তারপর এল রামদেওড়ার কাছে মরুভূমির মধ্যে রেললাইন। অশোক প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ভাঁয়রো প্রসাদকে গাড়ি থামাতে বলল। আমিও গা হাত পা ছাড়াতে গাড়ি থেকে নামতেই ভাঁয়রো প্রসাদ বলল, "একটা জায়গা দেখে যাবেন সাহেব? বহুত বড়িয়া তসবির তোলার আইটেম পাবেন।"

আসলে ভাঁয়রো প্রসাদ এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে, ফটোগ্রাফির আগ্রহটা আমার একেবারেই নেই। লোকটা রাজস্থানী হলেও ভাঙা ভাঙা বাংলা বুঝতে পারে। তাই গাড়ির মধ্যে আমাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছে, আমাদের দু'বন্ধুর রুচি কীরকম। যেমন পোখরানে। আমার কাছে পোখরান একটা খুব গর্বের জায়গা। কারণ ভারতবর্ষের সব পারমাণবিক বিস্ফোরণগুলো এখানে ঘটিয়েই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ

BanglaBook.org

পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে সমীহ আদায় করে নিয়েছে। পোখরানের একটা জায়গায় বেশ অভিজাত একটা চা খাওয়ার জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। পোখরান জায়গাটায় খানিকক্ষণ থাকার উদ্দেশে আমি একটু জোর করেই সেই চায়ের দোকানটাতে কিছুক্ষণ বসেছিলাম আর সেখানেই ঘটেছিল প্রথম বলার মতো ঘটনাটা। প্রথম দেখেছিলাম ইসাবেলাকে।

অবশ্য ইসাবেলা যাকে বলছি, সেই মেয়েটার আসল নাম কী জানি না। কারণ মেয়েটার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ই হয়নি। ওই যাদের আমরা বলি, একেবারে সিনেমার হিরোইনদের মতো দেখতে, মেয়েটা একেবারে সেরকম দেখতে। কাটকাটা ধারালো চোখমুখ, নির্মেদ শরীর। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকার মতো ফিগার। অশোক নিচু গলায় আমার কানের কাছে আক্ষেপ করেছিল, "ইস্! যদি কয়েকটা ছবি নেওয়া যেত। বিচ্ছিরি রকমের ফোটোজিনিক।"

অশোকের এই বিচ্ছিরি রকমের বিশেষণটা আসলে ফাটাফাটির অশোকীয় সংস্করণ। আমি চাপা গলায় পেছনে লাগতে শুরু করেছিলাম, "যেই একটা ঝক্কাস সুন্দরী মেয়ে দেখলি লেন্সের ফোকাসটা গেল তো ঘুরে। সোনার কেল্লায় কিন্তু একটাও নারীচরিত্র ছিল না।"

অশোক ওর ক্যামেরা আর ঢাউস লেন্সটা নিয়ে উশখুশ করছিল, যদি একটা ছবি তোলা যায়। আমি আমার মোবাইলটা দিয়ে দূর থেকে মেয়েটাকে তাক করে দ্রুত একটা ছবি তুলে নিয়ে অশোকের পেছনে পড়লাম, 'দ্যাখ, তোর ওই লাখ টাকার ক্যামেরা কোনো কাজের নয়।' এরপর দুই বন্ধু টিন এজারের খেলায় মেতে উঠলাম মেয়েটার নানান কাল্পনিক নাম দিতে। নানান নামের মাঝে শেষ পর্যন্ত একটা নামে এসে থিতু হয়েছিলাম, ইসাবেলা।

কিন্তু এই ইসাবেলা চরিত্রটিই যে এবারের ডাউন দ্য গোল্ডেন মেমোরি লেন থেকে ডাউন দ্য টেরিবল হরর লেন হয়ে ওঠার প্রথম উপাদান হয়ে উঠবে, জানতাম না। যাক, আবার ফিরে যাই, রামদেওড়ায়।

—"কোন্ জায়গা?" ভাঁয়রো প্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম।

একটা গ্রামের নাম বলল ভাঁয়রো প্রসাদ। উচ্চারণটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, "কী আছে ওখানে দেখার?"

BanglaBook.org

"অনেকরকম গুড়িয়া সাহেব।"

গুড়িয়া মানে পুতুল। আবার গুড়িয়া মানে এক অর্থে মেয়েদেরও ইঙ্গিত করা হয়। ভাঁয়রো প্রসাদ ইতিমধ্যেই শুনে ফেলেছে পোখরানে সেই সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে আমাদের আলোচনা। এইসব ড্রাইভাররা খুব বুদ্ধিমান হয়। আমারও ইচ্ছে হল, অশোকের মতো একটু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হতে। ভাঁয়রো প্রসাদকে বললাম, "ঠিক আছে চলো।" অশোক ফিরে আসতে বিশেষ কিছু না ভেঙে বললাম, "এবার আমার একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা দেখবি চল।"

কিছুক্ষণের জন্য মিশন সোনার কেল্লা একটু লক্ষ্যচ্যুত হল। জয়সলমীর যাওয়ার মসৃণ রাস্তা ছেড়ে এবড়ো খেবড়ো একটা রাস্তা ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাঁয়রো প্রসাদ আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করাল একটা জায়গায়। এই জায়গাটাও ওই ধু-ধু মরুভূমি। তার মধ্যে বেশ কিছুটা দূরে একটা গ্রাম। বাড়িগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ দরিদ্র গ্রামটা। বড় রাস্তা ছেড়ে গ্রামটায় পৌঁছনোর মতো কোনো গাড়ি চলার রাস্তা নেই। তবে ভাঁয়রো প্রসাদ যে জায়গাটায় এসে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করাল, সেটা বেশ একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা। সেখানে রাস্তার এক ধারে দুটো বড় বড় গাছ। সেখান থেকে লাল সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য পুতুল। পুতুলগুলো সব কাপড়ের পুতুল। বলা বাহুল্য, পোশাকগুলো সব রাজস্থানী।

অশোক তো দৃশ্যটা দেখে মহাখুশি। একেবারে ফটোগ্রাফার প্যারাডাইস। ওর চোখটা মুহূর্তে চকচক করে উঠল। বিড়বিড় করে মুগ্ধ গলায় বলে উঠল, 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!' বিষয়বস্তু হিসেবে ও তো এরকমই সব ব্যাপার চায়। গাছ থেকে ঝুলতে থাকা একেকটা পুতুল ওর একেকটা সাবজেক্ট। লম্বা লম্বা লেন্স পালটে পালটে পটাপট পটাপট ছবি তুলতে আরম্ভ করে দিল।

জায়গাটা সুনসান। ট্যুরিস্ট তো দুরস্ত, কোনো গ্রামবাসী পর্যন্ত নেই। অশোক ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছিল। আমি গাড়ির বনেটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। সিগারেটটা অর্ধেক শেষ হয়েছে, এমন সময় আমার সামনে ধপ্ করে গাছ থেকে খসে পড়ল একটা পুতুল। পুতুলটা মাটি থেকে তুলে নিলাম। মেয়ে পুতুল। পুতুলটা তৈরির মধ্যে সূক্ষ্মতার অভাব থাকলেও চমৎকার স্থানীয় লোকসংস্কৃতির ব্যাপার ছিল। পর্ণার নানানরকম পুতুলের কালেকশন আছে। বিনা পয়সায় অযাচিতভাবে ওর জন্য একটা পুতুল পেয়ে

BanglaBook.org

মনটা খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু আমার হাতে পুতুলটা দেখে ছুটে এল ভাঁয়রো প্রসাদ। প্রবল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "সাহেব, ফেক দিজিয়ে, ফেক দিজিয়ে।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"যার মানত করা আছে, সেই মানতের শাপ আপনার মধ্যে লেগে যাবে।"

—"কীরকম?"

—"মনে করুন কারুর খুব কঠিন রোগ হয়েছে, সে ভাল হয়ে ওঠার জন্য তার বাড়ির লোক মানত করেছে। এই পুতুল আপনি ধরলে তার রোগটা আপনার হয়ে যাবে আর সে ভাল হয়ে উঠবে..."

বিজ্ঞানমনস্ক আমি। এইসব কুসংস্কারের তোয়াক্কা করি না বলে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও আছে। ভাঁয়রো প্রসাদের সতর্কবাণীকে পাত্তা দিলাম না। অশোকও গাড়িতে ফিরে এসে পুতুলটা দেখে আর ভাঁয়রো প্রসাদের কথা শুনে খুব হাসল। পুতুলটাকে সাইড ব্যাগে পুরে নিলাম। ভাঁয়রো প্রসাদ বাকিটা রাস্তা ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকল। আমরা আবার ফিরে এলাম সোনার কেল্লা যাওয়ার জয়সলমীরের রাস্তায়। কিন্তু এই গাছ থেকে খসে পড়া পুতুলটাই যে এবারের ডাউন দ্য গোল্ডেন মেমোরি লেন থেকে ডাউন দ্য টেরিবল হরর লেনের দ্বিতীয় উপাদান হয়ে উঠবে, জানতাম না।

'সোনার কেল্লা!'

জানলার পর্দাটা সরিয়ে অশোক কথাটা এমন একটা উদাত্ত আবেগমথিত গলায় বলল যেন সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরার সামনে ডায়ালগ বলছে। অশোক পর্দা সরিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে দূরে সোনার কেল্লার দিকে। সকালের নরম ঝলমলে রোদ জুরাসিক স্যান্ডস্টোন অর্থাৎ হলদে রঙের বেলেপাথরের গায়ে ঠিকরে সত্যিই যেন সোনা ঝরাচ্ছে। যদিও সোনার কেল্লার প্রথম দর্শন আমার হয়ে গিয়েছে গতকাল রাত্রেই। সেটা অবশ্য দূর থেকে শুধু কেল্লার লম্বা প্রাচীরটা দেখা। যোধপুর থেকে ব্রেকফাস্ট করে সকাল সকাল বেরিয়েও জয়সলমীর পৌঁছতে পৌঁছতে সেই রাত্রিই হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ভারতে সূর্যাস্ত আমাদের অভ্যস্ত সময়ের চেয়ে একটু

BanglaBook.org

দেরিতেই হয়। তবুও জয়সলমীর যখন পৌঁছিয়েছিলাম ততক্ষণে রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছিল। তারমধ্যেই ভাঁয়রো প্রসাদ চিনিয়ে দিয়েছিল জয়সলমীর দুর্গটা। তখন সোনার কেল্লার প্রাচীর চুঁইয়ে জায়গায় জায়গায় নিয়নের আলো ছড়িয়ে ছিল।

অশোককে জিজ্ঞেস করলাম, "কখন বেরোবি?"

—"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্রেকফাস্ট করেই।"

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে আমি জয়সলমীরের সোনার কেল্লা সম্পর্কে অন্তত তিনটে জিনিস শুনেছি। এক, সোনার কেল্লার ভেতরটায় একেবারে হাতিবাগান বাজারের মতো ভিড়। দুই, ওখানের যে কোনো গাইড মুকুলের বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। আর তিন, ভেতরে জুনা মহলের জাফরির কাজটা অবশ্য দ্রষ্টব্য। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করতে ভারত সরকার যে সব বিজ্ঞাপন করে তার মধ্যে একটা পোস্টার জুনা মহলের থাকে। অশোক কাল রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপে সোনার কেল্লা সিনেমাটার জয়সলমীরের অংশটা বেশ মন দিয়ে দেখে বেশ কিছু নোটস তৈরি করেছে। গিরিধারীর বাড়ি, রতনের বাড়ি, হোলি খেলার জায়গা—সব জায়গাগুলো খুঁজে বার করে ছবি তুলবে।

হোটেল থেকে মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছিয়ে গেলাম সোনার কেল্লায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শোনা বর্ণনা দাঁড়ি কমা সুদ্ধু মিলে গেল। ভেতরে থিকথিকে ভিড়, শ'য়ে শ'য়ে দোকান। গাইড আমাদের বাঙালি বুঝেই কিছু বলার আগেই জানিয়ে দিল সোনার কেল্লার মুকুলের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গাটাও দেখা হয়ে গেল, মুকুলের বাড়ি। একটু ভাঙাচোরা জায়গাটা। জায়গাটার প্রচুর ছবি তুলে শেষ হল অশোকের মিশন। কিন্তু আমাদের আসল গল্পটার এখনো অনেকটা বাকি।

মুকুলের বাড়ি দেখার পর আমরা সোনার কেল্লার বাকি অংশ ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। বুরুজ, কামান, অক্ষয় পোল, সুরজ পোল, যে সব জায়গা থেকে মৃত্যুকূপে ছুঁড়ে ফেলা হত দণ্ডিতদের, ঘুরে ঘুরে সেরকম দেখার অনেক জায়গা। কেল্লার ভেতরটা এতই বড় যে একেকটা জায়গায় যাওয়ার জন্য ভেতরে অটো চলে। অটো করে আমরা পৌঁছিয়ে গেলাম জুনা মহলের কাছে। অপূর্ব কারুকাজ সেখানে। জুনা মহলের আশেপাশে অনেক ছোট ছোট

BanglaBook.org

স্যুভেনুর কেনার দোকান। তার একটাতে ঢুকে আমি বাড়ির জন্য 'সোনার পাথরবাটি' দরাদরি করছিলাম আর অশোক যথারীতি বাইরে ছবি তুলছিল, এমন সময় অশোক দোকানে ঢুকে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'ইসাবেলা'!

—"কোথায়?"

অশোক আমাকে দোকানের বাইরে নিয়ে এসে জুনা মহলের একটা জাফরির জানলার দিকে দেখাল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। হাজার হাজার ট্যুরিস্টের ভিড়ে যাকে আমরা ইসাবেলা নাম দিয়েছি, সে থাকতেই পারে, অশোক যখন দেখেছিল তখন হয়তো জানলাটায় দাঁড়িয়েছিল, এখন আর নেই।

অশোক বলল, "অ্যাট লাস্ট ধরতে পেরেছি।"

—"কী?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"লেন্সে!"

ওইখানেই অশোকের ক্যামেরার এলসিডি স্ক্রিনে ভাল করে দেখলাম ইসাবেলাকে। না, কোনো সন্দেহ নেই, ইসাবেলাই। ইসাবেলাকে ধরা আছে আমার মোবাইলের ক্যামেরাতেও। আমার মোবাইলে তোলা ছবিটা জুম করে অশোকের দামি ক্যামেরায় তোলা ছবির সঙ্গে মেলালাম। থুতনির নিচে তিনটে তিল সমেত মুখের গড়ন—দুটো মুখ একেবারে এক। তফাত শুধু একটা জায়গাতেই। কাল ইসাবেলা ছিল ওয়েস্টার্ন ড্রেসে, আর আজ রাজস্থানীয় পোশাকে। অশোককে বললাম, "চোখ আছে তোর। এই পোশাকে কিন্তু আমি দেখলে চট করে চিনতে পারতাম না।"

অশোক একেবারে ফেলুদার স্টাইলে বলল, "একটা খটকা লাগছে রে। কিছুতেই ধরতে পারছি না।" তারপর অল্প ছটফট করে উঠে বলল, "তোর ব্যাগের পুতুলটা বার কর তো?"

পুতুলটার থুতনিতেও তিনটে তিল আর পোশাকটা অবিকল অশোকের ক্যামেরায় তোলা ইসাবেলার ছবির মতো। কাকতালীয়? ইসাবেলার ডাউন দ্য টেরিবল হরর লেনের গল্প যে এখনো বাকি আছে।

লাঞ্চের আগেই হোটেলে ফিরে এলাম। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে আরো নয়নাভিরাম মরুভূমি সাম ডিউনসে নিয়ে যাবে বলেছে ভাঁয়রো

BanglaBook.org

প্রসাদ। ওখানে ডেজার্ট সাফারি করে সূর্যাস্ত দেখে ডিনার করে ফিরব। ভাঁয়রো প্রসাদ কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে একটা প্যাকেজের ব্যবস্থা করেছে। তার বাড়িতে রাজস্থানী লোকসংস্কৃতির গান বাজনা শুনতে শুনতে ডিনার করা যাবে।

সাম ডিউনস আমাদের হোটেল থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। একটু বেলাবেলিই রওনা দিলাম যাতে সূর্যাস্তের সময় মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মধ্যে সূর্যাস্তটা দেখতে পারি। যে প্যাকেজের ব্যবস্থা ভাঁয়রো প্রসাদ করেছিল, তারই প্রথমে উটের পিঠে চাপিয়ে মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গেল। সূর্যটা তখন পশ্চিমে হেলে পড়ছে। চারদিকে অপূর্ব বালির ঢেউ। সূর্যটা যখন মরুভূমির দিগন্তে আমার হঠাৎ মনে হল, ইসাবেলা যেন আশেপাশেই কোথাও আছে। ওর সঙ্গে দেখা হবেই। ঝুপ করে সূর্যটা ডুবে গেল। চারদিকে চোখ বোলালাম। অসংখ্য পর্যটক। অসংখ্য উট। অশোক এক মনে একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে। কিন্তু ইসাবেলা কোথাও নেই।

সূর্যটা ডুবে যেতেই ঝুপ ঝুপ করে সন্ধে গাঢ় হতে লাগল। আমরা সেই বাড়িটায় ফিরে এলাম। বাড়ির ভেতরে একটা উঠোন। চারদিকে ঘর। উঠোনটা বেশ বড়। ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসার জায়গা। একদিকে একটা বড় তক্তপোশ। সেখানে লোকসঙ্গীতের একটা দল বসে আছে। তার সামনের জায়গাটায় নাচের ব্যবস্থা। একটু পরেই রাজস্থানী নাচ গান আরম্ভ হল। আমাদের বিয়ার আর নিরামিশ ভাজাভুজি দেওয়া হল। একে একে জায়গাটা ভরে উঠল। দারুণ লাগছিল খাওয়াদাওয়া মৌতাত করতে করতে নাচ দেখতে। মাথার ওপর এক সার কলসি নিয়ে নাচ, জ্বলন্ত কয়লার ওপর নাচ, অদ্ভুত সব স্কিল। রাত বাড়তে থাকল। লোকসংস্কৃতি ক্রমশ ব্যবসায়িক হচ্ছে। আমাদের মধ্যে নেশাটাও একটু গাঢ় হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর ডিনার দেওয়া হবে। তার মধ্যেই আমরা জড়িয়ে পড়লাম এক ঝামেলায়।

যে মেয়েগুলো নাচছিল তারা একটু পরে আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের ডাকছিল ওদের সঙ্গে নাচার জন্য। একেবারে ভরপুর ব্যবসায়িক বিনোদন। একজন দু'জন করে নাচতে আরম্ভ করল আর তার মধ্যেই আমরা আরেকবার ইসাবেলাকে আবিষ্কার করলাম। অশোক আমার হাতের আস্তিনটা চেপে ধরল। এবং তার কিছুক্ষণ পরেই ঝামেলাটা বাঁধল। গোটা চারেক চুর মাতাল

BanglaBook.org

ছেলে উঠে গিয়ে ইসাবেলাকে ঘিরে নাচতে আরম্ভ করল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ইসাবেলা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু ছেলেগুলো কিছুতেই ইসাবেলাকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না।

এসব ঝামেলা সাধারণত আয়োজকরাই সামলিয়ে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখলাম ওরা ফিরেও তাকাচ্ছে না। ইসাবেলার সঙ্গে আমাদের কী-ই বা সম্পর্ক? একটা কল্পনা। কিন্তু তার মধ্যেই উঠে গেল অশোক। বিশ্রী অকথ্য গালিগালাজ, অল্প ধস্তাধস্তি হল। ইসাবেলা এক ফাঁকে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়িটার ভেতর থেকে। এরপর ডিনার খাওয়ার আর কোনো ইচ্ছেই ছিল না। আমরাও বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বেরিয়ে দেখি আরেক বিপত্তি। আমাদের ড্রাইভার ভাঁয়রো প্রসাদও মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে আছে।

অশোক তেতে ছিল। ভাঁয়রো প্রসাদের কাছে গাড়ির চাবিটা কেড়ে নিয়ে ওকে একরকম ঠেলে ঢুকিয়ে দিল পেছনের সিটে। অশোক গাড়িতে স্টার্ট দিল, পাশের সিটে আমি। এমন সময় সাইড মিররে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। সেই ছেলেগুলো। একজনের হাতে একটা ঝাঁঝারি তরোয়াল, আরেকজনের হাতে খোলা বন্দুক। অশোকও ততক্ষণে লুকিং মিরর দিয়ে ওদের দেখে ফেলেছে। ছেলেগুলো দৌড়ে আমাদের গাড়ির কাছে এসে পৌঁছনোর আগেই অশোক স্পীড তুলে ফেলেছে। আয়নায় দেখলাম ছেলেগুলো উলটোদিকে দৌড়ে নিজেদের গাড়ির দিকে ছুটছে। আর তখনই আমাদের গাড়িটায় আচমকা ভীষণ জোরে ব্রেক কষল অশোক। এক ঝটকায় আয়না থেকে সামনে চোখ ফিরিয়ে দেখি, বনেটের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ইসাবেলা। গাড়িটা দাঁড়িয়ে যেতেই আমার বন্ধ জানলায় এসে কিল মারতে থাকল, 'হেল্প, হেল্প।'

জীবনে কিছু কিছু মুহূর্তে কিছু ঘটনা ঘটে যায় যেগুলো নিজে ঘটিয়েছি বলে পরে আর নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না। সেরকম একটা মুহূর্ত। অশোক সেন্ট্রাল লকটা খুলে দিল। 'খুট' করে একটা আওয়াজ। আমি লাফিয়ে নেমে পেছনের দরজাটা খুলতেই ইসাবেলা বেহুঁশ ভাঁয়রো প্রসাদের পাশে উঠে বসল। আমি পেছন থেকে একটা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ পেলাম, 'দুম!' নাঃ, গুলিটা আমাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলেও, আমার প্রাণটার নাগাল সেটা পেল না। আমি আবার চকিতে উঠে এলাম আমার

BanglaBook.org

সিটে। অশোক আবার স্পীড তুলে ফেলল। পেছনে ততটাই স্পীডে ওদের গাড়িটা।

ভাঁয়রো প্রসাদ প্রায় অচৈতন্য। মুখ গোঁজ করে বসে আছে। পাশে ইসাবেলা একেবারে চুপ মেরে বসে আছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অশোক হাই স্পিডে অন্ধকারের বুক চিরে গাড়িটা চালাচ্ছে। শুধু পেছনের গাড়ির তীব্র হেডলাইটটা আমাদের তাড়া করছে। ৪০ কিলোমিটারের অনন্ত ডাউন দ্য হরর লেন যেন কোনোদিন শেষ হবে না। গাড়ির মধ্যেও এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। কেউ কথা বলার অবস্থাতেই ছিলাম না। আসার পথে কিছু আর্মির ট্রাক দেখেছিলাম। এখন মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছি, সেরকম একটা ট্রাক বা পুলিশ চৌকি পেতে। হঠাৎ তার মধ্যে ইসাবেলা বলে উঠল, "ডান দিকে নিন।" আর তার পিঠে পিঠেই ভাঁয়রো প্রসাদ বলে উঠল, "মাত লিজিয়ে সাহেব, মাত লিজিয়ে।"

আশ্চর্য লাগল। কারণ জানি এই সোজা রাস্তাটাই জয়সলমীর গিয়েছে। তাছাড়া মসৃণ রাস্তায় হাই স্পিডটাও রাখা যাবে। তবু অশোক কেন জানি না ডানদিকের রাস্তাটাই নিল আর অদ্ভুতভাবে থেমে গেল পেছনের গাড়িটা। বুঝলাম যে কোনো কারণেই হোক এই রাস্তায় আর অন্তত ওরা চেজ করবে না। পেছনের গাড়ির হেডলাইট দুটো ছোট হয়ে হয়ে বিন্দু হয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমি ফোনের জিপিআরএস'টা খুললাম। জিপিআরএসের স্ক্রিনে ফুটে উঠল একটা নাম, কুলধারা।

কুলধারা, কুলধারা, কোথায় যেন শুনেছি নামটা! কিছুতেই খেয়াল করতে পারছি না। আসলে আমাদের এবারের এই আসাটা এত বেশি সোনার কেল্লা-কেন্দ্রিক, এক সাম ডিউন ছাড়া অন্য কোনো জায়গার খোঁজ করাই হয়নি। অশোক শেষপর্যন্ত যে জায়গাটায় এসে গাড়িটা দাঁড় করাল, বা বলা ভাল থামতে বাধ্য হল, তার আগে আর কোনো যাওয়ার পথ নেই। চারদিকে একটা গ্রামের ভগ্নস্তূপ। অসংখ্য সারি সারি ভাঙা ভাঙা ছাদবিহীন বাড়ির দেওয়াল। গাড়ির ভেতর আমরা চারজন ছাড়া আর কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই।

খুট! পেছন থেকে দরজা খোলার একটা আওয়াজ হল। নেমে গেল ইসাবেলা। অশোকের বন্ধ জানলার কাচের বাইরে মুখটা এগিয়ে এনে খুব

BanglaBook.org

অর্থবহ একটা হেসে বলল, "থ্যাংক্স।" তারপর ওই ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ততক্ষণে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটে খুঁজে নিয়েছি কুলধারা গ্রামটা। অশোক নিজের দিকে দরজাটা খুলে নামতে যেতেই জড়ানো গলায় ভাঁয়রো প্রসাদ সাবধান করে উঠল, "মাত উতারিয়ে সাহেব, মাত উতারিয়ে।"

অশোক যথারীতি ভাঁয়রো প্রসাদের কথাকে পাত্তা দিল না। কিন্তু আমার চোখ আটকে আছে মোবাইলের পর্দায় ফুটে থাকা ইন্টারনেটের তথ্যে। পরিত্যক্ত এই গ্রামে ভুলেও যাবেন না! অভিশপ্ত কুলধারায় গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি কেউ! আরো পরে জানা গেল কুলধারার ইতিহাস।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে গ্রামের গোড়াপত্তন করেছিল পালিওয়াল ব্রাহ্মণরা। তাঁরা কৃষি এবং ব্যবসা দুটোতেই সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁরা নাকি মরুভূমিতেও গমের ফলন করতে পারতেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ এই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর ক্ষুরধার ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং মেধায় অচিরেই অধিষ্ঠু হয়ে উঠেছিল এই গ্রাম। তারপর একদিন গ্রামের মুখিয়ার সুন্দরী মেয়েটির ওপর চোখ পড়ে ওই রাজ্যের সেনাপতি সেলিম সিং-এর। সেলিম সিং মুখিয়াকে হুমকি দেয় তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলে অশেষ ভোগান্তি পোহাতে হবে বলে। চাপিয়ে দেওয়া হবে প্রচুর রাজস্ব। গ্রামবাসীরা এমন পরিস্থিতিতে একদিন রাতে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয় নিজেদের আত্মসম্মানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে সেই রাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে চিরকালের জন্য। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। এক রাখিপূর্ণিমার রাতে সবাই মিলে দল বেঁধে গ্রামকে শূন্য করে চলে যাওয়ার আগে কুলধারা গ্রামের মাটিকে গ্রামবাসীর প্রত্যেকে অভিশাপ দিয়ে যায়। তারা রাতারাতি কোথায় চলে গিয়েছিলেন কেউ জানে না। কিন্তু সেই অভিশাপের ফলে সেদিনের পর থেকে, কুলধারাতে কেউই নতুন করে আবাসস্থল গড়ে তুলতে পারেনি। যারাই চেষ্টা করেছে, তাদেরই ভাগ্যে নেমে এসেছে নির্মম মৃত্যু। সেদিন থেকে কুলধারা এক পরিত্যক্ত রহস্যময় নগরী।

তথ্যে এমনও লেখা আছে যে দিল্লির প্যারানর্মাল সোসাইটি থেকে তিরিশ জনের একটি দল রাত কাটাতে গিয়েছিল কুলধারা গ্রামে। তাদের দাবি, রাত জুড়ে নাকি অলৌকিক ঘটনা ঘটে চলে ধ্বংসস্তূপে ভরা এই গ্রামে।

BanglaBook.org

আচমকা রাতের বুক চিরে শোনা যায় আর্ত চিৎকার। হঠাৎ কমে যায় তাপমাত্রা। সকালে নাকি গাড়ির গায়ে দেখা যায় শিশুদের হাতের ছাপ...

অশোককে বললাম, "ফিরে চল!"

অশোক থমথমে মুখে গাড়ি থেকে নামল। তারপর পা বাড়াল ইসাবেলা যেদিকে এগিয়ে গেল সেই দিকে। এই অবস্থায় অশোককে কিছুতেই একা ছেড়ে যাওয়া যায় না। আমার বিজ্ঞানমনস্ক মনটা কোথায় যেন যুক্তিশূন্য হয়ে গিয়ে বুকে ঢিপ ঢিপ ধরাচ্ছে। তাহলে কী ভাঁয়রো প্রসাদের কথাটাই সত্যি। ওই নিশিডাক ডেকে গেল ইসাবেলা?

"মাত উতারিয়ে সাহেব, মাত উতারিয়ে।" ভাঁয়রো প্রসাদের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে অশোকের পেছন পেছন চললাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, পথ চলার সম্বল বলতে আমাদের মোবাইলের টর্চ। একটার পর একটা ভাঙা বাড়ি, তার মধ্যে সরু গলি, ইসাবেলা কেন, কোনো প্রাণেরই শব্দ নেই। আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না। অশোক যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলেছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল সামনেই একটা গভীর গর্ত। আরেকটু অসাবধান হলেই গর্তে পা পড়ে যেত অশোকের। আমি পেছন থেকে খামচে ধরলাম অশোককে। গর্তটার কাছে এসে ভেতরে আলো ফেলে তল পেলাম না। মনে হল একটা পরিত্যক্ত পাতকুয়ো। অশোককে এবার কড়া গলায় বললাম, "অনেক হয়েছে ফিরে চল এবার। ভাঁয়রো প্রসাদের যদি হুঁশ ফিরে আসে, গাড়ি নিয়ে চলে যাবে এখান থেকে..."

আমার কথা শেষ হল না। দূর থেকে একটা ক্ষীণ মেয়েলি গলার আওয়াজ পেলাম। অশোক বলে উঠল, "ইসাবেলা।"

গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে অশোক জোরে পা চালাল। বাধ্য হয়ে পেছন পেছন আমিও। দৌড়তে দৌড়তে একটা সময়ে ভাঙা ঘরবাড়ি ছেড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলাম। সেখানে একটা মন্দির। এবং আশ্চর্য, গোটা জায়গাটার মধ্যে মন্দিরটা একেবারে বেমানান। যেন সদ্য তৈরি করা হয়েছে মন্দিরটা। তারপর আবার সেই মেয়েলি গলার আওয়াজটা, মন্দিরের ভেতর থেকে। অশোকের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটার সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। একটা বেদির ওপর একটা শিবের মূর্তি। বেদিটার চারদিকে টাটকা ফুল, সদ্য লেপা সিঁদুর। আর সিলিং থেকে ঝুলছে একটা পেতলের চকচকে ঘণ্টা।

BanglaBook.org

অশোক হাত উঠিয়ে ঘণ্টাটা বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে এক কোণা থেকে বেরিয়ে এল ইসাবেলা আর আমার চোখে নেমে এল অন্ধকার।

চোখটা যখন খুলল, দেখলাম ভাঁয়রো প্রসাদের গাড়ির পেছনের সিটে শুয়ে আছি। গাড়িটা চলছে। জানলার বাইরে সোনার কেল্লার প্রাচীর। ঠিক যেমন কাল রাত্রে জয়সলমীরে ঢোকার সময় দেখেছিলাম। সোনার কেল্লার প্রাচীর চুঁইয়ে জায়গায় জায়গায় নিয়নের আলো ছড়িয়ে আছে। অশোকের কোলে আমার মাথা। গাড়িটা চালাচ্ছে ভাঁয়রো প্রসাদ। কিন্তু তারপরেই চমকে উঠলাম। ভাঁয়রো প্রসাদের পাশের সিটে ও কে? ইসাবেলা!

ধড়ফড়িয়ে উঠলাম। ইসাবেলা জিজ্ঞেস করল, "হাউ আর ইউ ফিলিং নাউ?"

ইসাবেলা কে? উত্তরটা পেয়েছিলাম আরো কিছুক্ষণ পর, রাস্তার ধারে একটা ধাবায় একসঙ্গে ডিনার করতে করতে। মুম্বইয়ের গোল্ডেন লেন্স প্রোডাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার রুহি চৌহান। রুহিয়াদের ফিল্ম কোম্পানি রাজস্থানের পটভূমিতে একটা বলিউড ফিল্মের শ্যুটিং করছিল। সোনার কেল্লার ভেতর জুনা মহলের জানলায় বা স্যাম ডিউনে ওকে দেখতে পেয়েছিলাম, কারণ শ্যুটিং ক্যানসেল হয়ে যাওয়াতে ও আমাদের মতো ঘুরতে বেরিয়েছিল। স্যামের গ্রামে মাতালগুলোর হাতে পড়ে যাওয়াটা নেহাতই দুর্ভাগ্য।

—"কিন্তু কুলধারায় কেন?"

—"কারণ ওখানেই আমাদের শ্যুটিং-এর সেট হয়েছিল। আর আমার মনে হয়েছিল বীরপুঙ্গবদের হাতের থেকে নিরাপদ থাকতে ভুতুড়ে জায়গাই সবথেকে নিরাপদ। ফর দ্যাট ম্যাটার, আয়্যাম স্যরি টু সে, একটা সময়ে তোমাদেরও বিশ্বাস করিনি আমি। তাই গাড়িতে কুলধারায় নিয়ে যাওয়ার সময় একটাও কথা বলিনি।"

অবাক হয়ে বললাম, "শ্যুটিং-এর সেট! কিন্তু একটাও তো লোক দেখলাম না ওখানে।"

—"কারণ আজ সকালে শ্যুটিং-টাই ক্যানসেল করে দিয়েছে লোকাল অথরিটি। কুলধারা একটা হেরিটেজ সাইট। শর্তসাপেক্ষে শ্যুটিং-এর পারমিশন পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের আর্ট ডিরেক্টর ভেতরের মন্দিরটা প্লাস্টার

BanglaBook.org

রং ইত্যাদি করে শর্ত ভেঙেছে। পুলিশ কেসও হয়ে গিয়েছে। গোটা ইউনিট আজ ফেরত চলে গিয়েছে।”

ডাল চুরমা খেতে খেতে রুহি বলল, “বাট থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন ফর এভরিথিং। অলসো ফর দিস নাইস ডিনার।”

অশোক ওর দামি ক্যামেরাটা বার করে রুহির দিকে তাক করে বলল, “তোমার সামনে যাকে দেখছ, তাকে কিন্তু মোটেই ভিতু ভেব না। ওই শুধু একটু ফিটের ব্যামো আছে। আর মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেলে একটু ছেলেমানুষ। এখনো পুতুল জমায়। দেখাতে বলো, কাল একটা কী সুন্দর পুতুল পেয়েছে। তার আবার নাম দিয়েছে ইসাবেলা...”

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

অশোক কথা বলতে বলতে প্রাণভরে ইসাবেলার ছবি তুলে যাচ্ছে। আমি ব্যাগটা খুললাম। পুতুলটা বার করে এগিয়ে দিলাম রুহির দিকে, “নাও, এটা তোমার জন্য। তুমি রাখো।”

—“হাউ নাইস। ওয়ান্ডারফুল। কিন্তু আমি কেন? তুমি তোমার কালেকশনের জন্য নিয়ে যাও।” পুতুলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে রুহি লজ্জা পেল। তারপর আমি জোর করাতে পুতুল নিয়ে বলল, “থ্যাংক ইউ আংকেল।”

আংকেল! হঠাৎ করে মনে পড়ল, ফেলুদাও এখন পঞ্চাশ।

BanglaBook.org

# অভয়

## সৌরভ মুখোপাধ্যায়

ঢং করে পেটা ঘণ্টার আওয়াজটা হল আর একবার। একটু চমকে উঠল অভয়। ক'নম্বর হল এটা যেন? সন্ধের পর থেকেই গুনে আসছে, কিন্তু শেষ কয়েকটা গুনতে গিয়ে কীরকম গুলিয়ে গেল বোধ হয়। এটা ক'টার ঘণ্টা, রাত দুটো? না তিনটে? মনটা বশে নেই, ঘণ্টার শব্দগুলো জড়ামড়ি হয়ে যাচ্ছে কানের ফুটো থেকে মগজে ঢোকার সুঁড়িপথের ভেতর। এতক্ষণ দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে'বসে ছিল অভয়, এবার একটু ছটফট করে উঠল। ধুস্ শালা, হাতের তেলো দুটো কীরকম বরফ-ঠাণ্ডা হয়ে আছে দ্যাখো একবার! পায়ের পাতা দুটোও...! মাথাটা খুব কষে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে অভয়

জোরসে হাতে হাত ঘষে নিল ক'বার। তারপর ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালেই চড় মারল বেশ কয়েকটা। ভয় পাচ্ছিস নাকি, গান্ডু? ভয়! ভয়! পইপই করে সেই কবে থেকে বুঝিয়ে আসছি তোকে, শালা, ভয় বলে কিছু নেই দুনিয়ায়। নো ফিয়ার। কীসের ভয়? জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। যা করেছি, বেশ করেছি—কোনো অনুতাপও নেই, যা হতে চলেছে তার জন্যে কোনো ভয়ও নেই। অভয়, অভয়, তোর নাম অভয়—তুই এরকম ম্যাদামারা হয়ে মেঝেয় বসে কাঁপবি শালা? লোক হাসাবি?

নিজের মাথার চুল মুঠোয় ধরে কষে টান মারল অভয়। যেন অন্য কারো চুল, অন্য কারো মাথা। ওঠ, উঠে দাঁড়া হারামি! গোটা দুনিয়া তোকে দেখছে রে। তুই ছিঁচকে চোর নস্, জালিয়াত নস্, ব্ল্যাকমেলার নস্। আজ তুই যে এই ছয় বাই ছয় কুঠুরিতে আটক রয়েছিস, এ কোনো ব্যক্তিগত ছ্যাঁচড়ামির কারণে নয়। মহৎ আদর্শের জন্যে এ তোর বলিদান। তুই চিরকালের ডেয়ারডেভিল, তোর সাহসের গপ্পো লোকের মুখে মুখে ফেরে। শুনতে পাসনি প্রত্যেকবার তোকে কোর্টে তোলার সময় কোর্ট চত্বরে কত তাজা ছেলেমেয়ে তোর নাম করে চেঁচাত? জয়ধ্বনি দিত? ওদের লিডার তুই, লিডার! ওদের স্লোগানে ওদের ঝান্ডায় ওদের মুঠিতে তোর আদর্শ ঠিকরে ঠিকরে ওঠে। আজ আর আজ তুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছিস কোন্ আক্কেলে? ওঠ!

সত্যিই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল অভয়। হাত পা ছুঁড়ল একটু এদিক-ওদিক, ওয়ার্মআপের ভঙ্গিতে। উফ্, থুম্ হয়ে বসে থাকতে থাকতে বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল তার শরীর! অভয় পায়চারি শুরু করল কুঠরির মধ্যে। বাইরের বারান্দায় একটা হলদেটে ডুম ঝুলছে, তার রুগ্ণ আলো গরাদগুলোর ফাঁক গলে এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। অভয় একবার ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল। অনেক উঁচুতে, প্রায় ছাদের গায়ে-গায়ে একটা ঘুলঘুলি। গোটা ঘরে ওই একখানিই। মানুষ গলবে না। তার ওপর মোটা রড। ঘুলঘুলিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অভয়। তারপর ফের সপাটে একখানা চড় কষাল নিজের গালে। শালা, ওই ফোকরটা দেখে তুই কী ভাবছিস বল্ সত্যি করে! পালাবি, অ্যাঁ? এত ভয়, এত ভয় তোর? তুই যদি আজ জেল থেকে পালাস, ওই ছেলেমেয়েগুলোর কাছে কী জবাবদিহি করবি

BanglaBook.org

রে শালা? ওই অন্তু-প্রিয়নাথ-লতিকা—ওদের কাছে মুখ দেখাতে পারবি? ওদের সামনে যে বিরাট লেকচার দিতিস, আমাদের প্রাণের মায়া রাখলে চলবে না...সমস্ত ভয়কে জয় করে আদর্শকে খাড়া রাখতে হবে, যে কোনো সময় হাসিমুখে মরার জন্যে প্রস্তুত থাকা চাই...অ্যাঁ, কোথায় গেল সে সব বুলি?

নিজের হাতে চড় খেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসল অভয়। বলল, আরে ধ্যাৎ। ভয় আবার কী? আমি ওই ঘুলঘুলিটা দেখছি, জাস্ট অন্ধকারটা ফিকে হচ্ছে কি না সেটা ঠাহর করার জন্যে। নাথিং মোর। আরে বাবা, আমার নাম অভয়, অভয়... গ্রুপের সব্বাই জানে অভয় নামটা কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট! কোনোদিন কোনো কিছুতে কেঁপেছি আমি? যত ডেয়ারিং প্লান প্রোগ্রাম সব কি আমার মাথা থেকেই বেরোয়নি, আমি কি সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিইনি? প্রিয়নাথ-লতিকা-মকবুলরা আগে না স্বচক্ষে দেখেছে আমার ডাকাবুকো কীর্তিকলাপ, তবেই না একবাক্যে গুরু বলে মেনেছে? পিস্তল ধরতেও হাত কাঁপেনি, বোমা বাঁধতেও না। ডেরায় পুলিশের রেড্ হওয়ার সময়ও আমার বডি ল্যাঙ্গোয়েজে কেউ কোনো নার্ভাসনেস দেখেনি, বুলেট এক্সচেঞ্জ করেছি লোহার মতো শক্ত চোয়ালে। আমি শুনেছি, সরকারি মহলে বা পুলিশ দপ্তরেও লোকে বলাবলি করত, অভয়ের ডিকশনারিতে ভয় কথাটা সত্যিই নেই! সাধে কি আমার মাথার দাম ঘোষণা করে রাস্তাঘাটে পোস্টার সাঁটাতে হয়েছে ওদের?

জোরে জোরে হাঁটতে লাগল অভয়। নিজের চড় খেয়ে তেতে উঠেছে খুব। ক্রমশ গতি বাড়ছে। তীব্র গতিতে যেন চরকিপাক খাচ্ছে সেল-এর মধ্যে। আর বিড়বিড় করছে একটানা। ভয় আবার কী, অ্যাঁ, ভয়? সেই ছোট্টবেলা থেকে আমি বেপরোয়া। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাঁতরে নদী পেরিয়েছি। সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে ডিম বার করে এনেছি। ভূতের খোঁজে শ্মশানে বসে থেকেছি রাতভর। কোনো বুক-টিপটিপ অবধি ছিল না কোনোদিন। বাড়িতে বদরাগী জ্যাঠা ছিল, পাড়াসুদ্ধু ছেলেপিলে ডরাত—আমি হাসতে হাসতে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিয়েছি তার গায়ে। ইস্কুলে অঙ্কমাস্টার নিধুবাবু ছিলেন সক্কলের যম। আমি পাত্তাই দিতাম না। মুখের ওপর বিড়ির ধোঁয়া ছেড়েছি। হেডমাস্টার ছড়ি তুলেছিলেন, আমি সে-ছড়ি

BanglaBook.org

দু আধখানা করে এমন আগুনে চাউনি দিয়েছিলাম যে জোঁকের মুখে একখাবলা নুন পড়ে গিয়েছিল।

দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অভয়। ছায়াটা লম্বা হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলল সে। অনেকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে হাঁফাচ্ছে। মাথাটাতেও একটু চক্কর-চক্কর ভাব। মাথাটা দোলাল বারকয়েক। শাল্লা, নেশা হয়ে যাওয়ার মতো টলমলে লাগছে যে! নাহ্, নেশা-টেশা জীবনে করেনি অভয়। বেশ মনে আছে, নির্মলকে ফিনিশ করার সময় পোড়-খাওয়া গণেশদাকেও একটু মদ খেতে হয়েছিল। গণেশদা বলেছিল, দলের নির্দেশ—কিছু করার নেই রে অভয়, হাত-পা বাঁধা। কিন্তু নর্মাল অবস্থায় নিরুকে মারব কী করে বল্? ওকে যে নিজে হাতে করে তৈরি করেছি রে! অভয়ের ওসব আদিখ্যেতা পছন্দ হয়নি। দলের প্রয়োজনে মারতেও রাজি, মরতেও রাজি। নো ফিয়ার, নো হেজিটেশন। অভয়েরও বন্ধুই ছিল নির্মল। তাতে কী? কমিটির মিটিংয়ে যখন ফাইনাল হয়ে গেছে, আর কোনো পিছুটান নয়। বেইমান নিরুকে মরতেই হবে। তার জন্যে মদ খাওয়া? ফুঃ! তা-ও গণেশদা পিছন থেকে হাত চেপে ধরেছিল শুধু, গলায় ফাঁস-পরানো থেকে সেটা টেনে দেওয়ার আসল কাজটা অভয়ই করে দিয়েছিল সোজা-সাপটা কায়দায়। হাত কাঁপেনি। গণেশদা শ্বাস ফেলে বলেছিল, তোর হবে রে অভয়। তুই উঠবি অনেক।

হ্যা হ্যা করে হঠাৎই খুব হাসি পেয়ে গেল অভয়ের। নির্মলের সেই শেষমুহূর্তের মুখটা মনে পড়ছে। গণেশদা হাত দুটো আচমকা চেপে ধরতেই তীব্র আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল ওর চোখে। গোটা মুখটা এক সেকেন্ডে ছাইরঙা। বুঝে গিয়েছিল কী ঘটতে চলেছে। অভয়দা...অভয়দা...না...ন্না... প্লিজ, শোনো...অভয়দা...বলে কয়েকবার আর্তনাদ করে ওঠার ফাঁকেই ফাঁস পরানো কমপ্লিট, তারপরেই হ্যাঁচকা টান—আঁ-আঁ করে চারবার খাবি খেয়েই ফিনিশ। ওর সেই চোখ-ঠিকরোনো, জিভ-বেরিয়ে আসা মুখটা আজও ভোলেনি অভয়।

শাল্লা, ডরপুক কাঁহিকা! বেইমানির সাহস আছে আর মরার সাহস নেই...গলায় ফাঁস বসে যাওয়ার পর ন্না ন্না প্লিজ বলে কাতরানি! দেয়ালের লম্বা ছায়াটার গায়ে থু থু করে গয়ের ছিটিয়ে দিল অভয়। আমায় দ্যাখ শালা!

BanglaBook.org

খাড়া গর্দান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভয় পাইনি। পুলিশ যখন ধরতে এল ভয় পাইনি, যখন ঘিরে ফেলল ভয় পাইনি, যখন গাড়িতে তুলল ভয় পাইনি। জেরা চলেছে মাসের পর মাস। তুই কী জানবি রে পিজন্‌চেস্টেড নিরু...জেরা কী জিনিস! তবু ভয় পাইনি। স্ট্রেট তাকিয়েছি চোখে চোখ রেখে, সে যতবড় অফিসারই হোক। ওরা তো বলাবলি করত শুনেইছি—এ ব্যাটার নার্ভ ইস্পাতে গড়া! আর যেদিন রায় বেরোল, সেদিন? কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি হেসেছিলাম, বুঝলি? হেসেছিলাম। যে সময় লোকে ভেউ ভেউ করে কাঁদে—দয়া করুন ধর্মাবতার বলে চেঁচায়—আমি হো হো করে হেসেছিলাম। জজ উকিল মুহুরি সব্বাই থ বনে গিয়েছিল। বুঝেছিস, অভয় কী চীজ!

দেয়ালে লাথি মারল অভয়। গালাগাল দিতে লাগল, চেঁচাতে চেঁচাতে গলা চিরে গেল তার। আমি অভয়, অভয়...! হাতে-পায়ে একটু খিল ধরে গিয়েছিল, ঠাণ্ডাও লাগছিল—কিন্তু নাহ্, ভয় পেয়েছি কোন্ শালা বলে? তোর মতো মেনিমুখো নই রে নির্মল। আর গণেশদা, তোমার মতো উইক হার্টের লোকও নই। এই দ্যাখো তোমরা সবাই, আমি কিছুতেই টলি না। এই যে ক'দিন ধরে সলিটারি সেল-এ আটক রয়েছি, একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছে আর হাঁটি হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে আসছে মোক্ষম তারিখটা—তাতে কী আমার চোখের নিচে কালি পড়েছে, না ওজন কমেছে? যেমনটা অন্যদের হয়? লাস্ট যেদিন কোর্টে গিয়েছিলাম, রায় ঘোষণার পর যখন গাড়িতে ওঠানো হচ্ছে তখনো স্লোগান দিয়েছিলাম, এক অভয় গেলে হাজার অভয় জন্মাবে। জমায়েতের ছেলেমেয়েদেরও সে কী চিৎকার, অভয় তুমি লড়াই করো, আমরা তোমার সাথে আছি! এই তো শেষ রাত্তিরটাও সেকেন্ডের পর সেকেন্ড ফুরিয়ে যেতে বসেছে—আমাকে একটুও টসকাতে দেখেছে কেউ? কী রে, হতভাগা নির্মল—বল্ না, তোর মতো ভয়ে সাদা হয়েছি আমি?

অনেকক্ষণ গলা ফাটিয়েছে, এবার একটু দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়াল অভয়। এপাশ ওপাশ তাকাল। সেই কখন ঘণ্টাটা বেজেছে, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সত্যি সত্যিই বাজল ক'টা তাহলে? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দাঁতে ঠোঁট কামরাল অভয়। এমন হতে পারে কি যে, আর ওই ঘণ্টা শোনাই হবে না অভয়ের? অভয় বারান্দার হলদে ডুমটার দিকে তাকিয়ে রইল আবার। সকালে ওটা নিভে যাবে। কত সকালে? তখন অভয় কোথায়?...

BanglaBook.org

কাল সন্ধেয় আবার যখন জ্বলে উঠবে আলোটা, তখন এই সেলটা খালি। অভয় তখন...

ঠোঁটের ওপর দাঁতের চাপটা বাড়াল অভয়। লাগছে। চিন্‌চিন্‌ করছে। আরো চাপ দিলে কেটে যাবে। রক্ত বেরোবে। শরীর যন্ত্রণা পায়, মনও কি পায়? যখন শরীরে কষ্ট হয়, মনকে কি সেখান থেকে আলাদা করে নেওয়া যায়? কেন যাবে না? এই তো সেদিন গীতা পড়ল অভয়। শরীরটা নশ্বর, কিন্তু আত্মাকে কিস্যু করা যায় না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি...। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। শরীরের যাই হোক, আত্মাটাকে সেপারেট করে রাখলেই হল। ব্যথাট্যথা সব জিরো হয়ে যাবে। আরো একটু চাপ দিল অভয়। উফ্‌ফ্‌, নাহ্‌, পারা যাচ্ছে না! দাঁত আলগা করল অভয়। গলার নলিতে ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে চাপ দিল। মোটামুটি সয়ে নেওয়া যাচ্ছে। একটু একটু করে বাড়াতে বাড়াতে হঠাৎ অভয় প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরল কণ্ঠনালীর মাঝখানটা। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কাশি উঠে এল গলার ভেতর থেকে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। যেন অন্য কারো হাত তার গলা টিপছে, এমন ভঙ্গিতে অভয় তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটাকে সরিয়ে দিল। তারপর কুঁজো হয়ে মাটিতে বসে পড়ে খুব জোরে জোরে হাঁফাল কিছুক্ষণ।

অভয়ের ছায়াটাও বসে পড়েছে। দেয়ালের দিকে ফিরে একটু ফ্যাকাশে হাসল অভয়। চেরা গলায় বলল, ভ্যাট শালা, ভয় পাইনি। গলায় চাপ পড়লে কাশি তো হবেই। ফিজিওলজি। ভয়ের কী আছে? আমার নাম অভয় রে, অভয়...আমি নির্মল নই...আঁ আঁ ন্না ন্না বলে খাবি খাওয়ার লোক নই আমি। সেই ছোট্টবেলা থেকে আমি ভয় কাকে বলে জানি না...। আমাকে সব্বাই চেনে, দল চেনে, পুলিশ চেনে, কোর্ট চেনে...ভয় আমার ডিকশনারিতে নেই...কীসের ভয় শালা?...নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ভয় নাই...ভয় নাই...

ঘোর-লাগা গলায় বলেই চলেছিল অভয়। ভরে-পাওয়ার মতো, একটানা একঘেয়ে সুরে আউড়ে চলেছিল। হঠাৎ চমকে উঠল সে। কান খাড়া করল। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। থমথমে রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে। বুটের শব্দ! কয়েক জোড়া ভারী বুট এগিয়ে আসছে লম্বা দালানটা পেরিয়ে।

দেয়ালের দিকে মুখ করেই কুঁজো হয়ে বসে রইল অভয়। বুটের শব্দের

BanglaBook.org

তালে তালে তার বুক ক্রমশ উঠছিল নামছিল। যত কাছাকাছি চলে আসছে শব্দটা, তত যেন দ্রুত হচ্ছে পাঁজরের ওঠানামা। শ্বাস চেপে অপেক্ষা করছে অভয়। না, ওদিকে তাকাবে না সে!

বুটগুলো ঠিক তার দরজার সামনে থামল। ঝং করে তালা খোলার আওয়াজ।

একটা ভারী গলা শোনা গেল, অভয়বাবু...

অভয় যেন একটু অবাক হয়েই দেখল, তার ছায়াটা কুঁকড়ে মিশে যাচ্ছে দেয়ালের সঙ্গে। আর আচমকাই, যেন তার ইচ্ছের তোয়াক্কা না করে, রিফ্লেক্স-এর মতো, একটা আকাশফাটা চিৎকার ছিটকে বেরোচ্ছে তার নিজের গলা থেকে—না! ন্না! যাব না...যাব না...

ভারী গলাটা আর একটু কাছে চলে এল। একটু নরমও শোনাল যেন। অভয়বাবু, শান্ত হোন। সময় হয়েছে, এখন তো যেতেই হবে।

কেন্নোর মতো কুঁকড়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে গেল অভয়। মুখের রেখাগুলো বেঁকেচুরে গেল, চোখ বিস্ফারিত। পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল সে, না... না...ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, প্লিজ...

জেলারের ইঙ্গিতে দুজন রক্ষী পাঁজাকোলা করে তুলে ধরতে গেল অভয়কে। অভয় শুয়ে পড়ে তাদের বুটের ওপর মুখ ঘষতে লাগল। মাথা ঠুকতে লাগল পায়ে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে তার। কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে বিকৃত স্বরে বলতে লাগল, ওগো আমায় ছেড়ে দাও, আর আমি করব না গো...একবার চান্স দাও, একবার...প্লিজ প্লিজ...ও ভাই, ও দাদা...

ধুলোয় আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিল অভয়। হাত পা ছুঁড়ছিল প্রবলভাবে। রক্ষীরা তাকে সামলাতে পারছিল না, কেবলই গড়াগড়ি দিতে দিতে চেঁচাচ্ছিল সে, না...যাব না...ওগো তোমরা বাঁচাও না আমায়...

জেলার অবাক হচ্ছিলেন অভয়ের হাবভাব দেখে। তিনি বলেই ফেললেন, কী করছেন অভয়বাবু! আপনি না সাহসী লোক, আপনার নামই তো অভয়...

গাঁ গাঁ করে গলার শির ফাটিয়ে অভয় চেঁচিয়ে ওঠে, না...ন্না...আমি অভয়-টভয় হতে চাই না...আমায় ছেড়ে দাও...ওগো আমার ভয় করছে... আঁ....আঁ...

BanglaBook.org

শেষ অবধি আরো ক'জন মিলে চেপে ধরে চাগিয়ে নিয়ে চলল অভয়কে। অভয় বলির পাঁঠার মতো ঝটপটাচ্ছিল প্রাণপণে। আর হিক্কা তুলে তুমুল আর্তনাদ করছিল। ওরে হারামির বাচ্চারা...ছাড়্...ছাড়্ আমাকে... ওরে আমার খুব ভয় করছে...ও হো হো...ওরে বাবারে...

যে-দুজন রক্ষী অভয়ের পায়ের দিকটা ধরেছিল, তারা হঠাৎ নাক কুঁচকে বলে উঠল, ইঃ! শালার কাণ্ড দ্যাখো!

সামনের দুজন ঘাড় ফিরিয়ে বলল, কী?

ভয়ে মুতে ফেলেছে শুয়ারের বাচ্চা!

BanglaBook.org

# কেউ আছে আশে পাশে

বিনতা রায়চৌধুরী

## এক

আজ শুভ্রর জন্মদিন। পাঁচ বছর বয়স হল ওর। বাড়ির সকলেই আনন্দে ভরপুর। সবচেয়ে বেশি খুশি শুভ্রর দিদি ইছামতীর। বয়স তার নয় হলে কী হবে, ভাইয়ের জন্মদিনে ঘর সাজানোয় সে-ই সব ব্যাপারে আগে আগে দৌড়চ্ছে।

ওদের বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। রঙিন কাগজ, বেলুন, সোনালী ছোট ছোট মুক্তো আর বাহারী ফুল দিয়ে। এই ঘরেই কেক কাটা হবে। তাই ঘর সুন্দর করে সাজানোর পর বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখা হবে ঠিক হয়েছে। খোলা হবে সেই সন্ধেবেলা। অতিথিরা সবাই এলে পরে। ততক্ষণে শুভ্রকে সাজিয়ে নেওয়া হবে। সেজে উঠবে আরও সব ছোটরা। ইছামতী তো বটেই।

দুপুরে খাওয়ার পরই সে মাকে ব্যস্ত করে দিতে থাকল সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। মা বলল, 'আগে একটু ঘুমিয়ে নে তারপর সাজিয়ে দেব।'

'না, আগে সেজে নেব তারপর ঘুমিয়ে নেব।'

'বোকা মেয়ে, অত আগে সাজলে সবাই তোকে দেখে নেবে তো।'

'কেউ দেখবে না, আমি ঠিক লুকিয়ে থাকব। তুমি আমাকে সাজিয়ে দাও।'

মেয়ের বায়নায় ইছামতীর মা খুব যত্ন করে সাজিয়ে দিল মেয়েকে।

'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। কিন্তু এই সাজ তো সন্ধের আসর সেজে উঠতে না উঠতেই নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু হবে না। কেউ দেখতেও পাবে না আমাকে। আমি দোতলার জন্মদিনের ঘরে লুকিয়ে থাকব। কেউ জানতেও পাবে না।'

'জন্মদিনের ঘরে?' একটু চমকালো মা, 'দেখিস, গোছগাছ যেন নষ্ট না হয়। সবাই সুন্দর করে সাজিয়েছে ঘরটা। তুই কিছুতে হাত দিবি না কেমন?'

মাথা নেড়ে নয় বছরের ইছামতী ছুট্টে গিয়ে সেই ঘরে খিল দিল।

BanglaBook.org

সন্ধে পার হতে না হতেই অতিথি অভ্যাগতরা আসতে শুরু করল। শুভ্রকে সাজানোর দায়িত্ব ছিল ইছামতীর কাকিমার মানে শুভ্রর মায়ের। তাকে লাগছিল ছোট্ট রাজপুত্তুর। সবাই এসে গেলে দল বেধে চলল সকলে দোতলার সাজানো গোছানো ঘরে কেক কাটার জন্য।

দরজা ঠক্‌ঠক্ করতেই ভেতর থেকে ইছামতীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর ইছামতী দরজা খুলল আর সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী!'

ঘরের সাজানো কাগজ, বেলুনের মালা, চুমকির সাজ লণ্ডভণ্ড হয়ে ঝুলছে।

'কী করে হল এমন? অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল ইছামতীকে।

সে মুখ চুন করে জবাব দিল, 'আমি জানি না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে দেখছি এই অবস্থা।'

'জানলা কে খুলেছে? আমি বারবার বারণ করে রেখেছিলাম।' রাঙাকাকা প্রশ্ন করল।

'জানলাটা আমিই খুলেছি।' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল ইছামতী।

তারপরই ফিসফাস শুরু হল, কেউ বলল, ইচ্ছে করে খুলেছে, কেউ বলল না বুঝে খুলেছে, আবার কেউ বলল, যাক্‌গে ছেলেমানুষ, বকাবকি কোরোনা। কিন্তু বাড়ির সকলের সামনে শর্মিলার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

## দুই

ব্যাপারটা এভাবে শুরু হলেও ইছামতীর চরিত্রের ডিসঅর্ডার নিয়ে তেমন করে কেউ ভাবিত হল না। মাঝে মাঝে একটু আধটু আশ্চর্য ব্যবহার করলেও সাড়া পড়ে যাওয়ার মতো নয়। বরং হাসিখুশিই ছিল।

ইছামতী ক্লাস নাইনে ওঠার পর ঠিক হল, এবার পুজোর ছুটিতে ওরা দিল্লি যাবে। দিল্লিতে ইছামতীর মাসি থাকে। প্রবল উৎসাহ ইছামতীর। শর্মিলারও খুব আনন্দ হচ্ছে, অনেকদিন পর বোনের সঙ্গে দেখা হবে। অনিমেষ তিনজনের জন্য রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে এনেছে।

ট্রেনে উঠে চটপট নিজেদের বার্থগুলো খুঁজে নিল ওরা।

ইছামতী জানলার ধারে গিয়ে বসল। জানলার কাচ খোলার চেষ্টা

BanglaBook.org

করতেই অনিমেষ হেসে উঠল, 'ওই কাচ খোলা যাবে না ইছা। পুরো কামরাটা এসি দেখছিস না।'

'তাহলে বাইরেটা দেখব কি করে? ঝালমুড়ি কিনব কি করে? নিউজ পেপার?'

হো-হো করে হেসে উঠল অনিমেষ, সব ট্রেনের ভেতর পাওয়া যাবে। দেখ না, কতরকম খাবার দেবে এখানে। আর বাইরেটা তো কাচের মধ্য দিয়েই দেখা যাবে।'

'ও'। ছোট উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল ইছামতী।

ট্রেন যত এগোচ্ছে, ইছামতী তত চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। খাবার বেশির ভাগই ফেলে দিল। শর্মিলা বুঝতে পারছে না, মেয়ের কীসে এত রাগ হয়েছে।

অনিমেষ বলল, 'আমার সঙ্গে দাবা খেলবি?'

'না'। উত্তর দিয়েই চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ইছামতী। কারও কাছ থেকে ও যেন নিজেকে লুকোতে চাইছে।

শর্মিলা বলল, 'তাহলে আমার সঙ্গে লুডো খেল।' মেয়ের কোনো সাড়া পেল না সে। ব্যাগ থেকে গল্পের বই বের করে দিল শর্মিলা, 'বই পড়বি ইছা?'

ইছামতী কোনো উত্তর দিল না। চাদর দিয়ে মুখটা আড়াল করে রইল।

'তোর কি হয়েছে? ভালো লাগছে না? কষ্ট হচ্ছে কিছুতে? খিদে পেয়েছে?'

মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ইছামতী বলল, 'এই ট্রেনটা বাজে, বিচ্ছিরি!'

অনিমেষ অবাক হয়ে বলল, 'সে কী রে? এটা রাজধানী এক্সপ্রেস, সবচেয়ে ভালো ট্রেন!'

ইছামতী আর কোনো উত্তর দিল না।

দিল্লি গিয়ে ইছামতী অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

মাসি, মেসো, মাসতুতো দিদি রিনিদি, সবার সঙ্গে ভালোই আনন্দ করছিল। মাসি তো সুযোগ পেলেই ওদের নানা জায়গায় ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছে। দু-একটা জায়গায় শর্মিলা অনিমেষকে ছাড়াই ইছামতী মাসিমণি আর রিনিদির সঙ্গে ঘুরতে গেল।

একদিন ইছামতীর মাসি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বলল, 'দাঁড়া, আগে তোর

BanglaBook.org

মেসোর অফিসে একবার যাই, সেখান থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে সারাদিন ঘুরব।'

মেসো একটা মস্তবড়ো অফিসে কাজ করে।

লিফ্‌ট-এ উঠে পড়ল ওরা। ছ'তলায় মেসোর অফিস।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইছামতী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল লিফ্‌টের ভেতর। পড়েই যেত ও, রিনি ধরে ফেলল ওকে।

তারপর ছ'তলায় পৌঁছে সবাই ওকে ধরাধরি করে মেসোর অফিসে নিয়ে এল।

ইছামতীর জ্ঞান ফিরে এসেছে কিন্তু কোনো কথা বলছে না। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে বার বার।

মেসো গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল কিন্তু বেড়ানো হল না আজ। তার গাড়ি করে বাড়ি ফিরে এল।

সব শুনে শর্মিলা হতভম্ব। মাসি জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, ইছার ফিটের অসুখ আছে?'

'ফিট-এর অসুখ? ইছার? কি যে বলিস ছোটন?'

'তাহলে হঠাৎ জ্ঞান হারাল কেন?'

সেটাই তো কেউ বলতে পারছে না। ইছামতী কাঁদছে আর বলছে, 'আমার ভয় করছে।'

সকলের আড়ালে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল শর্মিলা, 'কী হয়েছিল রে?'

'কেউ একজন পেছন থেকে আমার নাক-মুখ চেপে ধরেছিল।'

চমকে উঠল শর্মিলা, 'মাসি কিছু বলল না তাকে?'

'আমি তো জানি না। অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম তো!'

পরে বোনকে জিজ্ঞাসা করল শর্মিলা, সে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'না-না, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি দিদি, তুমি বিশ্বাস করো।'

শর্মিলা কাকে বিশ্বাস করবে বুঝতে পারছিল না। তবে দিল্লি বেড়ানো এরপর নীরস হয়ে গেল। বাকি দিনগুলো কোনোমতে কাটিয়ে ওরা ফিরে এল।

ঠিক কী যে হয়েছিল সেদিন, অজ্ঞাতই থেকে গেল। পরে রিনিকেও জিজ্ঞাসা করেছিল শর্মিলা, সে বলল, 'আমি তো সেরকম কিছু দেখিনি মাসিমণি।'

BanglaBook.org

'তোমার মেয়ে সত্যি কথা বলছে না দিদি। ওর একটা কিছু হয়েছে। আমাদের বোধ হয় পছন্দ হয়নি। দুঃখ করে বলল ছোটন, দুঃখিত বোনকে সান্ত্বনা দিল শর্মিলা। তারও মনটা দমে গেছে।

ক্লাস নাইনের মেয়ে এভাবে বানিয়ে বানিয়ে কেন বলবে?

তাছাড়া মাঝে মাঝেই শর্মিলার মনে হয় ইছামতী যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। কাকে ভয় পায় ও। বোঝা যায় না।

## তিন

এরও বেশ কিছুদিন পরের কথা।

ইছামতীর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে।

একদিন শর্মিলা ইছাকে ছাদের চিলেকুঠরি ঘরের চাবিটা দিয়ে বলল, 'যা তো ইছা, ওই ঘরে রামায়ণ-মহাভারত বই দুটো যত্ন করে তোলা আছে। আজ তোকে ওটা পরে শোনাব, নিয়ে আয়।'

ইছা গেল, চাবিও খুলল, ঘরে ঢুকে একটু পরেই বেরিয়ে এল। তারপর ছুটতে ছুটতে নেমে এসে বলল, 'চিল ছাদের ঘরে ভূত আছে।'

'ভূত? ভূত আবার সত্যি থাকে নাকি? ও তো শুধু গল্প!'

'বললেই হবে? আমি রামায়ণ বইটা কেবল বের করেছি। পেছন থেকে আমার গলা টিপে ধরল। আমি জোর করে ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

এবার শর্মিলারই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা। দিন-দুপুরে তার মেয়ে চিলের ঘরে ভূত দেখছে। যে-সে ভূত নয়, আক্রমণাত্মক ভূত!

শর্মিলা কতবার বলল, 'আমার সঙ্গে চল। চিল ঘরে ঢুকে ভূতটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি। আর জিজ্ঞাসাও করে আসি, কেন ইছামতীর গলা টিপে ধরেছিল সে।'

'না-না, আমি যাব না। জীবনে আর কোনোদিন ওই চিলেকোঠার ঘরে ঢুকব না আমি।' শর্মিলাকে ইছামতীর সাফ জবাব।

'আচ্ছা, যে ঘরটার সব জানলা-দরজা বন্ধ, সবসময় বন্ধ। চাবি আমাদের কাছে, সে ঘরে ভূত কোথা দিয়ে ঢুকবে বল তো? চোর-ডাকাতও তো ঢুকতে পারে না। আমি গিয়ে একটু খুঁজি, চল।'

BanglaBook.org

'ঢুকেছে কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে, আমি যাচ্ছি না।' ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল ইছামতী।

এইবার গরমের সময় অনিমেষ শোওয়ার ঘরটা এসি করে নেবে ভাবল। শর্মিলাও রাজি। সত্যি গরমের সময় রাতের ঘুমটা চমৎকার হবে এয়ারকন্ডিশন ঘরে। কিন্তু ইছামতীর ঘোরতর আপত্তি। ওর এসি শ্যুট করে না। কী দরকার ঘর এয়ারকন্ডিশনের? এমনিতেই তো জানলা খুললে রাতে কী সুন্দর হাওয়া দেয় ঘরে।

শর্মিলা অবাক। অনিমেষও। ওরা ভেবেছিল ইছামতীই বেশি খুশি হবে এসি-র প্রস্তাবে। কিন্তু এ তো উলটো বলছে।

ইছাকে ঠিক বুঝতে পারছে না শর্মিলা। ও যত বড় হয়ে উঠছে অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যা সবাই বলে তার উলটো বলে ইছামতী। সবাই যাতে আনন্দ পায় ও তাতে পায় না। তার জন্য ভুল বোঝাবুঝিও হয় অন্যদের সঙ্গে। শর্মিলা ভেবে পায় না কী করবে।

অনিমেষ বলে, 'ওসব ছেলেমানুষী, বাদ দাও, পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

পরে ঠিক হয়ে যাবে? স্কুলের শেষ ধাপে ওরকম ভাবতাম। স্কুল শেষ করে কলেজে উঠল, আরও পাগলামি বেড়ে গেল। দেখলে তো, শোবার ঘর এসি করতে দিল না।'

'ও কী, রাজনীতি-টিতি করে নাকি কলেজে? সাম্য-টাম্য নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সেইজন্যই বোধ হয় এসি ঘরে ঘুমনো বিলাসিতা ভাবে!'

কথাটা একদিন শর্মিলা সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করে ফেলল ইছামতীকে।

ইছামতী প্রথমে চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'ওসব না মা। আমি ভয় পাই।'

'কাকে ভয় পাস? কীসে ভয় পাস? বল আমাকে। কে তোকে ভয় দেখিয়েছে?'

ইছামতী কিছু একটা ভাবল। বোধ হয় কিছু বলতে চাইল, তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

পরের বছর বাবাকে ডেকে বলল ইছামতী, 'বাবা, শোওয়ার ঘরটা এসি করতে পারো।'

'তুই রাজি? এতদিন তো বারণ করতিস।'

BanglaBook.org

'না-না, আমার অসুবিধা নেই বাবা, মায়েরও খুব শখ। করে দাও প্লিজ।'

অনিমেষ বলল, 'দেখলে শর্মিলা, বলেছিলাম না, ওসব ওর ছেলেমানুষী, বড় হলে সেরে যাবে।'

শর্মিলা চুপ করে আছে। অনিমেষকে বলা জরুরি কিনা বুঝতে পারছে না একটা ঘটনার কথা। গত সপ্তাহে ঘটেছে ঘটনাটা।

সেদিন ইছামতীর কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে শর্মিলা ইছার বন্ধু মিতাকে ফোন করল, 'মিতা, তোদের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন রে? কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, এত দেরি করে ফিরছিস!'

মিতা বলল, 'আমরা তো বাড়ি এসে গেছি আন্টি। ইছামতী তো এখন আমাদের সঙ্গে ফেরে না। ও তো আলাদা একা একা ফেরে।'

'কেন?' দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে উঠল শর্মিলার।

'তা তো ঠিক বলতে পারব না। আমরা তো এখন মেট্রোতে ফিরি। একদিন আমাদের সঙ্গে এল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, এটা কী মাটির নিচে নাকি? আমি হেসে বলে উঠেছিলাম, সে কি রে, মেট্রো ট্রেন কী রাস্তা দিয়ে চলবে নাকি? ব্যস, রেগে গেল ইছামতী। ছুটে চলে গেল, বলল, ওরা চলে আসবে ঠিক, তাই এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আমি মরে যাব। আমি আটকাতে গেলে বলে গেল, মরলে আকাশের নিচে মরব রে, পাতাল গহ্বরে নয়।'

'তারপর?'

'তারপর আর আমাদের সঙ্গে ফেরে না। জোর করলে বলে, তোদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না। এরপর আর কী বলতে পারি আমরা বলো?'

'কলেজে তোদের সঙ্গে মেশে না?'

'তা মেশে, তবে একটু ছাড়া ছাড়া। হঠাৎ হঠাৎ লেকচার ছেড়ে বেরিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'ভয় করছিল' কিংবা বলে, 'আমাকে মারবে নাকি সবাই মিলে?'

চুপ করে আছে শর্মিলা। মিতার সঙ্গে আর কী কথা বলবে তার অ্যাবনরমাল মেয়ের সম্বন্ধে, ভেবে পাচ্ছিল না।

মিতাই বলে উঠল, 'তুমি চিন্তা কোরো না আন্টি, বাসে তো ভিড় হয়, জ্যামও হয় রাস্তায়। সেইজন্যই হয়তো দেরি হচ্ছে ওর, ঠিক চলে আসবে।'

BanglaBook.org

'সে তো আসবে জানি। ঠিক আছে। ওই এল বোধ হয়।'

দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে শর্মিলা গিয়ে দরজা খুলল। ইছামতীই।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। জলখাবার খাওয়ার পর হালকা গলায় মেয়েকে বলল শর্মিলা, 'তুই আজকাল মিতাদের সঙ্গে আসিস না কেন? একা একা ফেরা কী ভালো?'

'মিতারা কেন আমার সঙ্গে ফেরে না?'

'ওরা তো মেট্রোয় ফেরে, তাড়াতাড়িও হয়, জ্যাম-জটের কষ্টও এড়ানো যায়।'

'মেট্রো বাজে। আমার ভালো লাগে না।'

'দুনিয়াসুদ্ধ লোক মেট্রোতে ট্রাভেল করছে, কেউ তো খারাপ বলে না।'

'আমি তাহলে দুনিয়ার বাইরে?'

'রেগে যাচ্ছিস কেন ইছা? আমি কী তাই বলেছি? তোর নিশ্চয় কিছু খারাপ লাগে। তা, সেটা কী আমার সঙ্গে শেয়ার করা যায় না? বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভ?'

মুখ গোঁজে করে বসে রইল ইছামতী। শর্মিলাও ধৈর্য হারাল না। তাকিয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে গম্ভীর হয়ে। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইছামতী ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'আমি ভয় পাই। ওরা পায় না।'

'কাকে ভয় পাস? সেটা তো বলবি। যাকে ভয় পাস তাকে তো আমরা শাস্তি দিতে পারি, ভয় তাড়ানোর জন্য একটা স্টেপ নিতে পারি। বাবাও তো রয়েছে।'

'তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না। জানো না কিছু।'

এবার শর্মিলা একটু রাগ করল, 'হ্যাঁ আমরা কিছু জানি না, সব তুই জানিস।'

'মেট্রোয় আসতে গিয়ে কেউ যদি আমাকে খুন করে? তোমরা, মিতারা, খুশি হবে?' চোখের জল চাপতে চাপতে উঠে গেল ইছামতী।

সব শুনে অনিমেষ বলল, 'তাহলে কী এসি-টা লাগাব না?'

'না-না, লাগাবে নিশ্চয়ই। ও যখন মুখ ফুটে বলেছে।'

শোওয়ার ঘরে এসি লেগে গেল।

শর্মিলা ভয়ে ভয়ে ছিল, কে জানে, ইছামতী হয়তো ওঘরে শোওয়াই

BanglaBook.org

ছেড়ে দেবে আজ থেকে। কিন্তু দেখা গেল, তা হয়নি। ইছা রোজের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে খাটে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আজ সে ঘুমোচ্ছে না কেন? রোজ তো বালিশের সঙ্গে গলাগলি হতে না হতেই ঘুমে কাদা। আজ তবে এপাশ-ওপাশ কেন?

ওদিকের খাট থেকে অনিমেষ বলে উঠল, 'ইছা যদি বলে এসি বন্ধ করে দিই?'

শর্মিলা ইছামতীর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল, 'বন্ধ করবে কি? দেখো না, ইছা কীরকম করে ঘামছে। ওটা আরও কুল করে দাও।'

অনিমেষ এসি ছাব্বিশ থেকে আঠারোয় নামিয়ে আনল, 'ঠিক আছে ইছা সোনা?'

'হ্যাঁ বাবা!'

শর্মিলা কিছু বলল না কিন্তু মনের মধ্যে একটা সংশয় লেগেই রইল।

সব সংশয়ের অবসান হয়ে গেল একদিন শর্মিলার মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর। পাশে নেই ইছামতী। কোথায় গেল এই রাত্তিরে? ঘুম আসছিল না ওর। সেটা দেখেছিল শর্মিলা, মেয়ের মাথায় হাতও বুলিয়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে। কোনো জবাব পায়নি মেয়ের থেকে। সে একেবারে চুপ করে শুয়েছিল। কিন্তু আজ মাঝরাত্তিরে শর্মিলা মেয়ের যে কাণ্ডকারখানা দেখতে পেল, সে তো রীতিমতো শঙ্কিত। ইছামতী বৈঠকখানার চেয়ারে আধখানা শুয়ে বসে ঘুমোচ্ছে।

BanglaBook.org

## চার

শর্মিলা একদিন মল-এ মার্কেটিংয়ে গেল। সঙ্গে ইছামতী।

সেখানে গিয়ে তার এক মজার অভিজ্ঞতা। মজা আর বলে কী করে। ইছা এসকালেটরে চাপছে ছুটে ছুটে কিন্তু লিফ্‌ট-এ চড়ছে না।

'আমরা চারতলায় যাব, কতবার এসকালেটরে চাপবি?'

'চারবার।'

'কেন, লিফ্‌ট কী দোষ করল। তুই তো তোর কলেজের লিফ্‌ট-এ উঠিস। আমি দেখেছি। নাকি ছোটবেলার সেই দিল্লির অভিজ্ঞতার জন্য লিফ্‌ট এড়িয়ে চলিস। সত্যি বল।'

'না-না, তা কেন হবে, আমি এসকালেটর এনজয় করি।'

হঠাৎ পেছন থেকে একটা মেয়ে বলে উঠল, 'এসকালেটর এনজয় করিস বুঝি?'

'আরে মিতালী, তুই এখানে?'

'তাতে কি? কিন্তু কলেজ যাসনি কেন দু'দিন? আমাদের একটা অভ্রখনি দেখাতে নিয়ে যাবে কথা হচ্ছে। যাদের যাদের জিওগ্রাফি আছে সবাই যাবে। তুই যাবি না?'

'আমি তো রোজই কলেজ গেছি, তবে জিওগ্রাফি ক্লাস করিনি। ওই খনি অভিযানে আমি নেই। মাইন ইন্সপেকশন পেপারে গোল্লা পেলেও না।'

'কী ভীতু রে তুই। যেতেই হবে তোকে।'

'না যাব না।'

মিতালী চলে যেতেই শর্মিলা বলল, 'কী ব্যাপার? মাইন ইন্সপেকশনের কথা তো আমাদের বলিসনি। যাবি না কেন, নম্বর কাটা যাবে না?'

লাফিয়ে এসকালেটরে উঠে ইছামতী হেসে উঠল, 'মাইন ইন্সপেকশন একটা প্রোজেক্ট, আমি ওর বদলে টপোসীট প্রোগ্রাম করব। ঠিক আছে?'

চলন্ত সিঁড়িতে শর্মিলাও উঠেছে মেয়ের পেছনে পেছনে।

'কলেজের ডিসিপ্লিন না মানলে বাড়িতে চিঠি আসবে। গার্জিয়ান কল হবে। আমি যাব না আমার ভীতু মেয়ের জন্য।'

'কেন, সবাইকে কি একরকম হতে হবে? খনি কিংবা লিফ্‌ট, দুটোই না-পসন্দ আমার। আমার ভালো লাগে পাহাড়, কী, ঝরনা, অরণ্য। এসব নিয়ে বুঝি জিওগ্রাফি প্রোজেক্ট হয় না!'

'হয় নিশ্চয়ই। তবে কলেজের প্রোগ্রাম অনুযায়ী হতে হবে। তোর ইচ্ছেয় তো হবে না।'

অনেক বাজার করার পর এবার বাড়ি ফেরার পালা।

চারতলা থেকে নামার সময় তিনতলা অবধি পৌঁছে শর্মিলা এসকালেটর থেকে নেমে বলল, 'চল এবার লিফ্‌টে নামি বাকিটুকু।'

ইছামতী আর একটা এসকালেটরে উঠে বলল, 'তুমি এসো লিফ্‌ট-এ করে। আমি ট্যাক্সি ডাকছি।'

ট্যাক্সি ডাকাটা বাহানা ইছামতীর, আসলে লিফ্‌টটা অ্যাভয়েড করল।

BanglaBook.org

শর্মিলা বুঝল। কিন্তু মেয়ের মাথায় কী ঘুরছে সেটা বুঝল না।

অনিমেষ নিজে পাত্র পছন্দ করেছে ইছামতীর জন্য। ছেলেটি দেখতে সুন্দর, ভালো চাকরি করে। স্বভাব-কথাবার্তা চমৎকার। বাড়িতেও কোনো চাপ নেই। বাবা-মা অত্যন্ত সজ্জন। একটি ছোট বোন আছে, সে ইছামতীর বন্ধুই হবে।

বিয়ের আগে শর্মিলা অনিমেষকে বলল, 'অন্তত পাত্রকে একটু বলে রাখলে হত না ব্যাপারটা!'

'কোন্ ব্যাপার? ইছার হঠাৎ হঠাৎ ভয় পাওয়া? ওসব বিয়ের পর সেরে যাবে।'

'এত হালকা ভাবে নিচ্ছ, আমার চিন্তা হচ্ছে।'

'আমি বলছি, কিছু হবে না। এসব কথা তুলতে গেলে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হবে। এমন পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া ইছামতীও কিন্তু সিদ্ধান্তকে পছন্দ করেছে।'

'তা অবশ্য করেছে। কিন্তু মা-বাবা হয়ে এই ব্যাপারটা গোপন করে যাব?'

'কী ব্যাপার বলো, কাকে ভয় পায় ইছা, বলতে পারবে? চিল ছাদের ভূত কে, না লিফ্‌ট-এর অদেখা দুর্বৃত্তকে? আমি বলছি ওসব কিছু না। বিয়ে হলে সব সেরে যাবে।'

শর্মিলা মেনে নিল অনিমেষের কথা।

বেশ হই হই করে ইছামতীর বিয়ে হয়ে গেল।

ইছামতীকে বেশ খুশি খুশিই দেখাচ্ছিল।

সিদ্ধান্তর চোখ মুখেও হাইপাওয়ার আলো দেখতে পাচ্ছিল সবাই। বর-কনের হাসিমুখ দেখে বাকি সবাই-ও খুশি হচ্ছিল। বাসরঘরে তো বর দারুণ জমিয়ে দিল। গানে রসিকতায় একেবারে সে হিরো। সবাই জানে, পাত্র কোনো দেনা-পাওনা নেয়নি, সেদিক থেকে সে আগেই হিরো হয়ে বসে আছে। এবার তার ব্যবহার তাকে একেবারে লেটার মার্কস পাইয়ে দিল।

বিয়ের পরদিন নিজে কেঁদে, সবাইকে কাঁদিয়ে, চিরাচরিত প্রথায় ইছামতী শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। মেয়ের বিদায়ে কান্নাটা তো সুন্দর। না

BanglaBook.org

কাঁদাটাই অসুন্দর। সুতরাং বিয়েটা যে চমৎকারভাবে সম্পন্ন হল, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ রইল না।

অষ্টমঙ্গলায় দু'জন বাড়ি এল। মানে শর্মিলাদের বাড়ি। জোড়ে আসতে হয় এটাই প্রথা, কিন্তু জোড়ে হাসতে হয় এটা যে প্রথা নয় সেটা ওদের দেখে বোঝা গেল। সিদ্ধান্ত এবার একটু চুপচাপ। বাসরঘরের সেই সিদ্ধান্তকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

শর্মিলা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো আছিস তো মা?'

'খুব ভালো আছি। শুধু তোমাদের মিস করছি। ও-বাড়ির সবাই ভালো।'

নিশ্চিন্ত হল শর্মিলা। জামাইকে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন জীবনে আশা করি আমার মেয়ে মানিয়ে নিয়েছে?'

সিদ্ধান্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল শর্মিলার দিকে। খানিকক্ষণ। তারপর সামান্য হেসে বলল, 'হ্যাঁ। ভালোই তো।'

জামাইয়ের উত্তরে খুশি হল শর্মিলা কিন্তু তার গলার সুরে খুশি হল না। একটু অবাকই হল। এভাবে জবাব দিল কেন জামাই?

অনিমেষকে বলায় সে আশ্চর্য হয়ে জবাব দিল, 'খারাপ কিছু তো বলেনি। ভালোই তো বলেছে। তুমি একটু টেনশন করা কমাও।'

মেয়ে-জামাইয়ের চলে যাওয়ার আগে শর্মিলা মেয়েকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'ইছা, তোকে পেয়ে সিদ্ধান্ত খুশি হয়েছে?'

'সে আমি কি করে বলব? আচ্ছা, জিগ্যেস করে বলব। আপাতত জানিয়ে রাখি, আমরা হানিমুনে যাচ্ছি সামনের সপ্তাহে। ও-ই টিকিট কেটেছে, হোটেল বুক করেছে। আমরা প্লেনে যাব মা।'

খুব খুশি হল শর্মিলা। ওরা তো এখনো পর্যন্ত মেয়েকে প্লেনে চাপাতে পারেনি। মেয়ে যে ট্রেনজার্নি পছন্দ করে না, সে কথা তো শর্মিলা জানে। বেঁচে থাক জামাই। মেয়েকে নিয়ে সুখী থাক। বুকের মধ্য থেকে দু'জনকে আশীর্বাদ জানাল শর্মিলা।

প্রায় দশদিন হয়ে গেল ইছামতীরা বাইরে গেছে। এতদিনে এসে

BanglaBook.org

যাওয়ার কথা। মেয়ে জামাই কবে আসবে, সেই পথের দিকে তাকিয়ে আছে শর্মিলা। একদিন সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধান্ত একা এল শর্মিলাদের বাড়ি।

শর্মিলা খুশি মনে এগিয়ে এল, হাসতে হাসতে বলল, 'এসো, এসো, ইছা এল না?'

সিদ্ধান্ত একটুও হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আমার একটু দরকারি কথা আছে।'

শর্মিলার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। অনিমেষও ঘাবড়ে গেছে, 'কি কথা? ইছা ভালো আছে তো? ওকে আনলে না কেন?'

'আপনারাই বলুন তো ইছামতী কেমন আছে?'

'মানে, সে তো তোমার কাছেই আছে। কেমন আছে আমরা কি করে জানব?'

'যখন আপনাদের কাছে ছিল, তখন সে কেমন ছিল? ওর মধ্যে কতগুলো অসুবিধা আছে। আমার আগে জানা দরকার, ও কী আগে থেকেই এইরকম?'

'কি করেছে সেটা যদি একটু বলো।' শর্মিলা, অনিমেষ দু'জনেই চিন্তিত মনে হল।

একটু চুপ করে থেকে সিদ্ধান্ত বলল, বলছি, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন ফুলশয্যায় ও জোর করে জানলা দরজা খুলে রাখল ঘরের। আমার কোনো অনুরোধ শুনল না। বলল, তাহলে আমি বারান্দায় ঘুমোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, নাকি?'

'ঘরে কী এসি চলছিল? ওর এসি সহ্য হয় না।' নিচু গলায় বলল শর্মিলা।

'না, এসি চলছিল না। পাগলামির চূড়ান্ত করেছে প্রত্যেকটা দিন।'

ঘরে নিঃঝুম নিস্তব্ধতা। শর্মিলা কী বলবে বুঝতে পারছে না।

অনিমেষ বলল, 'বাইরে গিয়ে তোমরা ভালো ছিলে তো?'

'সেই কথাই তো বলছি। কত শখ করে প্লেনের টিকিট কাটলাম অত দাম দিয়ে। কিন্তু ইছামতী সমানে বলে যেতে লাগল, 'প্লেনটা খারাপ। আমি কিছু খাব না। বমি করব ইত্যাদি। এয়ার হোস্টেসরা সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। একজন তো বলেই ফেলল, প্রথমবার প্লেনে চড়ছে বোধ হয়।

BanglaBook.org

তবু যা হোক শেষ অবধি হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলটা ওর পছন্দ হল কিন্তু সাইট সিয়িংয়ে গিয়ে বিপত্তি।

'লিফ্‌ট-এ চড়ায় আপত্তি করেছিল কি?'

'লিফ্‌ট? না ওসবে ওর কোনো অসুবিধা হয়নি।'

'ওখানের কিছুই কি ও এনজয় করেনি?' শর্মিলার প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

'এনজয় করবে কি? কীসের একটা ভয় পাচ্ছে, সেটা বলছে না। ফোর্ট দেখতে ঢুকেছি, একটু পরে কেঁদে বেরিয়ে এল। কেভ দেখতে তো গেলই না। কেভটা এমন চমৎকার, রীতিমতো থ্রিলিং। সবাই কত এনজয় করছিল। আমি একেবারে বোকা বনে গেছি।'

অনিমেষ জোর দিয়ে বলল, 'আমি বলছি ও খারাপ নয়, তবে একটা ভয়ের কথা আগেও বলত।'

'খারাপ বা ভালো এসব নয়। সবসময় কাউকে একটা ভয় পেয়ে কুঁকড়ে আছে। সেটা কী, নিজেই বোঝে কিনা জানে না।'

শর্মিলা বলল, 'ওর একটু ভূতের ভয় আছে, সেইজন্যই বোধ হয় কেউ দেখতে...

সিদ্ধান্ত বলল, 'বেরিয়াল গ্রাউন্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিব্যি আর ভূতের ভয় কেভ-এর মধ্যে, যেখানে গাইডসহ অতগুলো লোক একসঙ্গে?'

'তুমি কী করবে ঠিক করেছ?' অনিমেষ জানতে চাইল।

'ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্বাভাবিক করে নিতে পারব। কিন্তু দু-একদিন ধরে এমন এমন কথা বলছে, কী বলব?'

'কি বলছে?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইল শর্মিলা।

'বলছে আমি তো বেশিদিন বাঁচব না। ক'দিন পালিয়ে থাকব? আমি মরে গেলে তুমি আমাকে কাচের গাড়িতে নিয়ে যাবে না কেমন?'

'সে কী? সদ্যবিবাহিতার মুখে এ কেমন কথা?'

'আরও আছে। একদিন বলল, আমাকে ইলেকট্রিক চুল্লিতে পোড়াবে না।

আমি বললাম, 'এসব কী বলছ, মরবে কেন তুমি? হাসিমুখে উত্তর দিল, একদিন না একদিন তো মরব। তুমি আমাকে চিতায় দাহ করবে কথা দাও। এরপর আমি আর থাকতে পারিনি। চলে এসেছি আপনাদের কাছে। ও কবে থেকে এরকম, সত্যি বলুন।'

BanglaBook.org

অনিমেষ স্বীকার করল, 'ইছামতী একটু ভীতু আমরা জানি। কিন্তু তুমি যেমন বলছ সে রকম জানি না। ওকে একটু ডাক্তার দেখালে হয় না?'

মাথা নাড়ল সিদ্ধান্ত, 'ডাক্তার দেখানো হয়েছে, সব কিছু নর্মাল।'

'তাহলে আমরা কী করতে পারি বলো?'

শর্মিলার অধৈর্য দেখে সিদ্ধান্ত হার মানল না, কেবল বলল, 'ওকে একজন সাইক্রিয়াটিস্ট দেখাব। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। ওকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। বলব, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি।'

'আমার মেয়ে পাগল নয় বাবা।' অনিমেষ কঁকিয়ে উঠল।

'পাগল তো বলিনি আমি। তবে কোথাও একটা অসুবিধা ওর আছে, আর সেটা ওর মনের মধ্যেই আছে। শারীরিকভাবে ও স্বাভাবিক, একজন স্বামী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমারও ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করছে।' শর্মিলা দৃঢ় কণ্ঠে জানাল।

## পাঁচ

একদিন নয়, তিনদিন মনোচিকিৎসক ইছামতীর সঙ্গে মিট করলেন। বুঝে বা না বুঝে ইছামতী সহায়তাই করল। ও বোধ হয় নিজেও পরিত্রাণ চাইছিল একটা অস্বাভাবিক ভয় থেকে। প্রথম প্রথম রাজি হয়নি কিন্তু ও যা কাউকে বলতে পারেনি, এই ডাক্তার আঙ্কলকে সেটা বলতে পেরেছে।

ডাক্তার মুখার্জি টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। টেবিলের এদিকে সিদ্ধান্ত, শর্মিলা আর অনিমেষ। পাশের রুমে ইছামতী। একবার ইছামতী বলেছিল, 'আমি কি বাইরে যাব, আপনারা কথা বলে নিন।'

'কোথাও যেতে হবে না, বসো।' বাকিদের দিকে তাকালেন মুখার্জি, 'আপনাদের সবাইকে ডেকে এনেছি কারণ কথাটা একসঙ্গে সবাইকে বলব।'

শর্মিলার চোখে জল দেখে ডাক্তার হেসে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, এত নার্ভাস কেন?' মাথা নাড়ল শর্মিলা।

'শুনুন, ইছামতী একটি মিষ্টি মেয়ে। ও একটুও অস্বাভাবিক নয়। ওর মধ্যে শুধু একটা ডিসঅর্ডার আছে, একে বলে ক্লসট্রোফোবিয়া। যে কোনো বদ্ধ বা আটকা জায়গায় থাকতে ভয় পায়। সেই আতঙ্ক থেকে মনে হয় কেউ

BanglaBook.org

তার গলা টিপে ধরেছে। কিংবা তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। কেউ তাকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলছে। নানা কল্পিত কাহিনী তৈরি হয়ে যায় মনের মধ্যে। খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অস্বাভাবিক আচরণ করে। কিন্তু ব্যাপারটা কিছু নয়। এটাকে একধরনের স্নায়ুরোগ বলতে পারেন। যে-কোনো মানুষের হতে পারে। ডাক্তারি ভাষায় এটাকে ফোবিক নিউরোসিস বলে।'

'ওষুধ দিন ওকে ডাক্তারবাবু। যাতে একেবারে সেরে যায় ও।'

শর্মিলার দিকে তাকালেন ড. মুখার্জি, 'ম্যাডাম, ফোবিয়া এমনই একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার যে এর কোনো ওষুধ নেই। আপনারাই ওর ওষুধ।'

'মানে?' সিদ্ধান্ত অবাক হল একটু।

'মানে ওর ওপর বিরক্ত না হয়ে ওকে বোঝাতে হবে। কাউন্সেলিংই এর সবচেয়ে বড় ওষুধ। জোর করবেন না, ধীরে ধীরে অভ্যাস করাবেন। আর ইছামতী, তোমাকেও একটু চেষ্টা করতে হবে। প্লেনটা খারাপ নয়। সিটের ওপরে যে অক্সিজেন নব আছে সেটা নিজের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। নিজেকে বোঝাতে হবে, মিথ্যেই ভয় পাচ্ছ।'

'লিফ্‌ট-এ চড়তে ভয় পায় ও।' শর্মিলা বলে উঠল।

'লিফ্‌ট-ওর প্রবলেম নয়, বদ্ধ লিফ্‌ট ওর আতঙ্ক তৈরি করে। ইছামতী, মনে মনে ভাববে, এত লোক নিরাপদে যাচ্ছে, আমিও যাব। এই তো এখনই নেমে যাব।'

'যদি লিফ্‌টটা খারাপ হয়ে যায়? মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়?' ইছামতী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'তাতে কি? এমার্জেন্সি বেল আছে, টিপে ধরবে। ফোন করবে। কোথাও থেকে না কোথাও থেকে সাহায্য এসেই যাবে। দু-চারবার ভয়টা জয় করতে পারলে মনে জোর এসে যাবে। আমি ওষুধও কিছু দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে ভয়টাকে। সবাই তোমার পাশে আছে। সবাই তোমায় সাহায্য করবে।'

ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্ত বলল, 'চল আমরা আজ লিফ্‌ট-এই নামি। আমরা সকলে আছি তোমার সঙ্গে, ভয় কিসের? তাছাড়া এই তো মাত্র তিনটে তলা, হুশ করে নেমে যাব।'

BanglaBook.org

'কি দরকার? সিঁড়ি দিয়েও তো নামা যায়।' মাথা নেড়ে বলল ইছামতী।

শর্মিলা বলল, 'জীবনে আরও কত জায়গায় যাবি, কত বড় বড় অফিস, বড় বড় হোটেল। সব জায়গায় তুই একা একা সিঁড়ি দিয়ে নামবি? একটু বোঝার চেষ্টা কর।'

'অনেক জায়গাতেই ওপেন লিফ্‌ট থাকে, সে সব জায়গায় আমার অসুবিধে নেই।'

'নিজের মনের সঙ্গে জোর দেখিয়ে একটু একটু করে যদি অভ্যাস না করিস তাহলে তো কোনোদিনই তোর ভয় কাটবে না মা।'

বাবার কথার উত্তর দিতে গিয়ে ইছামতী একটু ব্যাকুল হয়ে পড়ল, 'তোমরা জানো না, দেখতে পাও না, বদ্ধ ঘরের সিলিং থেকে ওয়াল থেকে কার যেন দুটো হাত বেরিয়ে এসে আমার টুঁটি টিপে ধরে। দম আটকে যায় আমার।'

সিদ্ধান্ত বউয়ের হাত ধরল, নরম করে বলল, 'বেশ, যখন একা থাকবে তখন চেষ্টা করতে হবে না। আজ আমরা সবাই আছি, একটু চেষ্টা করে দেখো। আমরা তো তোমাকে খনি দেখাতে নিয়ে যেতে চাইছি না, সামান্য তো লিফ্‌ট। দেখো, আজই হয়তো তোমার ভয় ভেঙে যাবে। আর তুমিই তখন সবচেয়ে খুশি হবে।'

ওরা লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়াল। আর তার দরজাটা খুলে যেতেই ইছামতীকে নিয়ে ভেতরে চলে এল। অনিমেষ বাটন টিপতেই লিফ্‌ট-এর দরজা বন্ধ হয়ে চলমান হল সেটা। ভেতরে ইছামতী চোখ বড় বড় করে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ওর চারপাশে কে আছে সেটাও যেন ভুলে গেল। সিদ্ধান্তর পিঠে মুখ গুঁজে সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরল ওকে আর চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি নামব, নেমে যাব এখান থেকে। ভীষণ ভয় করছে আমার। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

BanglaBook.org

# ভয় ধরানো সেই সাড়ে তিন ঘণ্টা

জয়ন্ত দে

আমার এ কাহিনী বছর পনেরো আগের। সে সময়টা আমার জীবনের এক অদ্ভুত সময়। যেতে চাইছি একদিকে, চলেছি অন্যদিকে। কিন্তু বার বার যেভাবেই হোক আমি পিছলে গিয়েও, পড়ছি না। ভাগ্যের কোনো না কোনো সহায়তায় আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। সে সময়ের কথা এখন ভাবলে মাঝে মাঝেই আমার রাতের ঘুম নষ্ট হয়। অদ্ভুত সব ভয় আমার ভেতর নাড়া দিয়ে ওঠে। মনে হয় আর একটু, আর একটু হলেই আমি কোথায় তলিয়ে যেতাম। আমার

BanglaBook.org

জীবনে অমন কঠিন সময় আমি কখনো কাটায়নি। আমার বাবা যখন মারা যান, আমি তখন সদ্য কলেজ ছেড়েছি, বাড়িতে ছোট দুটি বোন, মা আর আমি। একটা চাকরির জন্যে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি। তখনো আমি এতটা বিভ্রান্ত ও হতাশ ছিলাম না। কিছু একটা করে ফেলব এই আশা ছিল। কিন্তু আটানব্বই থেকে দু হাজার পাঁচ-ছয় পর্যন্ত আমি এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায় মধ্যে দিয়ে হেঁটেছি। এই পর্বের প্রথম দিকে মারাত্মক এক প্রতারণার ফাঁদে ফেঁসেছি। চারপাশ থেকে পুরনো বন্ধুবান্ধব সরে গেছে। প্রতারণার ফাঁস কেটে বের হওয়ার জন্যে আমি নিজের জীবনযাত্রা পালটে, বিশ্বাস অবিশ্বাস ভালোমানুষী ছেড়ে নতুন নতুন বন্ধু জুটিয়েছি, টিকে থাকার লড়াই লড়েছি। আমার এই নতুন বন্ধুরা বেশিরভাগই সোজা পথের নয়। সাধারণ পাবলিকের মতো হলেও এরা আঙুল বাঁকিয়ে জীবন থেকে বাঁচার রসদ খোঁজে। এরা আমাকে উঠে দাঁড়ানোর সাহায্য করেছিল। আমি সারাজীবন ধরে এদের কাছে কৃতজ্ঞ। সে সময়কার আমার সমস্ত লেখার মধ্যে এদের কথা বার বার এসেছে। এদের অসামাজিক কাজকর্ম মন থেকে মেনে না নিলেও, আমি স্পষ্ট গলায় আপত্তি করিনি। তবে 'এটা ঠিক না' এ কথাটা মৃদু গলায় কখনো কখনো জানিয়েছি।

তবে হ্যাঁ, তাতে তারা কখনো বিরূপ হয়নি, কেননা সমস্ত টিমের মাথাদের কাছে ততদিনে আমার একটা স্বচ্ছ ইমেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়াও ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেই ভাগ্যের সাহায্য আমি পেয়েছি বার বার। নাহলে এতদিনে, পৃথিবীর আলো বাতাসে আমি এমন করে থাকতাম না। অথবা জেলের পাঁচিলের ওপার থেকে বার কয়েক আমার ঘুরে আসা হত। যাই হোক সে সব অন্য গল্প! সেখানেও অনেক ভয়, অনেক আতঙ্ক ছিল। তবু আমার লেখায় সেসব কথা তুলব না। কেন না সেসব কথাগুলো নেশার মতো শুরু করলে থামতে পারব না। আমি শুধু একটা ভ্রমণ কাহিনীর সাড়ে তিন ঘণ্টার কথাই বলব।

এই ভ্রমণে আমরা ছিলাম মোট তেরো জন। কিন্তু আজব ব্যাপার একজনের হদিস আমার স্মৃতি আজ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। এদের মধ্যে একজন শ্রমিক আন্দোলনের নামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আর বাদবাকি সবাই প্রোমোটিং-এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এদের মধ্যে দু চারজন সরাসরি নানা ধরনের পেশী শক্তির মানুষজন। জনা দুয়েক তো এলাকার ত্রাস! এরা ঘুরে বার

BanglaBook.org

দুয়েক ট্রেকিং করত। আমিও ওদের সঙ্গী হয়েছি। এদের মধ্যে তিন চারজন সত্যি সত্যি ট্রেকার। যারা পাহাড়কে ভালোবাসে। নিয়মিত পাহাড়ে যায়। আর বাদবাকি সব হয় নিছক ভ্রমণপিপাসু, নয় হুজুগের শিকার। এদের সবার মধ্যে আপাত মিল থাকলেও দু একজন ঘোঁট পাকানোর লোকও ছিল। দু-এক কথায় দলটির চরিত্র না বললে সবটা বোঝা যাবে না।

আমরা ট্রেনে বার বসিয়েছিলাম। মদ আসর থেকে ট্রেনে ধরা পড়ি, পুলিশকে ম্যানেজ করে ছাড়া পেলেও আমাদের দামি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত হয়। পরে অবশ্য পুলিশের তরফে কম দামি বোতল 'গিফট' করা হয়। পুলিশের ওপর সেই রাগে আমার এক সহযাত্রী বন্ধু রাতে ট্রেনের চেন টেনে দেয়। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

আমি ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসিনি। তাই যাত্রাপথের কোনো বর্ণনা দেব না। সরাসরি ঘটনাস্থলে চলে যাই। সেবার আমরা গিয়েছিলাম পঞ্চকেদার।

আমরা হরিদ্বারে নেমে প্রথমে জিপে হেলাং চলে যাই। আমরা পঞ্চকেদার শুরু করেছিলাম কিছুটা হলেও উলটো পথ দিয়ে। প্রথমে যাব কল্পেশ্বর, সেখান থেকে রুদ্রনাথ। তারপর মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, কেদারনাথ হয়ে বাস ধরে বদ্রিনাথ। মাঝে একদিন দেওরিয়াতালও গিয়েছিলাম।

আমরা ট্রেন থেকে নেমে জিপ ধরে হেলাং পৌঁছেছিলাম দুপুর দুপুর। ওখানেই একটা ছোট হোটেলে ছিলাম। সেখানে খাবার জায়গা নেই। খাবার বাইরে। চারদিকে খুব একটা হাঁটারও জায়গা নেই। পরের দিন আমরা কল্পেশ্বর যাব। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম ব্রেকফাস্ট করে। উরগ্রাম, দেবগ্রামে গিয়ে পৌঁছালাম দুপুরের আগেই। ন কিলোমিটার রাস্তা। চড়াই উৎরাই আছে, তবে তা কোথাও তেমন কষ্টদায়ক নয়। হৈ হৈ করতে করতেই পৌঁছে গেলাম। বিকেলের দিকে গিয়ে দর্শন করে এলাম কল্পেশ্বর শিবকে। চা খেলাম বাঙালি সাধুবাবার গুহার মুখে বসে।

পরেরদিন আমাদের যাত্রা রুদ্রনাথের পথে। এই পথে আমরা গিয়ে থামব ডুমকে। যাত্রাপথ প্রচণ্ড চড়াই উৎরাইয়ে ভরা। মাঝে থাকার একটা ছোট জায়গা আছে। কিন্তু আমরা সেখানে থামব না। আমরা যাব ডুমক। তারপরের দিন সেখান থেকে তোলি তাল হয়ে পানার। সেখানে রাত কাটিয়ে পরেরদিন যাব রুদ্রনাথ।

BanglaBook.org

আমরা ডুমক আসার জন্যে কল্পেশ্বর থেকে একজন গাইড নিয়েছিলাম। সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে কোনো টেন্ট ছিল না। এ পথে দরকারও পড়ে না। ঠিক মতো হাঁটলে, আর প্রকৃতি বিরূপ না হলে সন্ধের মুখে মুখে থাকার জায়গায় চলে যাওয়া যায়। আমরা হাঁটা শুরু করলাম সকালে, ব্রেকফাস্ট করে।

সাধারণত কল্পেশ্বর হয়ে ডুমক দিয়ে কেউই রুদ্রনাথ যায় না। যারা এ পথে আসে তারা সবাই স্থানীয় মানুষজন। আর কিছু বিদেশি ট্রেকার। সবাই কল্পেশ্বর দর্শন করে হেলাং নেমে আসে, তারপর সেখান থেকে বাস বা গাড়ি ধরে বদ্রিনারায়ণ চলে যায়। আমাদের সবকিছুই ছিল উলটো, কল্পেশ্বর দিয়ে শুরু করেছি।

কল্পেশ্বর থেকে ডুমক বারো কিলোমিটার রাস্তা। সময় লাগে আট ঘণ্টার মতো। এটা আমরা জেনে এসেছিলাম। কাগজপত্রে তেমনটিই লেখা ছিল। কিন্তু বাস্তবে যেন হিসেব মিলল না, আমাদের ধারণা হয়েছিল ওই পথ কম করে চোদ্দো পনেরো কিলোমিটার হবে। সেই রাস্তা পেরোতে সময় লেগেছিল প্রায় দশ থেকে বারো ঘণ্টা। রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ। আমাদের টিমের প্রথম যারা পৌঁছেছিল তাদেরই সময় লেগেছিল দশ ঘণ্টার মতো।

ওখানে গিয়ে দেখলাম আমাদের জন্যে গরম জল থেকে খাবার ব্যবস্থা সব করা আছে। আমাদের মধ্যে দুজনের শরীর বেশ কাহিল। বাদবাকি সবাই আধ ঘণ্টা রেস্ট নিতেই মানসিকভাবে চাঙ্গা। খেয়েদেয়ে ঘুম দিলেই ফিট হয়ে যাব। পরের দিন যাব পানার। আমরা আসার আগেই শুনে এসেছিলাম ডুমক থেকে পানার ভয়ঙ্কর কঠিন রাস্তা। বরং পানার থেকে রুদ্রনাথ পর্যন্ত ষোলো কিলোমিটার অনেক সহজ।

সকালে সবার ঘুম ভাঙল। কাহিল দুজনেও অনেকটা সামলে নিয়েছে। ওদের আর একটু সময় দিলে ভালো হয়। এখান থেকে আমাদের আর কোনো গাইড নেই। গাইডের সঙ্গে ডুমক পর্যন্তই কথা হয়েছিল। সেইমতো তাকে ছেড়ে প্রথম টিম রওয়ানা হয়ে গেল। ওরা গেল ছ'জন। আমরা সাতজন রয়ে গেলাম। ঠিক হল ঘণ্টাখানেক পর আমরা ব্রেকফাস্ট করে বের হব।

সেভাবেই ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা বের হলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেক

BanglaBook.org

হাঁটার পরেই শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। এত জোর বৃষ্টি যে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। প্লাস্টিকের বর্ষাতি নিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। অগত্যা সুবিধেজনক একটা জায়গা দেখে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখানেও প্রায় ঘণ্টাখানেক আটকে আমরা। বৃষ্টি থেমে ঝকঝকে রোদ উঠলে আবার হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের টিমের কাহিল দুজন আরো কাহিল হয়ে পড়েছে। ওদের নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে তোলি তালে এসে পৌঁছালাম।

এখানে একজোড়া বুড়ো বুড়ি আছে, তাঁরা পাথরের ঘর করে থাকেন। তাঁরা এখানে গোরু ভেড়া পালন করেন। আমরা সেই শেপার্স হাটে চা খেলাম। কাহিল দুজনকে শুশ্রূষা করা হল। কিন্তু তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তাদের মধ্যে একজনের ধুম জ্বর, আর একজন পা নাড়াতে পারছে না। তখন শেপার্স হাটের সেই বৃদ্ধ মানুষটা আমাদের বললেন, অসুস্থ দুজন এখানে একদিন রেস্ট নিক। কাল সুস্থ হয়ে গোপেশ্বর নেমে যাবে। এদের আর পানারের দিকে না যাওয়াই ভালো। কষ্ট করেও ওদিকে নেমে গেলে দিন তিনেকের রেস্ট পাবে। তাতে ওরা সুস্থ হয়ে উঠবে। ওরা গোপেশ্বর থেকে মণ্ডলে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আগের টিম অনসূয়া হয়ে মণ্ডলে নামলে আবার সবাই একসঙ্গে হব।

তখন ঠিক হল অসুস্থ দুজনকে একা ছাড়া যাবে না। অসুস্থ দুজনে বলল, ওরা এখানে থাকবে না। ওরা গোপেশ্বরেই নেমে যাবে। ওদের সঙ্গে একজন থাকলেই হবে। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের পুরো দলটাই ভেতর ভেতর ঠিক করে ফেলেছে তারাও নেমে যাবে গোপেশ্বরে। আমি পড়ে গেলাম একা। আমি যদি রুদ্রনাথ যেতে চাই তবে আমাকে একাই যেতেই হবে।

অথচ আমার মন চাইছে আমি রুদ্রনাথ যাব। এতটা পথ এসে ফিরে যাব—মেনে নিতে পারছিলাম না। আমাকে শেপার্স হাটের সেই বৃদ্ধ মানুষটি সাহস জোগালেন—বললেন, টান টান সোজা রাস্তা, জঙ্গল পার হলেই পানার দেখতে পাবে। নরম ঘাসের বুগিয়াল ধরে হাঁটলেই ওখানে শেপার্স হাট। ওখানে দুজন মেষপালক আছে, খাওয়া থাকার কোনো অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ওখানে আমাদের প্রথম টিমের সদস্যরাও থাকবে।

অগত্যা আমি একা রুকস্যাক পিঠে তুলে সোজা রাস্তায় পানার অভিমুখে হাঁটা দিলাম। তোলি তালে নীল স্বচ্ছ জল, গাঢ় নীল আকাশ আর

BanglaBook.org

নরম ঘাসের রাজ্য পার করেই দেখলাম পায়ে হাঁটা পথ ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে।

জঙ্গল তেমন ঘন নয়। বরং আগের দিন আমরা দেবগ্রাম থেকে ডুমক আসার পথে আরো ঘন জঙ্গল পার হয়েছি। চারদিকে পাইন, ফার, ওক, ঝাউয়ের দঙ্গল। একটাই পথ। মানুষের পায়ে চলার নিশানা আছে। সেই নিশানা ধরেই হাঁটছি। নিশানা বলতে কোথাও পাথর রেখে দিক নির্দেশ করা হয়েছে, কোথাও লজেন্স বিস্কুটের কাগজ রেখে দেওয়া। দু এক জায়গায় পথের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু সেখানে রাস্তার মাঝে গাছের ডাল পোঁতা বা পর পর পাথর রাস্তার ওপর সাজিয়ে রাখা। মানে ওদিকে যেতে মানা। খুব কনফিডেন্সের সঙ্গে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতেই হাঁটছিলাম। এরই মধ্যে চড়াই শুরু হল। চড়াইয়ের চরিত্রটা অদ্ভুত বড় বড় পাথর পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। আর মাঝে মাঝে পথ আটকে বিশাল বিশাল গাছ। এভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমার হঠাৎ মনে হল, আমি যেভাবেই হোক ভুল দিকে যাচ্ছি।

অগত্যা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথ বুঝে নিয়ে ফেরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বুঝলাম আমার আসার পথটাও উবে গেছে। সহজ কথায় আমি জঙ্গলে হারিয়ে গেছি। এরপর সবটাই আন্দাজ। আন্দাজে আন্দাজে ঘুরছি। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে আওয়াজ দিচ্ছি, যদি আশেপাশের কেউ শুনতে পায়। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ দিশাহীন ভাবেই সামনে এগোনোর চেষ্টা করছি। আমি রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে এরপর যেখানে এসে পড়লাম, সেটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি। চারদিকে বিশাল বিশাল গাছ। আমার পায়ের নীচে তাদের বহুবিচিত্র ফল পড়ে। আর যেখানে আমি পা দিয়েছি সেখানে বহু যুগ ধরে পাতা পড়ে পড়ে পচে পচে পা রাখার জায়গা তৈরি হয়েছে। যেন স্পঞ্জ পাতা।

তারমধ্যে চারদিকে আঙুলে লতানে গাছ। গাঢ় আর ঝাঁঝাল সবুজের গন্ধ।

এই পাতা পচা জঙ্গল ছেড়ে আমি কিছুতেই আগের সেই বড় বড় পাথুরে জায়গায় যেতে পারছি না। তখন আমার মন থেকে পানার রুদ্রনাথ সব মুছে গেছে। শুধু মনে হচ্ছে যেভাবেই হোক, একটা পাথর দিয়ে ক্রশ করা রাস্তা বা রাস্তার মাঝে গাছের ডাল পোঁতা আছে এমন জায়গায় ফেরত যেতে হবে। সেখান থেকে আমি প্রয়োজনে তোলিতে ফিরে যাব। বারোটা বাজার একটু আগে আমি তোলি ছেড়েছিলাম, এখন ঘড়িতে প্রায় দুটো।

BanglaBook.org

আমি থেমে নেই, মাঝে মাঝেই চিৎকার করছি—কই হ্যায়, কই হ্যায়! হেল্প হেল্প!

এর বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার কেমন ভয় পাওয়া শুরু হল। আর ভয়টা বুক থেকে লাফিয়ে উঠতেই গলা শুকিয়ে কাঠ। পিঠের বোঝা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। চারদিকে জাফরি কাটা আলো। ভয়ের সেই রূপ রস গন্ধ এখনো আমি চোখ বন্ধ করলে টের পাই। চারপাশে পচপচে পাতা পচা জঙ্গল। বড় বড় গাছগুলো টান টান উঠে গেছে। সে গাছগুলোর এক একটার কাণ্ড দু'জন দু'হাতের বেড় দিয়েও ধরতে পারবে না। গাছগুলোর গায়ে ভিজে শ্যাওলা, অচেনা অজানা করে দিয়েছে। ফলে আমার সামনে শুধু শ্যাওলার দেওয়াল। আমি সেইদিন শ্যাওলা ধরা গাছ আর শ্যাওলা পড়া বিশাল বিশাল পাথর দেখতে দেখতে 'ভয়াল' শব্দটার মানে বুঝেছিলাম।

জঙ্গলের ভেতর সূর্যের আলোও ভালো করে ঢোকে না। কোথাও যেন আলো নিভেও গেছে। হঠাৎই দেখলাম আমার হাতে জোঁক ধরেছে। সেটাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। কেন না এখন কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে রাখব কোথায়? চারপাশের মাটি থেকে পুট পুট করে জোঁক লাফাচ্ছে। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে। তাদের গায়ের ধূসর রং যেন বিভীষিকা মাখানো! ব্যাগের ভেতর ছুরি আছে, নুন আছে। কিন্তু তা বের করার কোনো উপায় নেই। এর মধ্যে দেখলাম আমার কনুইয়ের কাছেও একটা জোঁক রক্ত খেয়ে ফুলে ফেঁপে ঝুলছে। সেটাকেও আমি ছাড়াতে পারলাম না। আমি পাগলের মতো গাছের দেওয়াল পেরিয়ে বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ খুঁজছি। সেদিন 'দুর্ভেদ্য'র আসল মানেটা কী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

চলতে চলতে একটা সরুমতো পথও পেলাম, সেটা নিচের দিকে নেমে গেছে। মনে হল এই পথে ঘোড়া যায়। কেন না ঘোড়ার মল পড়ে আছে। সবই আমার মনে হচ্ছে, কোনোটাতেই নিশ্চিত নই। সেই পথে একটুখানি এগিয়ে আবার অন্য কথা মনে হল, এটা পথ নয়—ঢাল। আমি কোনো খাদের কিনারের দিকে চলেছি। আমি একটা গাছের শিকড় ধরে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলাম, দুটো চল্লিশ টল্লিশ হবে। চারদিকে বেশ কালো করে আসছে। বলতে বলতে তুমুল বৃষ্টিও শুরু হল।

পাহাড়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দুটো থেকে তিনটে সাড়ে তিনটের

BanglaBook.org

মধ্যে একটা বৃষ্টি হয়। কিন্তু ওইসময় দাঁড়িয়ে, আমি সব তত্ত্বই ভুলে গেছি। আবার বৃষ্টি, আমার পথ খোঁজার সময় নষ্ট। এত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা, যেন মনে হচ্ছে পাথর ঝরছে। এদিকে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেও দাঁড়াতে পারছি না। আমার পায়ের নিচের ভিজে পাথরও সড়সড় করে জলের তোড়ে ধুয়ে যাচ্ছে। আমি তখন টের পাচ্ছি, এখান থেকে ফেরার আশা আমার আর নেই। একবার পা ফসকালেই সামনের খাদে চলে যাব। গাছের শিকড়টা শক্ত হাতে ধরে আছি। কিন্তু শিকড়টাও আলগা হয়ে আসছে। বৃষ্টিতে একটুও নড়ার উপায় নেই। চারদিক সাদা। শুধু পায়ের তলা দেখছি, কোথায় পা রাখব তার হিসেব করছি। এভাবে চলল বেশ কিছুক্ষণ। বৃষ্টি থামল। চারদিক ফাটিয়ে রোদ উঠেছে। এই রোদ আমি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা আমার গায়ে এসে পড়ছে না। আমি ভিজে জবজবে হয়ে গেছি। সাধারণ প্লাস্টিকের বর্ষাতিতে এই পাহাড়ি বৃষ্টি মানানো যায় না। আর কিছুক্ষণ লাগল আমার ঢাল থেকে উঠে আসতে। তখন আর আমার চিৎকার করার মতো শক্তিটুকু নেই। অসহায় হয়ে পড়েছি, প্রাণশক্তিও ফুরিয়ে গেছে। অবসন্ন হয়ে পা ফেলতে পারছি না। পিঠের রুকস্যাক আমাকে দুমড়ে দিচ্ছে। কেন একা একা গাইড ছাড়া অবস্থায় এই জঙ্গলে ঢুকতে গেলাম? কেন সকালেই প্রথম দলের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম না? এখন সাড়ে তিনটে বাজে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলে অন্ধকার নামবে। বন্য জন্তু, বিশেষত ভালুকের হাত থেকে আমি বেঁচে ফিরতে পারব না।

তিনদিন পরে যখন আমাদের দুটি দল মণ্ডলে এসে মিট করবে, তার আগে কারো কাছেই আমার কোনো খবর থাকবে না। বাড়ির লোকের কথা ভাবছি, বাড়িতে দু বছরের ছেলে, ওর মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে। দরদর করে দু চোখ দিয়ে জল বের হচ্ছে। এরমধ্যেও আমি থেমে থাকিনি। একটু পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা দেখলেই সেখান দিয়ে এগিয়ে গেছি। ক্রমশ আলো কমে আসছে। কিন্তু জঙ্গলের বাইরে প্রচুর আলো আছে নিশ্চয়ই। কেননা যখনই আকাশ দেখছি, চকচক করেছে। আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি, শেষ শক্তি দিয়ে নিজেকে বলেছি, বসব না, বসলে আর হাঁটতে পারব না। এগিয়ে চলো—যেদিকে হোক।

এভাবে এগোতে এগোতে হঠাৎই আমার সামনে ঘোড়া নিয়ে একজন

BanglaBook.org

মানুষকে দেখলাম—ঠিক আমার চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে। আমি ওকে দেখেই বুঝি—এবারের মতো বেঁচে গেছি আমি। প্রথমেই তাঁকে আঁকড়ে ধরে জানাই—আমি পানার যাব, পথ হারিয়ে ফেলেছি। সে আমার কথা শুনে মাথায় হাত দেয়।

আমি ব্যাগটা পিঠ থেকে ফেলে দিই মাটিতে। ব্যাগের ভেতর থেকে কোল্ডড্রিঙ্কস বের করে খাই। কিছু ওয়েফার বিস্কুট খাই। ওকেও দিই। একটু ধাতস্থ হয়ে বলি—কী করব? সে আমাকে জানায় আমি সম্পূর্ণ উলটো দিকে তিন চার কিলোমিটার চলে এসেছি। এদিকে জঙ্গল হি জঙ্গল। পানার একদম উলটো দিকে। সে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। আমি চলে যেতে পারব। আমি রাজি হই না। আমি তার হাতে পায়ে ধরি, বলি, আমাকে পানার পৌঁছে দাও, নইলে তুমি যেখানে যাচ্ছ আমাকে সেখানে নিয়ে চল। তারপর সেখান থেকে আমি হয় গোপেশ্বর, নয় অন্য কোনোদিকে গাড়ির রুটে নেমে যাব। মণ্ডল বা গোপেশ্বরে গেলে আমার দলের লোকজনদের পাব। লোকটা কিছুতেই পানার যেতে রাজি হয় না। ও গিয়েছিল কোনো এক পাহাড়ি গ্রামে খবর দিতে। সেখান থেকে ফিরছে। এটা ওর শর্টকাট। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ও জঙ্গল পেরিয়ে এক বুগিয়ালের দিকে নেমে যাবে। ওখানে মিলিটারিদের টিনের চালা বানানো আছে, সেখানে থাকবে। কাল সকালে ফিরবে। আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ও আমাকে বোঝাতে চাইল, এদিকে গেলে আমার মণ্ডল পৌঁছাতে আরো দুদিন লাগবে। তারচেয়ে কষ্ট করে যখন এসেছ রুদ্রনাথই ঘুরে এসো। কিন্তু তখন আমার আর রুদ্রনাথ দর্শনের ইচ্ছে নেই। নিরাপদ জায়গায় ফিরতে পারলেই বাঁচি! আমি ওকে বললাম, একা আমি কিছুতেই পানার যাব না। তুমি আমাকে পানার ছেড়ে দিয়ে এসো। যা টাকা চাও দেব।

সে জানাল, ঘোড়ার দানাপানি শেষ, তার ওপর তার নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের একটা নখ হোঁচট খেয়ে উড়ে গেছে। এ অবস্থায় সে আর ওদিকে যাবে না। আমি ব্যাগ থেকে ওষুধ বের করে তার পায়ে লাগালাম। ব্যান্ডেজ করে দিলাম। তখন দেখলাম সে আমার ওষুধের বাক্সের দিকে চকচকে চোখে দেখছে। সে বলল, জ্বর জ্বর আসছে। ওকে একটা প্যারাসিটামল দিলাম। আমার নিজের হাতের জোঁক ধরা জায়গায় ওষুধ

BanglaBook.org

লাগাতে গেলাম। ও ওষুধ লাগাতে বারণ করল, জোঁক ধরা জায়গায় বিড়ির পাতা আটকে দিল। আমার পায়ে তখন দুটো জোঁক বসে। ও বিড়ির পাতা গুঁজে আর ছুরি দিয়ে খুব কায়দা করে সেগুলো ছাড়াল। আমি ওকে বললাম, তুমি যেখানে গিয়ে রাত কাটাবে, সেখানে তোমার ঘোড়ার দানাপানি পাবে না। তুমিও খাবার পাবে না। তারচেয়ে পানার চলো, ওখানে শেপার্স হাটে তোমার ঘোড়ার দানাপানি মিলে যাবে। আমারও রুদ্রনাথ দর্শন হবে।

হঠাৎ লোকটা রাজি হয়ে গেল। বলল, 'চলো।' ঘোড়ার পিঠে আমার রুকস্যাক উঠল। চললাম পানার।

আমরা পানার পৌঁছালাম রাত সাড়ে আটটায়। সবাই আমাকে একা দেখে অবাক। ওদের আর জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম না। আমি তখন কথা বলার মতো অবস্থাতেও ছিলাম না। কিছু খাবার চাই, খাবার। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

তোলির বৃদ্ধ মানুষটি ঠিক কথাই বলেছিলেন। শেপার্স হাটে আমরা সবাই সে রাত কাটালাম। খুব ছোট ঘর। পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে বানানো। ঘরে দরজার মুখে আগুন জ্বালানো। শুনলাম পাহাড় থেকে একটা ভেড়া পড়ে মারা গেছে। তার কিছুটা মাংস কিনেছে আমার বন্ধুরা। রাতে সেই মাংসের ঝোল ভাত হল। ঘোড়াও শেপার্স হাটে দানাপানি পেল। লোকটাকে সকালে টাকা দিতে চাইলাম, নিল না। সে ওষুধ চাইল। আমরা তাকে আলাদা আলাদা কাগজে মুড়ে মূলত জ্বর ও পেট খারাপের ওষুধ দিলাম। কিছু টাকাও দিলাম জোর করে। ভোরবেলা আমরা চললাম রুদ্রনাথের দিকে, আর ও চলল ওর গ্রামের দিকে।

পানার থেকে রুদ্রনাথ ষোলো কিলোমিটার পথ। আমরা রুদ্রনাথ থেকে অনসূয়া হয়ে সরাসরি মণ্ডলে এসে নামি।

আবার আমরা সবাই একসঙ্গে। শুধু আমার মনে রয়ে যায়, জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া, ভয় ধরানো সেই সাড়ে তিন ঘণ্টা!

BanglaBook.org

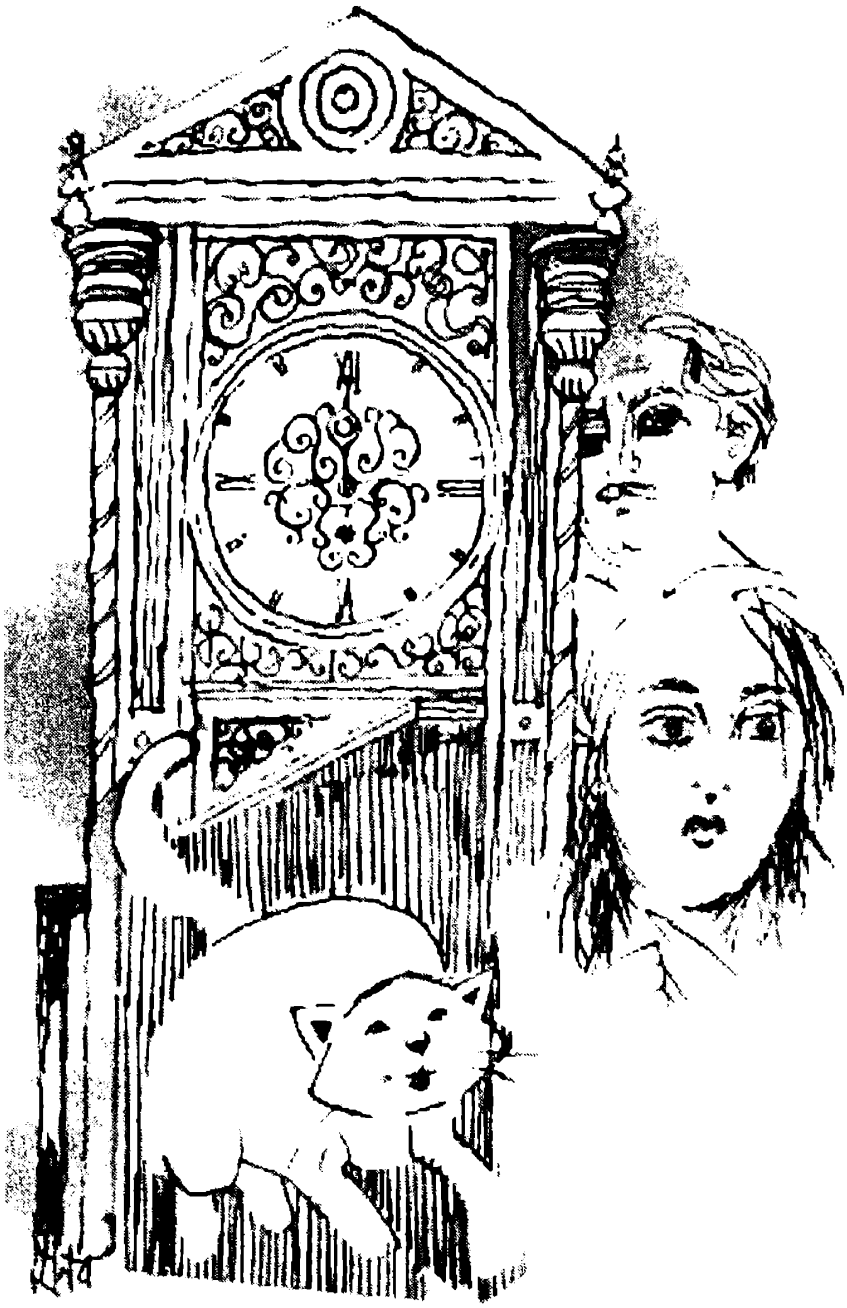

# টিক্-টক্

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

## এক

ঘড়িটা দেখতে ভারি অদ্ভুত! মেহগনি কাঠের জগদ্দল চেহারার প্রায় ছ'ফুট লম্বা ঘড়ি। বাদামি মসৃণ দেহের চারপাশে সোনালি বর্ডার। প্রস্থেও কিছু কম নয়। ডায়ালটাও বিচিত্র! বিরাট গোলাকৃতি ডায়ালের ভেতরে সোনালি-রুপোলিতে লতাপাতার কারুকাজ। কতগুলো ডিজাইনের খপ্পরে এমন জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে সংখ্যাগুলো যে চট্ করে সময় উদ্ধার করা দুষ্কর! নীচে কাচের চতুষ্কোণ অংশে সোনালি পেন্ডুলাম মন্থর ভঙ্গিতে দুলছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত।

এতবড় ঘড়ি দিয়ে কী করত সাহেবগুলো ভগবানই জানেন! ঘড়ি তো নয়, আস্ত আলমারি! ওদের বিটকেল শখগুলো বোঝার ক্ষমতা বেশিরভাগ লোকেরই নেই। হাতে গোনা যে কয়েকটি লোক এই অদ্ভুত শখগুলোর মর্মার্থ বোঝেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের মণিকাকু। তাঁর আবার আদ্যিকালের জিনিসপত্র কেনার খুব শখ! যত রাজ্যের ভারী ভারী ভিক্টোরিয়ান আসবাবপত্রে ঘর ভরিয়ে রেখেছেন। এ বাড়িতে ঢুকলেই মনে হয়, ভুল করে কোনো জাদুঘরে ঢুকে পড়েছি বুঝি। অথবা ফ্ল্যাশব্যাকে ইংরেজ আমলে চলে গিয়েছি। মণিকাকুর এই জাতীয় শখে কাকিমা যথারীতি বিরক্ত! কথায় কথায় একদিন বলেই ফেললেন—'এ বাড়িতে তো দেড়শো- দুশো বছরের কমবয়সী কোনো জিনিসই নেই! তাও আবার খাঁটি ইংরেজ স্টাইলের। তা এতই যখন ইংরেজ প্রীতি, তখন বিয়ে করার সময়ে দুশো বছরের একটি ইংরেজ পাত্রী জোগাড় করতে পারলে না? ল্যাটা চুকত!'

মণিকাকুর নিস্পৃহ জবাব—'সে চেষ্টা করিনি ভাবছ? পার্কস্ট্রীটের গোরস্থানে গিয়ে অনেকবার খুঁজে দেখেছি। কিন্তু কোনো মেমসাহেবের প্রেতাত্মাই এই 'নিগারের' প্রতি ইন্টারেস্ট দেখালেন না! অগত্যা...!'

বলাইবাহুল্য কাকিমার বিরক্তিও কাকুকে থামাতে পারেনি। প্রতি বছরই তিনি কিছু না কিছু জিনিস দিব্যি আমদানি করে চলেছেন। বসার ঘর থেকে

BanglaBook.org

মাস্টার বেডরুম অবধি সবকিছুই প্রায় ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক জিনিসপত্তরের ম্যাও সামলানোও যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা কাকু প্রথম টের পেলেন যখন টেলিফোনটা বিগড়ে গেল। রিসিভার তুললে প্রায়ই ডায়ালটোনের বদলে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ভাগ্যক্রমে যদি বা কখনো লাইন লেগেও যায় উলটোদিকের কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হয় যে বক্তার নির্ঘাত হুপিং কাশি হয়েছে!

বাধ্য হয়েই ফোন সারাই করার উদ্যোগ নিতে হল। যে ভদ্রলোক টেলিফোন ঠিক করতে এসেছিলেন, তিনি টেলিফোনের চেহারা দেখে প্রায় ভির্মি খেয়ে পড়েন আর কি! যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বিষম খেয়ে বললেন—'এটা...! এটা ক্‌ক্‌...ক্ষী!'

মণিকাকু সবিনয়ে জানান—'আজ্ঞে টেলিফোন। এটা অবশ্য পুরনো মডেলের রিসিভার। আসলে এটা হ্যামিলটন সাহেবের বাড়ির ফোন। বহুবছর আগে...!'

তিনি হয়তো রিসিভারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝাতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ভদ্রলোক মুখ লম্বাটে করে বললেন—'আজ্ঞে, আমায় মাফ করুন। আমি টেলিফোন ঠিক করতে পারি—শিলনোড়া নয়!'

কী মর্মবিদারী ডায়লগ! অমন শখের ঐতিহাসিক রিসিভারকে শিলনোড়া বললে মন ভেঙে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমরা সবাই ভেবেছিলুম, হয়তো কাকু এই ট্র্যাজেডির পর ক্ষান্ত দেবেন। কিন্তু আমাদের ভাবনার ওপরে কয়েক গ্যালন জল ঢেলে কয়েকদিন পরেই তিনি এই জগদ্দল চেহারার ঘড়িটি আমদানি করলেন।

'এই ঘড়িটার নাম কী জানিস্?' কাকু সগর্বে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'টিক্ টক্!'

'টিক্ টক্!' আমি অবাক—'এ আবার কী জাতীয় নাম! ঘড়ির নাম আবার এরকম হয় নাকি!'

'হয়...হয়...জানতি পারো না'। কাকু হেসে বললেন—'হিস্ট্রি আছে। একেবারে যাকে বলে রোমহর্ষক ইতিহাস!'

আমার দিদি মুখটা পাঁপড় ভাজার মতো করে বলল—'প্লিজ, ফের বানিয়ে বানিয়ে কোনো ভূতের গল্প বলবে না। এর আগে বলেছিলে, ও

BanglaBook.org

ঘরের খাটটা যে মেমসাহেবের ছিল, তিনি নাকি আজও প্রতি রাতে নিজের পালঙ্কটা দেখতে আসেন। সেই গল্প শুনে বোন ওই পালঙ্কে শুয়ে সে রাতে ঘুমোতেই পারেনি! এসব ভুলভাল গল্প বলে বেচারিকে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়?'

'আমি ভুলভাল গল্প বলি?' কাকু গাল ফুলিয়েছেন—'আচ্ছা বেশ, বলব না!'

এমন সুন্দর একটা গল্প শুরু হওয়ার আগেই গেল ভেঙে! এমনিতেই আমার স্বভাব হিন্দি হরর্ ফিল্মের নায়িকাদের মতো। ভয়ও পাব, আবার সব কিছু দেখা বা শোনাও চাই। তাই প্রতিবাদ করলাম—'মোট্টেও না। আমি একটুও ভয় পাই না। কাকু, তুমি বলো।'

কাকু সোৎসাহে বললেন—'আচ্ছা। তবে নিজের দায়িত্বে শুনবি কিন্তু। নয়তো তোর দিদি বলবে আমি ভুলভাল গল্প বলে তোকে ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়'।

'কিচ্ছু বলবে না। তুমি বলো।' আমি রীতিমতো আব্দার ধরে বসেছি। দিদি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়—'ধ্যুৎ! ফের গাঁজাখুরি গল্প শুরু হবে। তুই একাই শোন্। আমি বরং...!'

আর কিছু বলার আগেই আচমকা 'খ্যাঁও' করে একটা আর্তচিৎকার! আমি ভয় পেয়ে কাকুকে প্রায় জাপটে ধরেছি! দিদিও লাফ মেরে সরে গিয়েছে। কিছু বোঝার আগেই দেখলাম একটা সাদা উলের বল বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে যাচ্ছে!

'জো-বি-স্কো! বাঁদর কোথাকার!' দিদি রেগে লাল—'একদিন এটাকে আমি ঠিক গলা টিপে মারব! কথা নেই, বার্তা নেই, যেখানে সেখানে লেজ পেতে শুয়ে থাকবে। আরেকটু হলেই লেজ মাড়িয়ে দিতাম...!'

এবার ঘটনাটা বোঝা গেল। বাঁদর নয়, জোবিস্কো কাকুর পোষা বিড়ালের নাম। আমি অনেক ধরনের বিড়াল দেখেছি, কিন্তু এমন বজ্জাত বিড়াল কখনো দেখিনি। জোবিস্কো নিজের লেজটাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। সে অন্যান্য বিড়ালদের মতো সোফায়, বিছানায় বা আলমারির মাথায় উঠে বসে থাকে না। বরং যে রাস্তা দিয়ে লোকজন বেশি যাতায়াত করে ঠিক সেখানেই লেজটি পেতে দিয়ে শুয়ে থাকাই ওর স্বভাব।

BanglaBook.org

ভাবটা এমন, একবার শুধু ন্যাজে পাটা দিয়ে দ্যাখ্। তাপ্পর দেখাচ্ছি কী হয়...!

আমি আর দিদি ছাড়া আমাদের বাড়ির এমন কেউ বাকি ছিল না যে এ বাড়িতে বেড়াতে এসে অন্তত একবার জোবিস্কোর আঁচড় কামড় খায়নি। এমনকি কাকিমাও তার ফাঁদে, থুক্কু...লেজে ভুল করে পা দিয়ে ফেলেছিলেন! এবং জব্বর কামড়ও খেয়েছিলেন। কাকিমা রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বহুবার জোবিস্কোকে পগারপার করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাকুর জন্য পারেননি।

'আহা, অমন বলিসনি।' মণিকাকু জোবিস্কোর প্রতি পরম মমতায় বললেন—'অবোলা জীবটাকে গলা টিপে মারার কথা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না! শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার যে কী যন্ত্রণা, তা মর্মে মর্মে না বুঝলেও খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। যেদিন থেকে টিক্-টকের গল্প শুনেছি, সেদিন থেকে তো আরো বেশি...!'

আমি বিরক্ত হয়ে বলি—'খালি ভণিতাই করবে, না গল্পটাও বলবে?'

'শুনবি?' তাঁর চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে—'আচ্ছা, শোন্ তাহলে'।

## দুই

'এই ঘড়িটা একসময়ে জর্জ মাউন্টফোর্ড নামের এক সাহেবের ছিল'।

কাকু সিগারেটে আয়েশ করে একটান মেরে বললেন—'সে বহুবছর আগেকার কথা। ১৮৫৭ সাল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ক্রমাগত চতুর্দিকে লেলিহান শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মীরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি তখন জ্বলছে। ভারতীয় সেপাইরা তখন সাদা চামড়া দেখলেই হয় গুলি করছে, নয়তো কুপিয়ে মারছে বা মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভেবে কূল পাচ্ছে না কীভাবে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহকে থামাবে! বিশেষ করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাই ছিল সেপাইদের টার্গেট। একের পর এক সাহেবদের কুঠিতে আক্রমণ চালাচ্ছে বিদ্রোহীরা। কিছু সাহেব সপরিবারে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। কেউ পারল না।

জর্জ মাউন্টফোর্ড তখন বিহারে ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারেন। নিজেকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা ছিল

BanglaBook.org

না। কিন্তু তাঁর সুন্দরী স্ত্রী অ্যাডেলাইন, শিশুপুত্র জ্যাক ও কন্যা ক্লারার জীবনও বিপন্ন। সিপাহীরা কাউকে রেয়াত করবে না। তাই তলে তলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু পালাবার সময় পেলেন না। এক অভিশপ্ত রাতে ভারতীয় সেপাইরা তাঁর কুঠি আক্রমণ করল! চাকর-বাকররা কে কোথায় পালাল কেউ জানল না! মাউন্টফোর্ড ছিলেন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাকাবুকো কর্মচারী। তিনি একাই রাইফেল নিয়ে সিপাহীদের মোকাবিলা করতে চলে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে প্রিয় পুত্র ও নাবালিকা কন্যাকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেলেন। তিনি ছাড়া একমাত্র তাঁর স্ত্রী অ্যাডেলাইনই জানতেন যে জ্যাক আর ক্লারা কোথায় আছে। কিন্তু ক্ষিপ্ত সেপাইরা দুজনকেই কচুকাটা করে, কুঠি লুটপাট করে চলে গেল।'

কাকু চুপ করে কিছুক্ষণ সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়ার রিং বানাতে লাগলেন। আমি তখন চোখ গোলগোল করে গল্প শুনছি। কোনোমতে বললাম—'তারপর?'

'তারপর আর কী?' তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'সাহেবের দাসদাসীরা পালিয়ে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ভগ্ন কুঠিতে ভয়ের চোটে আর কেউ ফিরে গেল না। বিলাসবহুল কুঠিটা জনমানবহীন বিধ্বস্ত শ্মশানের মতো পড়ে রইল। শুধু সাহেবের এক অতিবিশ্বস্ত কাজের লোক ছিল, আগাথা! না, ঠিক কাজের লোক বলা যায় না তাকে। আসলে সে জ্যাক আর ক্লারার ধাত্রী। প্রাণ হাতে করে সে চব্বিশ ঘণ্টা পরে গোপনে ফিরে গেল কুঠিতে। মনে এই অসম্ভব অথচ ক্ষীণ আশা ছিল, যদি জ্যাক এবং ক্লারা কোনোমতে রক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু আগাথা গোটা কুঠি তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পেল না তাদের। ভগ্ন মনোরথ হয়ে যখন ফিরে আসছে, তখনই আচমকা শুনতে পেল এই ঘড়ির ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে! কেউ যেন প্রাণপণে ঘড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে! মৃদু ধাক্কার সঙ্গে আঁচড়ের শব্দও পেল সে। কেউ যেন পাগলের মতো আঁচড় কাটছে ঘড়ির গায়ে!

আগাথা অতি সন্তর্পণে কান পাতল ঘড়ির গায়ে। কিন্তু যা শুনল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে যায়। কে যেন ঘড়ির ভেতর থেকে ক্ষীণ স্বরে বলে চলেছে—'টিক টক্, টিক্ টক্...টিক্ টক্'!

BanglaBook.org

সে বিস্মিত হয়ে দেখল ঘড়ির বাইরের অংশে একটা ছোট্ট আংটা লাগানো আছে। সহজে চোখে পড়ে না। ঘড়ির গায়ের বাদামি রঙের সঙ্গেই বার্নিশ করে দেওয়া হয়েছে আংটাটাকে। ফলে সেটা আপাত অদৃশ্য। সম্ভবত সিপাইদের চোখেও পড়েনি। সে আংটাটাকে ধরে টানতেই ঘড়ির গায়ে একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেল। এই দ্যাখ, একদম এই ভাবে...!'

বলতে বলতেই ঘড়ির গায়ের সেই আংটা ধরে টান মারলেন কাকু! সঙ্গে সঙ্গেই যেন খুলে গেল একটা ছোট্ট দরজা। বিস্ময়াবিভূত হয়ে দেখলাম, ওই জগদ্দল দশাসই ঘড়ির নীচের অংশটা ফাঁপা! রীতিমতো গুপ্ত কুঠুরীর মতো একটা ফাঁপা জায়গা আছে সেখানে। একটা আস্ত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চেহারার মানুষ না ঢুকতে পারলেও, ছোটখাটো চেহারার নাবালিকা বা একজন শিশু অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারে সেখানে। অর্থাৎ এটাই সেই গোপন জায়গা, যেখানে মাউন্টফোর্ড সাহেব জ্যাক আর ক্লারাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন!

'মাউন্টফোর্ড সিপাইদের হাত থেকে পুত্র-কন্যাকে বাঁচিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাবেননি ওই স্বল্প পরিসর জায়গায় কতক্ষণ তারা বদ্ধ হয়ে বাঁচতে পারবে! সঠিক সময়ে ওদের উদ্ধার না করলে যে ওই ঘড়িই তাঁর পুত্র-কন্যার জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে তাড়াহুড়োর মাথায় এ সম্ভাবনা মনে আসেনি। এবং যা হবার তাই হয়েছিল। দমবন্ধ হয়ে শিশুপুত্র জ্যাক অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তার বরফ শীতল কঠিন মৃতদেহ কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্লারা! একটু অক্সিজেনের জন্য হাঁকপাক করতে করতে সে শুধু শুনতে পেয়েছিল ঘড়ির টিক্ টক্ শব্দ! এক একটা সেকেন্ড চলে যাচ্ছে, আর নাবালিকা প্রতীক্ষা করে যাচ্ছে এই গুপ্ত দরজা কখন খুলবে! এক একটা মুহূর্ত কাটছে, আর সে আশা ক্ষীণ হচ্ছে! ঘড়ির টিক্ টকের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার লড়াই করছে সে। চোখের সামনেই নিঃশ্বাস নিতে না পেরে ততক্ষণে মারা গেছে ভাই জ্যাক! সে বুঝতে পেরেছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আয়ুও শেষের পথে যাচ্ছে! শেষপর্যন্ত সময়ের শব্দই অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় পাগল করে তুলেছিল তাকে!

আগাথা দরজাটা খুলে দিতেই ভিতর থেকে ক্লারার অবসন্ন দেহ ঢলে

BanglaBook.org

পড়ল তার বুকে। মেয়েটা ততক্ষণে জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। তার মুখ নীল! মৃত্যুযন্ত্রণায় হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ। কোনোমতে শুধু উচ্চারণ করল অন্তিম দুটো শব্দ—'টিক টক্!'

তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করলেন। এক অদ্ভুত মনখারাপ করা নীরবতা নেমে এল কিছুক্ষণের জন্য। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কাকু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার ওপরে আলতো করে হাত রাখলেন—'সেই থেকেই এই ঘড়িটার নাম 'টিক্-টক্'। আর এই দ্যাখ, এখনো পাল্লায় আঁচড়ের দাগগুলো রয়ে গিয়েছে...!'

সত্যিই এখনো সেখানে নখের আঁচড়ের দাগগুলো সুস্পষ্ট হয়ে জ্বলজ্বল করছে!

রাতে ঘুম আসছিল না! বারবার মনে পড়ছিল হতভাগ্য জ্যাক আর ক্লারার কথা। মাউন্টফোর্ড সাহেব আর তাঁর স্ত্রী'র মৃত্যু বরং অনেক সহজে হয়েছিল। বড়জোর কয়েকমুহূর্তের মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু সেই শিশু আর নাবালিকার কপালে যে এমন ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত মৃত্যু লেখা ছিল তা কে জানত!

আমি মনে মনে ভাবছিলাম ক্লারার কথা! কত বয়েস ছিল তার? বড়জোর দশ বা বারো! কেমন দেখতে ছিল সে? কল্পনায় তার চেহারাটাও দেখতে পাচ্ছিলাম। আইভরির মতো স্নিগ্ধ গায়ের রঙ। একঢাল কোঁকড়ানো সোনালি চুল! বার্বি ডলের মতো অবয়ব! চোখদুটো ঘন নীল! টুকটুকে গোলাপি ঠোঁটদুটোতে মায়াবী হাসি মাখানো! সেই মেয়ে একটা অন্ধকূপের মধ্যে বসে প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যুর প্রহর গুনছিল! চোখের সামনে শিশু ভাইটা দমবন্ধ হয়ে ধড়ফড় করে মারা গেল, অথচ কিচ্ছু করার নেই! কী অসহায়! তার প্রাণহীন দেহটাকে কোলে নিয়ে জীবন্ত সমাধির ভেতরে বসে আছে সে। কেমন লেগেছিল তার? কী ভেবেছিল ক্লারা? দম নিতে পারছে না। একটু বাইরের হাওয়ার জন্য পাগলের মতো হাঁকপাক করছে। প্রাণপণে অন্ধকূপের দরজায় ধাক্কা মারছে, উন্মত্তের মতো আঁচড়াচ্ছে! একটা জীবিত, পরিচিত মানুষের কণ্ঠ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে এই আশায়, যদি কেউ

BanglaBook.org

এই অন্ধকূপ থেকে তাকে উদ্ধার করে। অথচ কানের কাছে শুধু একটাই শব্দ—টিক্‌টক্, টিক্‌টক্, টিক্‌টক্! শব্দ নয়, মৃত্যুর পদধ্বনি!

ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা পড়ল। চিন্তায় চিন্তায় মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। গলাও শুকিয়ে গিয়েছে। অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠে গেলাম ডাইনিং রুমের দিকে। একটু ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল না খেলে চলছে না! কী কুক্ষণে যে জ্যাক আর ক্লারার গল্প শুনতে গিয়েছিলাম! দিদি ঠিকই বলেছিল। মণিকাকুর গল্প না শুনলেই বোধ হয় ভালো হত...!

এসব ভাবতে ভাবতেই আপনমনে ডাইনিং রুমের দিকে চলেছিলাম। আচমকা একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসতেই থমকে গেলাম! এ কি! এ কীসের আওয়াজ! কেমন খড়খড় শব্দ! তার সঙ্গে অস্ফুট গুমগুম! যেন কেউ দরজার পাল্লায় ধাক্কা মারছে।

আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে? সদর দরজায়? এত রাতে কে আসবে? মণিকাকুর ঘরের দিকে তাকাই। সে ঘরের দরজা খোলা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভিতর থেকে নাইট বাল্‌বের নীলাভ আলো চুঁইয়ে আসছে বাইরে। আমাদের ঘরের দরজা এইমাত্রই খুলে এসেছি। অতএব কারোর ধাক্কা মারার প্রশ্নই নেই! তবে? আমি কি ভুল শুনছি?

উৎকর্ণ হয়ে চুপচাপ আওয়াজটা শোনার চেষ্টা করি। নাঃ, মনের ভুল নয়। সত্যিই শব্দটা শোনা যাচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম হলঘর থেকেই ধাক্কা মারা ও আঁচড়ানোর শব্দ আসছে। আর ওই ঘরেই রাখা আছে সেই বিখ্যাত ঘড়ি! টিক্‌টক্! জ্যাক আর ক্লারার জীবন্ত সমাধি...!

মুহূর্তের মধ্যেই মনে হল গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছে! আওয়াজটা যেন ক্রমাগতই বাড়ছে। আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই। মনে হচ্ছে হাত-পা গুলো ক্রমাগতই ভারী হয়ে উঠছে। এ যেন আমার হাত-পা নয়! যেন অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে আমায়।

সম্মোহিতের মতো এসে দাঁড়ালাম হলঘরে। আমি আর ঘড়িটা একদম মুখোমুখি! আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই! স্পষ্ট বুঝতে পারছি ধাক্কা মারার ও আঁচড়ানোর শব্দ ওই ঘড়ির চোরাকুঠুরির ভেতর থেকেই আসছে! এখন আরো জোরালো! অনেক বেশি সুস্পষ্ট! কে আছে ওর ভেতরে? তবে কি জ্যাক আর ক্লারা এখনো মুক্তি পায়নি ওই মৃত্যুকূপ থেকে! আজও

BanglaBook.org

শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণায় আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে মরছে! আমি কে? আমার ভূমিকা কী? সেই গভর্নেস আগাথার জায়গায় তবে কি আজ আমিই এসে দাঁড়িয়েছি! যার হাতে ওই চোরাকুঠুরির দরজা খুলবে!

বুকের ভিতর থেকে আচমকা আওয়াজ এল টিক্ টক্, টিক্ টক্! হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বলে চলেছে—টিক্ টক্, টিক্ টক্, টিক্ টক্...! ঘড়ির পেন্ডুলামটা প্রবল ব্যঙ্গে তাল মারছে—টিক্ টক্ টিক্ টক্...! ঘড়ির চোরাকুঠুরির ভেতর থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল—'টিক্ টক্...টিক্ টক্...টিক্ টক্...! চতুর্দিকে...দেওয়াল—ছাত ফুঁড়ে ভেসে আসছে শুধু একটাই শব্দ—'টিক্ টক্...টিক্...টক্...টিক্ টক্...!'

...আমার অসহ্য লাগছে! না, এ শব্দ শুধু শব্দ নয়! জাগতিক আওয়াজ তো নয়ই...! হয়তো অন্য কোনো দুনিয়া থেকে ভেসে আসছে! এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দ্যোতনা!...এ শব্দ মৃত্যুযন্ত্রণারই আরেক নাম! মনে হল দু কান চেপে ধরি! কিন্তু আওয়াজ থামছে না! চোরাকুঠুরির দরজায় খড়খড় আঁচড়ের আওয়াজ ক্রমাগতই বাড়ছে। গুমগুম করে কে যেন দরজা পিটছে! দমবন্ধ মুহূর্তের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রাণপণ ধাক্কা মারছে! প্রচণ্ড শক্তিতে দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে সে!

হঠাৎ মনে হল, চারপাশের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শ্বাসরোধ করে ফেলছে আমার! এত বড় হলঘরটা কবে এত ছোট হয়ে গেল! পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিসে যেন পিঠ ঠেকে গেছে। আমি এগোতে পারছি না, পিছোতেও পারছি না! টের পেলাম, দরদর করে ঘামছি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! ফুসফুস দুটো পাথরের মতো ভারী! শরীর শিথিল হয়ে আসছে। আমিও কি ক্লারার মতোই অন্ধকূপে বন্দী? শুধু শুনতে পাচ্ছি ঘড়ির কুঠুরির দরজায় প্রবল ধাক্কা পড়ছে! আর সব কিছু মিলিয়ে যেতে যেতে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে খেলা করে বেড়াচ্ছে একটাই অমোঘ শব্দ—

'টিক্ টক! টিক্ টক্! টিক্ টক্!'

যেটুকু শক্তি দেহে বাকি ছিল তা জড়ো করে কোনোমতে চেঁচিয়ে উঠি—'কাকু—উ-উ-উ-উ!'

মুহূর্তের মধ্যে দুড়দাড় করে মানুষের ছুটে আসার শব্দ! হঠাৎ করে হলঘরের আলো জ্বলে উঠল। খড়খড় আওয়াজটা আরো বাড়ছে। আমি

BanglaBook.org

প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম! কে যেন ধরে ফেলল। দিদি! আবছা চোখে দেখলাম মণিকাকু থমকে দাঁড়ালেন ঘড়িটার সামনে! ভীত সন্ত্রস্ত চোখে কাকিমার দিকে তাকাচ্ছেন। অর্থাৎ শব্দটা তাঁর কানেও গিয়েছে। কাকিমার মুখও ফ্যাকাশে!

কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত! তারপরই কাকু এগিয়ে গেলেন ঘড়ির দিকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরাকুঠুরির দরজা খুলে দিলেন তিনি...আর সঙ্গে সঙ্গেই...!

'ম্যাঁও!'

একটা সাদা উলের বল আর্তনাদ করে, লম্ফ মেরে বেরিয়ে এল চোরাকুঠুরির ভেতর থেকে। তারপর এমনই পাঁই পাঁই করে দৌড় মারল, যেন তাকে ভূতে তাড়া করেছে!

মণিকাকু লাফ মেরে উঠে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন—'হতভাগা জোবিস্কো! আরেকটু হলেই বাড়িসুদ্ধ লোকের হার্টফেল হচ্ছিল! শয়তান বিড়াল কোথাকার! কালই যদি তোকে কান ধরে বাড়ি থেকে বের না করেছি...!'

নাঃ, জ্যাক বা ক্লারা নয়, এ সব জোবিস্কোরই কীর্তি! যখন মণিকাকু দরজাটা খুলে গল্প বলায় মগ্ন ছিলেন, আর আমি শুনতে শুনতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম সেই সুযোগেই জোবিস্কো সুট্ করে ঢুকে পড়েছিল চোরাকুঠুরির ভিতরে। মণিকাকু সেটা লক্ষ্য না করেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা বলাই বাহুল্য। আচমকা আটকা পড়ে বিড়াল মশাই হতভম্ব! প্রথমে বুঝতে পারেননি ঘটনাটা কী ঘটেছে! যখন হৃদয়ঙ্গম হল তখন সেখান থেকে বেরোবার জন্য দরজায় ধাক্কা, এবং আঁচড় দুই-ই তিনিই মারছিলেন। বাদবাকি ভৌতিক পরিবেশটা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক-প্রসূত!

এরপরও অনেকবার গিয়েছি মণিকাকুর বাড়ি। ঘড়িটা, অর্থাৎ টিক্‌টক্ এখনো সেখানে আছে। তবে এরপর মণিকাকু আর কোনো ঐতিহাসিক জিনিস কেনেননি। জোবিস্কোও ওই একরাতের ধাক্কাতেই সোজা হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো বেয়াদবি করেনি।

সবই ঠিক। শুধু একটা কথা আজও কাউকে বলিনি! সে রাতে এক

BanglaBook.org

ভিনদেশী অসহায়, ভীত, মৃত্যুপথযাত্রী নাবালিকার যন্ত্রণা সামান্য হলেও টের পেয়েছিলাম আমি! কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও এক ইংরেজ আর এক ভারতীয় মেয়ের অনুভব এক হয়ে গিয়েছিল।

আজও সেই অদেখা হতভাগিনী মেয়েটার জন্য সহানুভূতি রয়ে গিয়েছে মনের এক কোণে।

তাই ক্লারাকে আজও ভুলিনি। ওকে ভোলা যায় না।

আর একটা ঘটনা আমার আজও মনে লেগে আছে। ঘড়ির ভেতর থেকে টিক্ টক্ শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম আমি। জোবিস্কোর পক্ষে ওই শব্দটা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, তাহলে কি আমি ভুল শুনেছিলাম! না অন্য কিছু...।

BanglaBook.org

# রক্তের গন্ধ

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল রাতে রঞ্জু খুন হয়েছে। ওর নতুন বাড়িতে ঢুকে আততায়ীরা খুব কাছ থেকে পরপর চারটে গুলি করে। খবরটা যখন সকালে প্রভাতভূষণ সমাদ্দারের কানে এসে পৌঁছল তখন উনি ওর বারান্দায় বসে

সবে খবরের কাগজের পাতাটা খুলে ধরেছেন। হাত চারেক দূরে ওর মেয়ে নূপুর কোমরে ওড়না বেঁধে ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে নাচের রিহার্সাল দেওয়াচ্ছে। কাল সন্ধেবেলা ওদের ওই ছড়ানো শান বাঁধানো উঠোনেই পারিবারিক উদ্যোগেই করা ছোটখাটো একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মিউজিক সিস্টেমে বাজছে—ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়। ফুটফুটে বাচ্চাগুলো তালে তালে নাচছিল। মৃদু হাওয়া বইছিল কচি নিম পাতার মাথাগুলোকে দুলিয়ে।

খবরটা প্রভাতবাবুর সর্বাঙ্গে জোরাল একটা ঝাঁকি দিয়ে গেল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। বুকের ভেতরটা মোচড় মেরে উঠল, হু হু করে উঠল সবটা জুড়ে। 'স্যার...' বহু চেনা সেই ডাক আর সেই হাসি হাসি মুখটা ছলকে উঠল যেন রক্তে—চোখের ঢাকনা নামিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। গুটিয়ে নেওয়া দৈনিকটা ধরে থাকা ডান হাতটা কাঁপছে—বারান্দার হেলানো চেয়ারটায় পিঠ ঠেকিয়ে উনি শরীরের ভার ছেড়ে দিলেন। 'এ কী করে মেনে নেওয়া সম্ভব—ওইরকম জলজ্যান্ত একটা ছেলে—চল্লিশের কোঠাও ছোঁয়নি!' শুকনো গলা আটকে এল।

খবর বাহক শিবনাথ দত্ত, ওর প্রাক্তন স্কুলের ক্লার্ক কিছুটা অবাক—'কেন কাল রাতে গুলির শব্দ শোনেননি? লোকগুলোর মুখে গামছা জড়ানো ছিল, কাজ সেরে গলির মুখে দাঁড় করানো ট্যাক্সি চেপে হাওয়া। হাইরোডের ধারে এইসব এলাকায় কে আর কাকে ধরতে, পারে বলুন। তারপর তো ওর নতুন বাড়ির সামনে লোক ভেঙে পড়েছিল, মাঝরাত থেকে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ।'

প্রভাত সমাদ্দার মনে করার চেষ্টা করলেন—'শব্দ শুনেছিলাম বটে, ভেবেছিলাম আপ্যায়ন লজে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাজি ফাটছে। আজকাল তো বিয়েবাড়িতে মাড়োয়ারি কায়দায় কত ধরনের সব বাজি ফাটানো হয়। হ্যাঁ তাই তো, শব্দগুলো তো অন্যরকম ছিল। তাহলে ওগুলো...!' উনি মাথায় হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন— 'সারা গায়ে কী একটা র‍্যাশ মতো বেরিয়েছে, কাল রাতে অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ খেয়ে ঝিমোতে ঝিমোতে তাড়াতাড়ি ঘুম এসে গিয়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙল দেরি করে। ওদিকে এত কাণ্ড...!'

BanglaBook.org

কানে আসা গানটা বড্ড নির্ভার, এইরকম মানসিক অবস্থার পক্ষে চরম অস্বস্তিকর—তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়। প্রভাতবাবু গলা উঁচিয়ে প্রায় চিৎকার করে মেয়েকে গানটা বন্ধ করতে বললেন। নূপুর আশ্চর্য হয়ে বাবার দিকে তাকাল, চকিতে রিমোট টিপে গান থামিয়ে এদিকে আসতে আসতে বলল—'কেন কী হয়েছে বাবা?'

—'খুব বাজে একটা খবর, রঞ্জু আর নেই—কারা সব কাল রাতে চড়াও হয়ে...।'

—'কী বলছ? সে কী?' নূপুর থমকে দাঁড়াল নিথর স্ট্যাচুর মতো। তলার ঠোঁটটা মৃদু কাঁপছে—হাতটা এসে থামল মুখের ওপর। ও ঢোক গিলল, কণ্ঠনালী কাঠ—'কাল বিকেলেও তো রঞ্জুদাকে দেখলাম, একটা ছেলের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে বিডিও অফিসের দিকে যেতে, আমাকে দেখে হাত নাড়ল। ভাবতেই পারছি না, কী করে হল—মাথা কাজ করছে না বাবা! সকালে বাচ্চাগুলোর গার্ডিয়ানরা ওদের পৌঁছতে এসেছিল —ওদের মুখেও কিছু শুনলাম না।'

—'ওদের বাড়ি তো সব এইদিকে। তাছাড়া আজকাল খুন জখমের ঘটনা সব মানুষের কাছে জলভাত হয়ে গেছে—সকাল সকাল ওসব কথা বলতে আর কার ভালো লাগে? যে গেল সে তো গেলই—বলে আর কী হবে—বলে বেড়ালে সে তো আর ফেরত আসবে না।'

ফুসফুস খালি করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রভাতভূষণ, চেয়ারের চ্যাটালো হাতলে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন— 'যাই একবার ওদিকটায় ঢুঁ মেরে আসি—চোখের দেখা একবার—চলো শিবু...!'

—'আরে বসেন বসেন—এখন গিয়ে কী করবেন? বডি তো পুলিশ নিয়ে গিয়েছে—পোস্টমর্টেম না করে এদিকে ছাড়বে নাকি? বডি বাড়ির সামনে এলে ছেলে ছোকরা পতাকা ফতাকা নিয়ে মিটিং মিছিল করবে মনে হয়। পার্টির লোকজন কি একটা কিছু হুল্লোড় না করে ছাড়বে?'

শিবনাথ খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বলে।— 'না না বডি দেখতে কে যাবে?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রভাতভূষণ—'না না—বডি কে দেখতে চায়—ওকে ওই অবস্থায় কী করে দেখব বল তো—কী করে তাকাব? একটা ওরকম টগবগে তরুণ তুর্কি রাতারাতি বডি হয়ে গেল, কী করে মেনে নেওয়া

BanglaBook.org

যায় বল তো? ওর যে ছবিটা চোখে লেগে আছে সেটাই থাক না—ওইটেই থাক না। না না আমি ওসব বডি ফডি দেখতে পারব না, শুধু ওর ওই নতুন বাড়িটার ধারে কাছে একটা টুঁ মেরে চলে আসব। তুমি কি এই ফাঁকে আমার সঙ্গে একটু যাবে শিবু—একখান চক্কর মেরেই চলে আসব।'

—'চলেন—আমাকে তো ওই পথেই বাজারে একবার যেতেই হবে।' শিবনাথ উঠে দাঁড়ায়।

ভেতরের ঘরে ঢুকে প্রভাতভূষণ তখন গায়ে পাঞ্জাবিটা গলাচ্ছেন, নূপুর থমথমে মুখে চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে এসে ওর দিকে—চোখ ছলছল করছে—ফিসফিসিয়ে বলল—'খবরটা দিদিকে জানাব নাকি...?'

—'না না প্রশ্নই ওঠে না, সুস্থ মানুষকে কেন খামোখা ব্যস্ত করা? খবরদার যেন লুকিয়ে চুরিয়ে ফোন করে বসিস না, খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে। কাল পরশু খবরের কাগজের ওসব টুকরো খবরে চোখ পড়লে যদি নিজে থেকে ফোন করে আলাদা কথা, অবশ্য ব্যাঙ্গালোরে ওদের ওদিকে বাংলা কাগজ পৌঁছয় কি?' মুহূর্তে বিচলিত দেখায় প্রভাতবাবুর মুখ—'বাইচান্স কোনোভাবে খবর কানে গেলে কী আর করা যাবে, না হলে কিন্তু একদম না। কেন পেটে কি কোনো কথা থাকে না?' চোয়াল শক্ত করে গুমরে ওঠেন প্রভাতভূষণ।

—'না না, মানে এমনি বলছিলাম আর কী...।' নূপুর দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

চিন্তিত মুখে বাড়ির সদর-গেট দিয়ে বেরোনোর সময় ডান হাতের ঝাঁকড়া নিম গাছটার দিকে চোখ চলে গেল অজান্তেই। অনেকদিনের গাছ—এখন গুঁড়িটা যত মোটা চিরকাল তো আর এমনটি ছিল না। আচমকা কী যেন হল—মাথার ভেতর অচেনা কোনো প্রকোষ্ঠে ছলকে উঠল পঁয়ত্রিশ বছর আগের ফ্যাকাশে কয়েক টুকরো ছবি। এই গাছটার তলাতেই টিউবওয়েলের সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে এক জগ্গর এঁটো থালা বাটি গেলাস নিয়ে উবু হয়ে বসে নারকোলের ছোবড়া ডলে বাসন মাজছে এক কুড়ি একুশ বছরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী মহিলা, হাত দুয়েক দূরে পাতা একটা চটের বস্তার ওপর বসে তোবড়ানো বাটি থেকে মুড়ি চিবোচ্ছে বছর তিনেকের এক শিশু, চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল লাগানো, ফোলা ফোলা দু গাল বরাবর

BanglaBook.org

চোখের জলের রেখা ওই কাজল ধুয়ে নেমে আসার চিহ্ন স্পষ্ট। বাচ্চাটার কোমরে বাঁধা দড়ি যেটার অপর প্রান্ত বাঁধা রয়েছে ওই নিম গাছেই। মহিলা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের আঁচল নেড়ে নেড়ে ওড়ানোর চেষ্টা করছে ছেলের মুড়ির বাটিতে এসে বসা নাছোড়বান্দা কিছু ভনভনে মাছি।

সুমিত্রা নামের ওই মহিলা তাড়াহুড়ো করছে—ওকে এ বাড়ি কাজ সেরে আরো দু বাড়ির ঠিকে কাজ সারতে যেতে হবে। ওর না ফেরা পর্যন্ত ছেলেটা বাঁধা থাকবে ওখানেই—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপ বাড়বে বিষের মতো কিন্তু কিছু করার নেই। ওই সব বাড়ি কাজ সেরে এসে মা আর ছেলে দুপুরের ভাত খাবে এই বাড়িতেই—তারপর ওই ছেলেকে কোলে নিয়ে কিলোমিটার খানেক হেঁটে পৌঁছবে বাড়ি। বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের গড়ে তোলা গেট রোড নতুন পাড়ার পেছনের হঠাৎ-কলোনি এলাকার এক এঁদো ঝুপড়ি ওদের মাথা গোঁজা জায়গা। মহিলা স্বামী- পরিত্যক্তা। সে পুরুষ মানুষটি যে কখন কোথায় থাকে সে নিজেও জানে কিনা সন্দেহ—তার অবশ্য থাকার চেয়ে না থাকাটা অনেক স্বস্তিকর। একা মহিলার পক্ষে কোলের ছেলেকে নিয়ে থাকাটা এসব এলাকায় বিপজ্জনক কিন্তু মহিলা সে সব নিয়ে খুব একটা ভাবিত না—আজন্ম লড়াকু তেজিয়াল স্বভাবের মুখরা মহিলার ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না কেউ। ওসব কারো দয়া বা করুণার ধার ধারে না মহিলা—গায়ে গতরে যতদিন খেটে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে ততদিন কাউকে তোয়াক্কা করে না।

তখনো প্রভাতবাবুর প্রথম সন্তান, বড় মেয়ে নন্দিতা ভূমিষ্ঠ হয়নি তবে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে মাস পাঁচেক হল। ওই সময় সুমিত্রা ওই বাড়িতে যেভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সেটা মাথায় রেখে উনি ওর ওই ছেলেটাকে বাইরের ঘরের চৌকিতে বিছানায় শুইয়ে রেখে নাকি অন্য বাড়িগুলোয় কাজে যাওয়ার অনুমতি দেন। সকালে আসার পর থেকে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত ছেলেটার এ বাড়িতে থাকা মানে মায়েরও নাড়ি বাঁধা থাকল এখানে। স্ত্রী নীলিমার এহেন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যতদূর সম্ভব ওর পাশে পাশে থাকাটা জরুরি। কিন্তু স্কুল-অন্তপ্রাণ মাস্টারমশাই আর শিক্ষকদের রাজনৈতিক সংগঠনের নিষ্ঠাবান কর্মী মানুষটার তখন বাইরের ব্যস্ততা এতটাই, বেশিরভাগ দিনই ঘরে ফিরতে রাত হয়ে যায়। সুতরাং, সুমিত্রা আর ওর

BanglaBook.org

ছেলে দুপুরের খাওয়াটা তার বাড়িতে সারার সুবাদে যদি দুপুরটা ওখানেই কাটিয়ে যায় তার চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারত প্রভাতভূষণের কাছে। তবে সবটাই যে নিছক স্বার্থ সেটা ঠিক না, সুমিত্রার ওই ছেলেটার প্রতি ওর স্ত্রীর যেটা ছিল সেটাকে অপত্যস্নেহ ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে। ছ'বছর হল আচমকা ভুঁইফোঁড় ক্যানসারে নীলিমা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত যেটা অটুট ছিল।

চোখ ছিল আকাশের গায়ে—উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটছিলেন প্রভাতভূষণ। ভাঙা রাস্তার কোণ থেকে বেরিয়ে থাকা ইঁটের খাবড়ায় মোক্ষম একটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তেন আর একটু হলে। জোর সামলে নিয়ে ভ্যালভেলিয়ে তাকান শিবু মণ্ডলের দিকে। শিবু ওর কাঁপতে থাকা বাঁ হাতটা চেপে ধরে বলে—'কী হল—কী অত ভাবছেন স্যার? পায়ের দিকে তাকিয়ে চলুন—জুতোর ফিতেটা ছিঁড়ল মনে হচ্ছে?'

—'না না, ও কিছু না—ও ঠিক আছে চলো চলো।'

আগের গতিতেই হাঁটতে চান কিন্তু বুড়ো আঙুল ঢোকানোর চামড়ার ফিতেটার সেলাই খুলে যাওয়ায় এগোতে হচ্ছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। কিছুটা গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন জামতলায়—'আমার এখন কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না—ছেলেটা আর নেই—বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনা নেই? হাসপাতালের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে—সব শেষ?'

—'কী যে বলেন—সে তো কাল রাতেই সব শেষ—স্পট ডেড। বুকে পেটে চারটে বুলেট খেয়ে কেউ কি আর বেঁচে ফেরে...।' থমকে দাঁড়ায় শিবু—'কী হল—এরকম ঘামছেন কেন—হাতটা খুব কাঁপছিল—শরীর খারাপ করছে না তো—ঠিক আছেন তো?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ—ওসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। বয়স হলে একটু আধটু হাত পা তো কাঁপবেই...। চলো...।'

—'আস্তে চলুন স্যার। আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি—রঞ্জুকে তো একসময় লোকে আপনার বাড়ির ছেলে বলেই চিনতো—ওর ছোটবেলাটা তো বলতে গেলে কেটেছে ওই আপনার বাড়িতেই...। পড়াশুনো গান বাজনা আঁকাজোকা—ইস্কুল কলেজ—পার্টি ফার্টি মিটিং মিছিল। আমরা তো সবই জানি।'

BanglaBook.org

—'সে আর কী বলি বলো—তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি তাই বলছি—মায়ের কোলে করে ছোকরা যেদিন আমাদের বাড়ি এল তখনো পুরোপুরি হাঁটতে শেখেনি। রঞ্জন নামটা আমিই দিয়েছিলাম—রবি ঠাকুরের রক্তকরবীর রঞ্জন। শ্লেটে প্রথম আঁচড় কাটা আমার বাড়ির সেই সরস্বতী পুজোয়—লেখাপড়া শুরু আমার বাড়ির বাইরের ঘরের মেঝেতে পাতা মাদুরে—এই আমার হাতেই বর্ণপরিচয় ধারাপাত ইংলিশ ওয়ার্ডবুক। ওর মা সুমিত্রা চিরকালই শক্তপোক্ত মহিলা কিন্তু সেদিন কাঁদতে কাঁদতে আমাকে আর আমার স্ত্রীরকে হাত জোড় করে অনুরোধ করেছিল যাতে আমরা ওর ছেলেটাকে একটু দেখি। ওর ভারি সাধ ছেলেটা যেন পড়াশুনো শেখে, কোনোভাবেই যেন ওর স্বামীর বদরক্ত ছেলের ভেতর থেকে কথা না বলতে পারে। ওর কথায় বলে শুধু না—আমরা ছেলেটাকে বাড়ির ছেলের বাইরে অন্য কিছু ভাবিনি। ওর চোখ দুটোয় অন্য এক ধরনের স্পার্ক দেখেছিলাম—কী মনে করে জানি না শত ব্যস্ততার ভেতরেও ছোটবেলা থেকেই ওর পড়াশুনো যতটুকু সম্ভব দেখিয়ে দেওয়ার ভার নিয়ে নিয়েছিলাম নিজের গরজেই। দিনের বেশির ভাগ সময়টা আমার বাড়িতে কাটাতে কাটাতে আমাদের রুচি, বিশ্বাস, জীবনচর্চা, আচার-আচরণের ছাঁচে গড়ে উঠছিল। আমার বড় মেয়ে ঝুমুর তো ছোট থেকেই রঞ্জুকে নিজের দাদা ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি।' বলেই গলা চিপে ঢোক গিললেন প্রভাতভূষণ—চোখ সরিয়ে নিলেন শিবুর মুখের ওপর থেকে। চকিতে ফিরে তাকিয়ে পড়তে চাইলেন ওর ভ্রূ পল্লবের ভাষা।

থতমত খেয়ে শিবু বলে—'সে তো বটেই—সে কি আর আমরা জানি না। আপনাদের জন্যেই তো ওর সব—আপনার হাত ধরেই ও তখনকার পার্টিতে...।'

—'না না সে আর এমন কী ব্যাপার, তবে হ্যাঁ, হি ওয়াজ আ ব্রাইট চ্যাপ। ইন্টেলিজেন্ট, পরিশ্রমী আর ওর মধ্যে যে নেতা হওয়ার মেটেরিয়াল আছে সেটা আমি বুঝেছিলাম স্কুলের সামনে ওদের সেই অবরোধের দিন। তোমার সেইদিনটা মনে আছে কিনা জানি না, ওর তখন সবে মাত্র ক্লাস এইট, স্কুলের সামনে আমাদের এক ছাত্রীকে লরি ধাক্কা মেরে চলে যাওয়ার প্রতিবাদে ও একা স্কুলের ষোলশ ছাত্রছাত্রীকে তাতিয়ে তুলেছিল। দু-ঘণ্টার

BanglaBook.org

ওপর রাস্তা অবরোধ করে এস. পি. সাহেবকে আসতে বাধ্য করেছিল। স্কুলের সামনের রাস্তাটার দুদিকে স্পিড ব্রেকার বসিয়ে লো-স্পিড জোনের দাবি আদায় করে নিয়ে তবে অবরোধ তুলেছিল।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আর মনে থাকবে না। আমাদের স্কুল থেকেই তো ওর গোড়াপত্তন। তারপর কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বাড়বাড়ন্তের শুরু।'

—'হ্যাঁ, এটা বলতে পারো আমিই ওকে পার্টির জেলা সম্পাদক দীনেশ চাকীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সরকারি কলেজে পড়ার সময় মূলত দীনেশ দার উৎসাহেই ও সক্রিয় রাজনীতিতে আসে—কলেজ সংগঠনের যুবনেতা হিসেবে নাম করে—খুব কম বয়সেই পার্টির জোনাল কমিটির মেম্বার হয়। অ্যাক্টিভ পার্টি করতে গিয়ে এম.এ.-র পড়াটা ঢিলে না দিলে পড়াশুনোতেও অনেক দূর এগোতে পারতো। কিন্তু ততদিনে ও পাখির চোখ দেখে ফেলেছে।'

—'হ্যাঁ ছেলেটা অত অল্প সময়ে যে ওরকম তরতরিয়ে উঠবে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। অত অল্পবয়সে জেলা কমিটিতে গেল। আচ্ছা আচ্ছা লোককে ছেড়ে পার্টি ওকে যেরকম তোল্লা দিয়েছিল সবার তো মনে হয়েছিল বুঝি লাস্ট বিধানসভা ইলেকশনের টিকিট পেয়ে যাবে। কিন্তু ভোটে সেই পার্টিই মুখ থুবড়ে পড়ার পর ও যে অত বড় বেইমানি করে ক্ষমতায় আসা পার্টিতে জয়েন করবে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। আপনার হাতে গড়া ছেলে আপনি বিষয়টা মানতে পেরেছিলেন?'

—'আমার মানা না মানায় আর কী এসে যায়? কিন্তু আমার কাছে খবর ছিল ওকে নাকি বাধ্য করা হয়েছিল। ও লোকাল যে প্রাইমারি স্কুলটায় নাম কে ওয়াস্তে মাস্টারি করতো সেখান থেকে নাকি উত্তরবঙ্গে বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তাই নাকি বাধ্য হয়ে...।'

—'এইটুকুতেই কাত হয়ে গেলে আর কী পার্টি করল? ওসব বাজে ওজর, আসলে ছেলেটা ক্ষমতালোভী। মানুষ খারাপ বলতে পারব না, পরোপকারী—সব ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা আছে কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি ছেলেটা আসলে নীতিহীন। আপনাদের জেনারেশনের নেতাদের মতো বিশ্বাস আর মূল্যবোধের জোর এদের নেই। পার্টির সাধারণ একজন কর্মী হিসেবে বলতেই পারি পার্টি লোক চিনতে ভুল করেছিল—আপনাদের

BanglaBook.org

মতো বর্ষীয়ান অনেককেই বঞ্চিত করে ওর মতো একজন অল্পবয়সীকে উঁচিয়ে ধরা মোটেও ঠিক হয়নি।'

—'সে পার্টি যা ভালো বোঝে তাই করেছে, ওসব নিয়ে নতুন করে আমার কিছু বলার নেই। সবাই সব পারে না, সবার দ্বারা সব হয় না। তুমি হয়তো জানো না মধ্যযুগের রোম দেশের চাণক্য মেকিয়াভেলি কী বলেছিলেন—রাজনীতিতে সফল হতে গেলে মানুষের তিনটে জিনিস খুব দরকার—ভাগ্য, চরম কোনো প্রয়োজন আর গুণ—যেগুলোর সবকটাই ছিল ছেলেটার মধ্যে। যদিও ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করি না, থাকলে তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন—সন্তানের বয়সী ছেলে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি কখনো কখনো মনে হয়েছে ও যেন বাঘের মতো হিংস্র, শেয়ালের মতো ধূর্ত।

—'শেষ দিকে তো বড্ড তড়বড় করছিল। কানাঘুষো যেটুকু কানে এসেছে তাতে নাকি আবার দলবদলের রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল। ক্ষমতাসীন পার্টির দুর্দিন বুঝে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা সর্বভারতীয় দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা শুরু করেছিল। অনেকে এই খবরের পেছনে নাকি এই ব্যাপারটার গন্ধ খুঁজে পাচ্ছে।' আশপাশটায় তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলে ওঠে শিবনাথ দত্ত।

—'মানে—কী বলতে চাইছ?'

—'আমি আর কী বলতে চাইব? এসব খোঁজখবর যারা রাখে তেমন কিছু লোকজন যা বলাবলি করছিল তাই কানে এল আর কী। ওর কাছে নাকি সামনের ভোটে এম এল এ ক্যান্ডিডেট হওয়ার প্রস্তাব এসেছিল, একরকম ঠিকই হয়েছিল মাস খানেক পরে ও নতুন পার্টিতে জয়েন করবে।'

—'কী জানি, এলাকার পপুলার নেতা, কতরকম প্রস্তাব তো আসতেই পারে। এখন তো লোকে কতসব গুজবই ছড়াবে। কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে সে তো খালি সে-ই জানতো।'

—'আসলে লোভ বুঝলেন, লোভ। লোভ সামলানোর মুরোদ সবার থাকে না, শিরদাঁড়ার জোর সবার তো আর সমান হয় না।'

—'কিন্তু রঞ্জু ওরকম ছিল না, ওকে তো আমি সেই ন্যাংটোবেলা থেকে চিনি, কী যে হল ছেলেটার! এই জন্যই আমি চিরকাল লোভ জিনিসটাকে ভয়

BanglaBook.org

পেয়ে এসেছি, ওই চক্কর থেকে গা বাঁচিয়ে থেকেছি। জানতাম একবার জালে জড়ালে, পা ছাড়িয়ে আনা দুঃসাধ্য...।'

—'কাঁচা টাকা বুঝলেন—কাঁচা টাকা? শেষ তিন চার বছরে ছেলেটা কত টাকা করেছে জানেন, বেনামে কত সম্পত্তি করেছে হিসেব নেই। কটা চালু হোটেলের পার্টনার, কতগুলো কন্ট্রাক্টরি আর প্রোমোটারি ব্যবসার শেয়ার হোল্ডার, কটা বাসের মালিক জানেন? নামেই রাখাল বলে ওর ওই সাগরেদটা ডিলার, কে না জানে পেছনে ওই রঞ্জুই এই তাবৎ অঞ্চলের রান্নার গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটরশিপের আসল মালিক। মর্টগেজ রেললাইনটা উঠে যখন ব্রডগেজ লাইন বসল তখন ওই এলাকার দুধারের দামী দামী গাছগুলো বেচে রাতারাতি যেভাবে পয়সা পিটে নিল ভাবা যায় না! সিদ্ধিভাঙা বিল আর মরা নদীর সোঁতাটাকে নষ্ট করে যে ভাবে পিকনিক স্পট তৈরি করল, গরিবদের নাম করে রোডের মুখে অতবড় হাসপাতালটা করল তারপর সেটা তো এখন বড়লোকদের নার্সিংহোম—আরো যে কতকিছু করেছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলে দিন কাবার হয়ে যাবে। মুখের ব্যবহার সেই আগের মতোই মিষ্টি ছিল, দেখলেই মাথা নীচু করে কাকা জ্যেঠা বলে কথা তাই সামনে কেউ কিছু বলে না কিছু পেছনে সবাই কতরকম যে ফিসফিস করত! আজকাল অবশ্য কারুর কথাতেই নেতাফেতাদের আর কী এসে যায়?'

—'জানি না, ছেলেটা কী ছিল আর কী হল? ছাপড়ার বেড়ার ঘর থেকে উঠে আসা ছেলে বলেই কি তলায় তলায় এতসব লোভ ওঁত পেতে থাকে? আমরা তো এইসব টাকা পয়সা এইসব জিনিসগুলোকে ড্রেনের পাঁক মনে করতাম, খুব সিম্পল মধ্যবিত্ত টানাপোড়েনের জীবনটা নিয়ে আমাদের তখন কত যে গর্ব ছিল! আসলে আমাদের সেই সময়টাই তো মরে গেছে—তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের বিশ্বাসগুলো।'

—'চোখের ওপর রাজনীতিটা কেমন হয়ে গেল তাই না স্যার? একসময় কী সব লোকজনকে পার্টি পলিটিক্সে দেখেছি আর আজকাল কী সব লোকজনকে দাপিয়ে বেড়াতে দেখছি। চোখের ওপর দেখতে খুব কষ্ট হয়—এখন পলিটিকাল লোকজন মানেই তার কোটি টাকার জোর থাকতে হবে, তাকে গাড়ি বাড়ি হাঁকিয়ে একটা ধুন্দুমার কাণ্ড করতেই হবে, দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নটাই যেন এখন অলিখিত দস্তুর। সেভাবে বলতে গেলে আপনাদের

BanglaBook.org

জেনারেশনটাই শেষ, তারপর এই নতুন জেনারেশনটা রাজনীতিতে এল স্রেফ কামানোর ছুতোয়। ওই সব নীতিফিতি সব আসলে গেট-পাস।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন প্রভাতভূষণ।—'কী আর করা যাবে শিবু, মাৎস্যন্যায়ের যুগ চলেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় মরে পচে হেজে গেছে— পৃথিবীটা খাদের কিনারায় চলে এসেছে। যাক, আরো উচ্ছন্নে যাক, সব জ্বলেপুড়ে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাক—'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে গেছে রঞ্জুর নতুন বাড়ির মোড়ের কাছে। গলির মুখটায় প্রচুর ভিড়। শিবুকে টেনে নিয়ে একটা পান বিড়ির দোকানের টোঙের পেছনে চলে আসেন প্রভাতভূষণ—আড়ালের ওপার থেকে পরিস্থিতিটার ওপর নজর রাখতে থাকেন। বেশির ভাগই সব অল্পবয়সী ছেলেপিলে। খুনের নেপথ্যে যাই থাকুক, উপস্থিত পার্টিকর্মীরা খুনটা নিয়ে ভয়ানক উত্তেজিত। ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা প্রতিশোধ চায়—খুনের বদলা খুন। রঞ্জু এখন ওদের কাছে সদ্য বঁড়শি গেঁথে তোলা তরতাজা একজন শহীদ। এর মধ্যে ফ্লেক্স ছাপানো হয়ে গেছে—হাতে লেখা পোস্টারও পড়েছে কিছু—'রঞ্জন বিশ্বাস অমর রহে', 'রঞ্জন আমরা তোমায় ভুলিনি ভুলব না'। শিবু ফিসফিস করে বলে—'তৈরি থাকুন স্যার, এখন কদিন এলাকা জুড়ে বিশাল ডামাডোল হতে চলেছে, ব্যাপক মারদাঙ্গা, রক্তারক্তি।'

—আবার রক্ত, ধক করে ওঠে বুক।—'বাড়ি চলো শিবু, বাড়ি চলো। আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না—শরীরটা আনচান করছে।'

একরকম প্রায় ছুটে জায়গাটা থেকে সরে পড়তে চাইছিলেন প্রভাতভূষণ। হনহনিয়ে হাঁটা লাগিয়েছিলেন, পেছন থেকে কে যেন স্যার বলে ডেকে উঠল। পেছন ফিরেই দেখেন রঞ্জুর সেই সব সময়ের ছায়াসঙ্গী রাখাল। অদ্ভুত নির্বিকার ঢঙে বলে উঠল—'স্যার চলে যাবেন না, আর একটু ওয়েট করুন, দাদার বডিটা এক্ষুনিই নিয়ে এসে ঢুকবে। দেখবেন কী রকম ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে। আমি প্রথম যখন গিয়ে দেখলাম তখন তো রক্তে ভেসে যাচ্ছে, চেনার উপায় নেই, কপালটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। ঘরের মেঝেতে এখনো চাপ চাপ রক্ত, ভেতরে যাবেন নাকি একবার? চলেন দেখে আসবেন...।'

—'না না'। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে হাত নেড়ে প্রায় ধমকে ওঠে প্রভাতভূষণ—'বার বার ওভাবে রক্ত রক্ত করছ কেন? কাণ্ডজ্ঞান বলে কি কিছু নেই নাকি—রক্ত কি একটা দেখার জিনিস হল? কসাই পেয়েছ নাকি যে রক্ত দেখে আমোদ হবে? আমার পক্ষে ওর রক্ত কি করে দেখা সম্ভব?'

—'বুড়ো মানুষের সঙ্গে মশকরা হচ্ছে নাকি? কী কথা—চলেন দেখে আসবেন—রক্ত দেখে আসবেন? ধুয়ে ফেলোনি কেন, এতক্ষণ কেটে গেছে জল ঝাঁটা দিয়ে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলনি কেন—রক্ত কি একটা দেখানোর জিনিস হল? কী ভেবেছটা কী তোমরা?' হঠাৎই তিরিক্কে মেজাজে চেঁচিয়ে ওঠেন প্রভাতভূষণ। একদণ্ডও আর ওখানে না দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে পালানোর ভঙ্গিতে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগেন। মতিগতি বুঝতে না পেরে স্যার স্যার করতে করতে পিছু নেয় শিবনাথ।

রাখাল একেবারে তাজ্জব বনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 'যাহ্ বাবা! এই বুড়োটা তো দেখছি মহা খিটকেল!' বুড়ো বয়সের কত যে ভীমরতি—শূন্যে একটা মুখ খারাপ ঝেড়ে সে ফিরে যায় নিজের কাজে।

জীবনে কখনো এত জোরে হাঁটেননি প্রভাতবাবু, লোকের চোখেও ব্যাপারটা বিসদৃশ লাগলেও কিছু করার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে এই চত্বরটা পেরিয়ে যেতে হবে। কোত্থেকে জানা নেই তার নাকে জমাট রক্তের ঝাঁঝাল গন্ধ এসে লাগছে আর শরীরটা আনচান করে উঠছে! যেন লালচে খয়েরি চশমার কাচ দিয়ে দেখছেন চারপাশের সবকিছু—যে দিকে চোখ পড়ছে সবই বাসি রক্তের মতো ঘোলাটে কালচে লাল। তার চশমার কাচে এ কী ধরনের পুরু বাষ্পের প্রলেপ পড়ল—এ কী হল হঠাৎ—দশদিকে সব কিছু কেমন পাঁশুটে লাল। সব কিছুর গা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে! চোখ বন্ধ করে আনেন প্রভাতভূষণ—অন্ধের মতো ঝড়ের বেগে হাঁটতে থাকেন। কানে আসছে শিবুর গলা—'কী হল স্যার, অ্যাত জোরে হাঁটছেন কেন? পড়ে যাবেন তো।' উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না তিনি—সে ক্ষমতাও হারিয়ে গেছে যেন। বাড়ি পৌঁছে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ার আগে অবধি আর কোনোদিকে তাকানোর নেই, কোনো কথা বলার নেই।

বাড়ির গেটে ঢোকার আগে শিবুকে বাড়ি চলে যেতে বলেন প্রভাতবাবু। টিউবওয়েল নিজে হাতে পাম্প করে বালতির পর বালতি জল মাথায় ঢেলে

BanglaBook.org

স্নান করতে লাগেন। মুখ হাত পা রগড়ে ডলে কী যেন একটা তুলে ফেলতে চাইছেন। মেডিকেটেড সাবান দিয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল আচ্ছাসে ঘষে এভাবে স্নান করতে বাবাকে আগে কখনো দেখেনি নূপুর। সে চিৎকার করে ওঠে—'কী হল বাবা? অত জল ঢালছ কেন? এই নিয়ে তো বারো চোদ্দ বালতি ঢালা হয়ে গেল। টিউবওয়েলের জল ভারী, ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাঁধাবে নাকি?'

কথা কানে নেন না প্রভাতভূষণ, জল ঢেলে যেতে থাকেন। যতক্ষণ না পেশিতে বালতি চাগানোর ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে—ততক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে যেতে থাকেন।

দুপুরে কোনোরকমে কয়েক মুঠো ভাত গলাধঃকরণ করে শুয়ে পড়েন, কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ওষুধে একটা ঝিমুনিমতো আসার কথা কিন্তু তেমন কিছু না আসায় অগত্যা ঘুমের বড়ি নিতে হয়। অনেক সাধ্যসাধনা করে কিছুক্ষণের জন্যে চোখের পাতা বুজে এলেও, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুমটা ছিঁড়ে যায়। আধাখেঁচড়া ঘুম হওয়ায় বিকেল থেকে শুরু হয় অসহ্য একটা মাথা ব্যথা। সন্ধের দিকে একটা বিশাল মিছিল করে সারা পাড়া দাপিয়ে রঞ্জুকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানের দিকে। কাচে ঢাকা শববাহক যানটা যখন বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে, নূপুর একবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রভাতভূষণ যেতে দেননি। তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়ার পাট গুটিয়ে নিয়ে বিছানাপাতার তোড়জোড় শুরু করে দেন। রাতে খাওয়ার আগে ডবল ডোজের ঘুমের ওষুধ নেওয়ায় অবশ্য ঘুম আসতে অসুবিধে হয় না। মোবাইল ফোন স্যুইচ অফ করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ার আধঘণ্টার ভেতরেই ঘুমের ভেতরে সেঁধিয়ে যান, স্নায়ু-বিবশক ওষুধের প্রভাবে অভ্রান্ত ভাবে তলিয়ে যেতে থাকেন।

নিশ্চিন্তেই অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ পিঠে কে যেন একটা আলতো টোকা দিল। অগ্রাহ্য করে ঘুমের আরামের মধ্যে বেশ থিথু হয়ে আছেন—এবার যেন সামান্য জোরে ঠেলা। 'কে—কে?' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জড়ানো গলায় বলে ওঠেন প্রভাতভূষণ—'কে নূপুর নাকি—কী হল, এত রাতে?'

—'না স্যার আমি রঞ্জু।' ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা চেনা পুরুষকণ্ঠ কানে আসে।

BanglaBook.org

—'রঞ্জু বলতে, আমাদের রঞ্জন? কিন্তু কী করে—তোকে তো কাল রাতে কারা যেন সব...?'

—'হ্যাঁ তাতে কী হয়েছে—তাতে কী এসে যায়? কিন্তু খবর পেলাম আপনি নাকি আমার মার্ডার হয়ে যাওয়া নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন? আমার নতুন বাড়ির মার্বেলের মেঝেতে, দেওয়ালে, খাটে বিছানায় আমার রক্তের মাখামাখির কথা শুনে আপনি নাকি খুব প্যানিকড্ হয়ে পড়েছেন? এ সব নিয়ে একদম ভাববেন না স্যার, রাজনীতিতে খুনোখুনি নতুন কোনো ব্যাপার তো না, এসব তো হামেশা হয়েই থাকে। আমার এই পরিণতি নিয়ে একদম কষ্ট পাবেন না স্যার—আমি ভালো আছি। এখানে একটু বেশিই শীত, চারদিক অস্বস্তিকর রকমের চুপচাপ। প্রথম প্রথম বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, তাছাড়া এমনিতে খারাপ লাগছে না—ঝুটঝামেলার নাম গন্ধ নেই, দিব্যি লাগছে...।'

ভয়ে হাড় হিম হয়ে এল প্রভাতভূষণের। হ্যাঁ, একটা বিচ্ছিরি ঝাঁঝাল শুকনো রক্তের গন্ধ আসছে নাকে। তার সঙ্গে বুলেটের বারুদের গন্ধ মিলে-মিশে কী বিদ্‌ঘুটে একটা গন্ধ! গা ঘুলিয়ে ওঠে, গলা শুকিয়ে কাঠ, স্বর বেরুচ্ছে না। তবু আতঙ্কে ককিয়ে ওঠেন প্রভাতভূষণ—'তা এইভাবে রক্তমাখা অবস্থায়, গায়ে মাথায় অতগুলো বুলেটের গর্ত নিয়ে আমার কাছে কেন, এই ঘরে, এত রাতে? কী চাই—কী মনে করে—কী বলতে...?'

—'তেমন কিছু না স্যার, জাস্ট বলতে এলাম চিন্তা করবেন না, আমি ঠিক আছি।'

—'সে ভালো কথা কিন্তু এভাবে কেন? তুই কি জানিস না আমি হার্টের রুগী, তার ওপরে সত্তরের ওপর বয়স হয়েছে। আমার পক্ষে কি এতটা নেওয়া সম্ভব—এই ভয়ঙ্কর বীভৎসতা! আমি রক্তের গন্ধ সহ্য করতে পারি না, তার ওপর আবার মানুষের রক্ত।'

—'নিজের কথাটাই ভাবলেন স্যার, আমার কথাটা ভাবলেন না? আমি যে কী ভয়ানক যন্ত্রণা নিয়ে এতটা রাস্তা পেরিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, এখানে এসে সোজা হয়ে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছি তার কোনো ধারণা আছে? সামান্য এইটুকু রক্তের গন্ধতেই এতটা রিয়্যাক্ট করছেন! যে রক্ত ঝরার শুরু আপনার হাত দিয়েই সেই রক্তের গন্ধে এতটা অস্বস্তি, এতটা কাতরতা?'

BanglaBook.org

—'রক্ত ঝরার শুরু আমার হাত দিয়ে—মানে? এ কী ধরনের কথা—কী বলতে চাইছিস?' ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসেন প্রভাতভূষণ। 'আ—আ—আমি—রক্ত ঝরালাম—কী ভাবে—কবে? কী সব ভুলভাল বকছিস—মাথার ঠিক আছে তো? নাকি মাথায় গুলি লাগার পরে ঘিলু চটকে মটকে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে? যে লোকটা সামান্য একটা মশা মারার আগে দুবার ভাবে, সে কিনা ঝরাবে রক্ত?'

—'সব রক্ত কি বাইরেই ঝরে স্যার, ভেতরে ভেতরে যে রক্ত ঝরে তাহলে তার খবর আপনি রাখেন না। সে রক্ত যে আরো কত ঝাঁঝাল, কত ভয়ানক, আরো কত বেশি ক্ষারীয় সে খবর নিশ্চয়ই আপনি জানেন না। তার এক একটা ফোঁটা ফুটন্ত গালার মতো, যেখানে পড়ে ফুটো হয়ে বেরিয়ে যায়। বুলেটে ঝাঁঝড়া হওয়ার অনেক আগেই তো আমার এই বুকটা আগেও একবার ঝাঁঝড়া হয়েছিল। আপনি সবটা জেনেশুনেও আমার আর আপনার বড় মেয়ে, নন্দিতার আবাল্য সম্পর্কটা যেরকম নির্মম হাতে নষ্ট করে দিয়েছিলেন সেটা আমার মনের কাছে কী ভয়াবহ যন্ত্রণার ছিল, সে খবর নিশ্চয়ই আপনি রাখেননি। সম্পর্কের শেকড়টা মাটির অনেক গভীরে ঢুকে গিয়েছে বুঝে যে ভাবে হ্যাঁচকা টান মেরে পুরো ব্যাপারটা ছিঁড়ে খুঁড়ে উপড়ে আনতে চেয়েছিলেন—সে সব কথা আপনি ভুলে গেলেও আমি কী করে ভুলতে পারি।'

প্রভাতভূষণ কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও ঢোক গিলে নেন। অন্ধকারের ভেতর থেকে হিসহিসিয়ে ওঠে রঞ্জনের গলা—'মুখে যাই বলুন আসলে আপনি মনে মনে কখনই এই কথাটা ভুলতে পারেননি আমি আদতে আপনার বাড়ির ঠিকে ঝি-এর ছেলে। যতই পড়াশুনো শিখি, পার্টি কর্মসূচীতে যতই যোগ্যতার প্রমাণ রাখি, মিটিং-এ মিছিলে যতই লম্বা লম্বা ভাষণ দিই, যতই হেগেল মার্কস অ্যাঙ্গেলস গ্রামসি গুলে খাই না কেন আসলে আমি উদ্বাস্তু কলোনির ঝুপড়ি থেকে উঠে আসা একটা অর্বাচীন ছোকড়া যার পিতৃপরিচয়ও ঠিকমতো জানা যায়নি। আপনার মনে সন্দেহ ছিল অকুলীন নিম্নবর্ণের রক্ত আদতে বদরক্ত না তো?

মুখে যতই শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলুন, যত বড় সাম্যবাদী আদর্শের মানুষ হিসেবে তুলে ধরতে চান না কেন আপনি আসলে যে কী ভীষণ

BanglaBook.org

রকমের মধ্যবিত্ত সেটা আপনার চেয়ে ভালো করে আর কে-ই বা জানে। যতই নিজেকে ডিক্লাসড ভাবার ভড়ং করুন না কেন আপনি আসলে হাড়ে মজ্জায় মধ্যবিত্ত—ড্যাম রেচেড মিড্‌লক্লাস। আপনাদের মতো লোকেরা মুখে যে সব জিনিসের বিরোধিতা করে আকাশ ফাটান, বাস্তব জীবনে ভেতরে ভেতরে সেই জায়গাগুলো থেকে সরে আসতে পারেন না এক চুলও। যেমন দেখুন না নিজের সুদর্শনা মেয়ের পাত্র বাছার সময় আপনার ঠিক সেই একজন কর্পোরেট সেক্টরের মোটা মাইনে পাওয়া অভিজাত বংশের ছেলেই পছন্দ হল। যে আমেরিকাকে গাল না পেড়ে আপনাদের ভাত হজম হয় না সেই মুলুকে আপনার মেয়ে জামাইয়ের তিন বছরের ওপর থাকা নিয়ে আপনার গর্বের শেষ নেই। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর আছে ঘনিষ্ঠ মহলে জামাইয়ের ডলার রোজগার আর বহুজাতিক কোম্পানির গাড়ি চড়ার গল্প করতে গিয়ে কী ভাবে আপনি হরষিত হয়ে উঠেছেন। আমার সেই দিনটা মনে গেঁথে আছে যেদিন নন্দিতার বিয়ে একরকম ঠিক করে ফিরে আপনি আমার সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন—উত্তেজনার চরম মুহূর্তে বলে ফেলেছিলেন—বড় জোর কী হতে পারিস তুই? কী করতে পারিস?

সেই দিন থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম কী করতে পারি, কী হতে পারি আমিও দেখিয়ে দেব। সর্বস্বান্ত সর্বহারা ঘরের ছেলে বলে আখেরে আমার সুবিধেই ছিল—অন্তত আপনাদের মতো মিড্‌লক্লাস মূল্যবোধ আর নীতি-আদর্শের মুখোশ পরে ঘুরতে হয়নি। খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের মতো উদ্বাস্তু অধ্যুষিত জটিল এলাকাটাকে হাতের তালুর মতো চিনে ফেলেছিলাম, তাছাড়া অঞ্চলপ্রধান তারকচন্দ্র ঘোষ আমাকে ওইসময় কিছু সার কথা বুঝিয়েছিল। বলেছিল তুই যেসব নীতি-আদর্শ মেনে চলিস ওসব বস্তাপচা, এই জমানায় অচল। যতই ওসব মধ্যবিত্তদের নীতি আদর্শ নিয়ে চলিস ওরা কিন্তু তোকে কোনোদিনও নিজের আপন ভাববে না। ঠিক বলেছিল কি ভুল জানি না কিন্তু রোদে পুড়ে, জলে ভিজে বাস্তবের রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে গিয়ে যেটুকু বুঝেছিলাম আমরা যারা সত্যিই হতদরিদ্র, সত্যিসত্যিই সর্বহারা ঘর থেকে উঠে এসেছি তাদের রাজনীতিতে টিকে থাকার খেলাটা কিন্তু আলাদা।

তবে কী জানেন স্যার, ক্ষমতা খুব খারাপ জিনিস। একবার ওই

BanglaBook.org

সার্কেলটার মধ্যে ঢুকে পড়ার পর মানুষ যে ভীষণ অসহায় আপনি তা জানেন না। যে একবার এই এরিয়াটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে তখন যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতার জায়গাটা ধরে রাখতে চায়। না হলে তো সে পাবলিকের কাছে হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, অবান্তর হয়ে যাবে। সেই ভয়টা পেয়ে বসলে মানুষ তখন মরিয়া হয়ে যায়। যেন বাঘের পিঠে বসে ছোটা—যতক্ষণ ছুটতে পারছ ততক্ষণ বাঁচোয়া, থামলেই বাঘ তোমাকে খাবে। খেলও, আমি জানতাম এইরকম কোনো পরিণতিই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ না হয় কাল, যে কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন কিছু ঘটে যেতেই পারে। তাই ঘটল। অঘটন না-ও ঘটতে পারতো, অনেকের বেলাতেই ঘটে না কিন্তু আমার বেলায় ঘটল।'

অন্ধকার হাতড়ে জলের বোতলটা খুঁজতে থাকেন প্রভাতভূষণ, কিন্তু বোতলটা যেখানে রাখা সম্ভবত তার ঠিক পাশের চেয়ারটাতেই বসে আছে রঞ্জু—'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি। যা বলছিস হয়তো সবটা ঠিকই বলছিস—আবার হয়তো সবটা ঠিক না-ও। হ্যাঁ হ্যাঁ স্বীকার করছি কিছু ভুল হয়েছে, কিছু ভুল সবারই হয়। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমরা সবাই কিছু না কিছু অন্যায় করি—আমি জানতাম না, হয়তো অতটা বুঝতে পারিনি নন্দিতার সঙ্গে তোর সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়াটা যে তোকে অতটা ঘা দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম তুই ওসব কথা কবেই ভুলে গেছিস— যৌবনের এইসব ব্যাপার তো বেশিরভাগ মানুষই ভুলে যায়—তার ওপর তুই ব্যস্ত মানুষ, এলাকার ডাকসাইটে নেতা...।'

—'ভুলে যাব মানে, অতই সহজ—কী বলছেন আপনি? যে ঘটনাটা আমার জীবনটাকেই ছন্নছাড়া করে দিল, আমি অন্য আর কোনো মেয়ের মুখের ওপর মনই বসাতে পারলাম না, আমার বাকি জীবনটার আর কোনো ভরকেন্দ্রই থাকল না, আপনি বলছেন আমি সেই ব্যাপারটাই ভুলে যাব? কী করে—কী ভাবে—কী হলে?' গলা খাঁকড়ে উঠে দাঁড়ায় রঞ্জু।

—'ঠিকই, ঠিকই।' বালিশ আঁকড়ে ধরে পিছতে থাকেন প্রভাতভূষণ। —'কিন্তু তুই এখন কী চাস? প্রতিশোধ, বদলা—এই বুড়ো দুর্বল অশক্ত মানুষটার ওপর বদলা?' থরথরিয়ে কেঁপে ওঠেন।

—'বদলা—হুঁ হুঁ হুঁ—বদলা? আপনার ওপর?' মুখ টিপে হাসতে থাকে

BanglaBook.org

রঞ্জু—কতকটা যেন পরিহাসের নির্মম হাসি। অন্ধকারের ভেতরেও ওর চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে, জমা রক্তের ঝাঁঝটা যেন পাক খেয়ে উঠল ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়—'আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি স্যার?' মশারির গায়ে রক্তাক্ত মুখটা ঠেসে ধরে—ঝুঁকে দাঁড়ায় বিছানায় ভর দিয়ে।

—'এ কী—এভাবে এগিয়ে আসছিস কেন? না না না রঞ্জু—তুই এমনটা করতে পারিস না। ক্ষমা করে দে, ভুল হয়ে গেছে—আমায় মাফ করে দে। রঞ্জু ভুলে যাস না একসময় তুই ছিলি আমার মানস সন্তান, তোর এই নামটা অবধি আমার দেওয়া, একসময় আমি না থাকলে তোরা ভেসে যেতিস, তোর জীবন ওই ঝুপড়ির অন্ধকারে হারিয়ে যেত—তোর এদ্দূর এগোনই হত না...।'

—'তাই কৃতজ্ঞতা চেয়েছিলেন? বাকি জীবনটা জুড়ে সেই উপকারের ভারে মাথা নুইয়ে থাকি সেটাই চেয়েছিলেন? আমি যে একজন স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ একটা মানুষ সেটাই স্বীকার করেননি?' মশারিটা তুলে ধরে ভেতরে মাথাটা ঢুকিয়ে দেয় রঞ্জু, টপ টপ করে বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ল কাচা বিছানার চাদরের ওপর। হাঁটু রাখল তার ওপর।

—'না না না।—' চিৎকার করে পিছোতে পিছোতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় প্রভাতভূষণের।

আচমকা এক ঝটকায় মাথাটা মশারির বাইরে বার করে এনে সটান শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায় রঞ্জু—'ছিঃ! আমাকে এতটা হীন ভাবলেন কী করে? ভাবলেন কী করে আমি আপনার গায়ে হাত দেব—আপনার ওপর প্রতিশোধ নেব? ছিঃ আমি কি এতই নীচ—আপনি জানেন না আপনাকে আমি কতটা শ্রদ্ধা করতাম—কী করে ভুলতে পারি আপনি আমার প্রথম জীবনের আইডল, আমার শিক্ষক, পিতৃতুল্য, নন্দিতার বাবা...।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থাকে রঞ্জু—'বদলা—বদলা—আর বদলা নিয়েই বা কী করব? আগে হলে তাও না হয় কথা ছিল কিন্তু মৃত্যুর পর তো সব কিছু নতুন চোখ দিয়ে দেখছি। আপনি তো দূরস্থান—আমি আর কারো ওপরেই কোনো ব্যবস্থা নিতে যাব না। কাল রাতে যারা আমায় মারতে এসেছিল, যারা গুলিগুলো চালাল, যারা তাদের পাঠাল তাদের সবাইকেই আমি চিনি। কেন মারল, কী ভেবে মারল সবই আমার জানা কিন্তু এখন আমার আর তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার নেই। কারণ এখন

BanglaBook.org

আমি সব কিছু অনেক ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি—বুঝতে পারছি সবাই সবার জায়গায় অসহায়। রাজনীতির এই জায়গাটা আজকাল কোনো এক বীভৎস হিংস্র জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে। এখানে একটা শক্তিশালী বাঘ, আরেক শক্তিশালী বাঘকে না মারলে তাকেও হয়তো পরশু মরতে হতো।

যাই হোক, এসব সত্ত্বেও কেন জানি না আমার এখন মনে হয় নীচু শ্রেণীর অজ্ঞান পাশবিক কিছু মানুষকে তবু ক্ষমা করা যায় কিন্তু জ্ঞানী বিদ্বান চিন্তাশীল মানুষদের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আপনাদের মতো মধ্যবিত্তদের পাহাড়সমান স্ববিরোধিতা আর ভণ্ডামির জন্যই আজ সমাজটা এই চেহারা নিয়েছে। তাদের উদাসীনতা, তাদের ছদ্মবেশী আন্তরিকতা, মুখে পুঁজির নামে ধিক্কার অথচ ভেতরে ভেতরে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব সমস্যার সামনে পড়লে চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয় পলায়নবাদী মনোবৃত্তি আমাদের মতো ভ্রষ্ট আঞ্চলিক নেতাদের জন্ম দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে স্বার্থসর্বস্ব নতুন এক সুবিধাভোগী শ্রেণীর, জন্ম দিয়েছে এই সব দুর্বৃত্তদের যাদের হাতে কার্যত চলে গেছে আমাদের এই সমাজ।

যাক যাক, সব আরো নীচে নামুক, আরো রসাতলে যাক। পুরনো ছদ্ম ভণ্ড মেকি সব আদর্শ, মূল্যবোধ, সামাজিক কাঠামো ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। একমাত্র তাহলেই যদি আবার সবকিছু নতুন করে শুরু হতে পারে, পোড়া ছাইয়ের ঢিবির ফাঁক দিয়ে যদি আবার একটা নতুন কোনো শুরুর আলো দেখা যেতে পারে—নতুন কোনো এক জনজাগরণ। আপাতত সেই আশাতেই ঝুলে থাকব হাওয়ায়—এই প্রেতজন্ম থেকে রেহাই চাইব না। আপনি জানেন স্যার আপনার প্রভাবেই প্রথম জীবন কাটানোর জন্য ধর্মীয় আচার আচরণে আমি বিশ্বাস করি না, সেই মতো ওদের বলাও আছে আমার যেন কোনো শ্রাদ্ধশান্তি বা পারলৌকিক ক্রিয়া না হয়। প্রচলিত বিশ্বাস যদি সত্যি হয়, আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম না করার জন্য যদি আমার স্বর্গবাস না হয় তা হলেই আমি বেঁচে গেলাম। নরকের এই গুমোট অসহ্য বিষ বাষ্পে ভরা হাওয়ায় এই তো আমি বেশ আছি—এই ভাবেই ভেসে থাকব—এই নষ্ট ঘুণধরা বিপথগামী সমাজ সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি চাইব না। মুক্তি চাইব না—মুক্তি হবে না।

চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রঞ্জন। অস্ফুটে

BanglaBook.org

বলে উঠল—'তাহলে এবার আসি স্যার, চিন্তা করবেন না আমি ভালো আছি। আপনিও ভালো থাকবেন। কিছু মনে করবেন না—দূর থেকেই নমস্কার জানালাম, পা ছুঁলে যদি রক্ত লেগে যায়—নোংরা রক্ত।' তারপর একটু একটু করে পিছোতে শুরু করল—এক পা, দু পা করতে করতে পেছনের অন্ধকারের দেওয়ালটার ভেতরে হারিয়ে গেল।

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল জোরে—চকিতে হাতটা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রভাতভূষণ—রঞ্জু, রঞ্জু...। মগজের কোণে কোথাও একটা জোরাল ঝাঁকুনি লাগল। সঙ্গে সঙ্গে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলেন বিছানায়—চোখের সামনে পাখার হাওয়ায় নড়তে থাকা সবজে মশারি আর নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ফিনফিন করছে শেষ রাতের অন্ধকার। কোথায় সেই রক্তের গন্ধটা? বারুদ বারুদ ঝাঁঝালো গা-বমি দেওয়া গন্ধটা? তাহলে এটাই কি আসলে জেগে ওঠা—তাহলে কি রঞ্জু আসেনি? আসবে না —অন্ধকারের ওই দেওয়ালটা পেরিয়ে আর কোনোদিনই আসবে না।

লাফিয়ে খাট থেকে নেমে এলেন প্রভাতভূষণ। আলো জ্বাললেন ফট করে স্যুইচ টিপে। কোথায় রক্ত—মেঝেতে বিছানার চাদরে, তো কোনো রক্তের দাগ নেই। রঞ্জু যে চেয়ারটায় বসেছিল বলে মনে হয়েছিল সেখানে থম মেরে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলেন—হতভম্বের মতো বসে রইলেন। নড়বড়ে পায়ে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ধীরে ধীরে। বাইরে সকালের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সব কিছুর ওপর। গেটের পাশের সেই নিম গাছটার কচি পাতাগুলোর ওপর নরম আলো পড়ে চকচক করছে। প্রভাতী হাওয়ায় নিশ্চিন্তে দোল খাচ্ছে। একদৃষ্টে ওই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি আর সহসা তার মনে হল জীবন বিলক্ষণ এই নিমপাতাগুলোর মতোই। নম্র কোমল আলোয় কী বিচিত্র সুন্দর অথচ দাঁতে কাটলেই কী ভীষণ তেতো!

BanglaBook.org

# অপুর গল্প

## চিন্ময় চক্রবর্তী

কবে ফিরবে বাবা?

ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়ানো ছেলের প্রশ্নে ফিরে তাকায় অপু।

ছেলের হাত ধরে কোলাপসিবল গেট দরজা ধরে দাঁড়ানো রঞ্জনার নিরুচ্চারিত প্রশ্নও তাই, কবে ফিরবে অপু।

এ বছরই ক্লাস টু'তে উঠেছে সোনাই। কিন্তু কথায় কোনো আড়ষ্টতা নেই। স্পষ্ট স্বরে বড়দের মতোই কথা বলে সোনাই। ভাবনাচিন্তাও বয়সের তুলনায় পোক্ত।

BanglaBook.org

নিজেকে বেশ স্বার্থপর বলে মনে হয় অপুর। মুখ নিচু করে বলে, খুব তাড়াতাড়িই ফিরব রে।

পিঠে রুকস্যাকটা নিয়ে চারতলায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মন খারাপ করে অপুর। কবে যে ফিরবে সঠিক করে সে নিজেই জানে না। আদৌ ফেরা হবে কিনা কে জানে! এবার হিমালয়ের যে পথে ট্রেকিং-এ যাচ্ছে, সে পথ কঠিন। জীবনের ঝুঁকি আর বিপদ প্রতি পদে।

কিন্তু ফ্ল্যাট থেকে নামতেই মন ভালো হয়ে যায় অপুর। পাহাড়ে পিঠে রুকস্যাক ফেলে পিছুটানহীন চলার মধ্যে স্বাধীনতার একটা অপার আনন্দ আছে। সে আনন্দ যেন সর্বগ্রাসী ড্রাগসের নেশার মতো। ঘুরে ঘুরে আসে। কুরে কুরে খায়। তাই প্রতি বছর অপু ঘর-বাড়ি, রঞ্জনা-সোনাইদের ছেড়ে স্বার্থপরের মতো বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের পথে।

বসন্তকাল থেকেই পাহাড় অপুকে যে ডাকে।

একবার পাহাড়ে পথ চলতে দেখা পেয়েছিল এক বৃদ্ধ ভেড়াওয়ালার। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার। দুই ছেলে মিলিটারিতে চাকরি করে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে অবস্থাপন্ন ঘরে। ভেড়ার পাল নিয়ে রোজগারের ধান্ধায় পাহাড়ে আসার প্রয়োজন নেই তার। তাও গরম পড়লেই সে তার ভেড়ার পাল নিয়ে পাহাড়ে চলে আসে।

অপু জানতে চেয়েছিল, প্রতি বছর ভেড়ার পাল নিয়ে কেন পাহাড়ে আসে সে! কেন এই বয়সে এত কষ্ট সহ্য করে হিমালয়ের এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় ভেড়ার পাল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ায়! এই বৃদ্ধ বয়সে ঘরে নিশ্চিন্ত আরামে কাটালেই তো পারে!

প্রশ্ন শুনে, বৃদ্ধ তার বলিরেখা-পূর্ণ মুখটা তুলে, ঘোলাটে দৃষ্টিতে দূরের বরফের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'পাহাড় বুলাতা হ্যায়।'

কোনো কোনো সময়ে একটা ছোট্ট বাক্য-বন্ধ একটা গোটা মানুষের জীবন-দর্শন বলে দেয়। অমোঘ তিনটি বাক্য, 'পাহাড় বুলাতা হ্যায়।'

অপুকেও যে পাহাড় ডাকে। সে ডাক উপেক্ষা করার মতো শক্তি নেই অপুর। তাই স্বার্থপরের মতো প্রতিবছর পরিবার-পরিজন ফেলে অপু এসে ওঠে পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল পায়ে চলা পথে।

সতেরো হাজার ফিটের ওপর সুরালয় হিমবাহের প্রান্তে ফেলা তাঁবুতে

BanglaBook.org

বসে অপুর মনে পড়ছিল রঞ্জনার কথা, সোনাই-এর কথা। পাঁচদিন আগে গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে অপুরা। গঙ্গোত্রী থেকে ফোনে কথা হয়েছিল রঞ্জনা আর সোনাই-এর সঙ্গে। বদ্রীনাথ না পৌঁছনো অব্দি আর কথা হবে না। অপুদের পথ গেছে চতুরঙ্গী হিমবাহের ওপর দিয়ে। পেরোতে হবে ১৯,৫১০ ফিটের কালিন্দী পাসের দুস্তর বাধা।

এ পথে সফল হতে গেলে শারীরিক সক্ষমতার চূড়ান্তে থাকা দরকার। কিন্তু অপু ভালো নেই। গত দু-তিন দিন ধরে মাথার মধ্যে একটা কষ্ট অপুকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। একটা গা গুলোনো কষ্ট। মাথা থেকে শুরু করে কষ্টটা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। গত ক'দিন ঠিকমতো খেতেও পারেনি। খাবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। কিন্তু বমি হয়ে খাবার উঠে গেছে। দুর্বল লাগছে। কিন্তু এই শরীর খারাপ নিয়েই অপুকে হেঁটে যেতে হবে। পেরোতে হবে ১৯,৫১০ ফিটের পাসটাকে। শুধু পেরোলেই হবে না। তারপরেও হাঁটতে হবে টানা তিন-তিনটে দিন।

দলের অন্যদের অবস্থা তথৈবচ।

অপুর অবস্থা দেখে মোহন বলে, "কেয়া হুয়া, তবিয়ত খারাপ হ্যায়?"

মোহন ওদের গাইড। গঙ্গোত্রী থেকে কালিন্দীপাস হয়ে বদ্রীনাথে গেছে তিন-তিনবার।

অপু চোয়াল শক্ত করে মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছে, না, শরীর খারাপ নয়।

পাহাড়ে বারো-তেরো হাজার ফিট থেকেই শুরু হয়ে যায় গাছপালাহীন রুক্ষ প্রস্তর প্রান্তর। পাথরের পর পাথরের ঢেউ শুধু উঠছে আর নামছে। বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় ভীষণভাবে। ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সাপ্লাই যায় কমে। শুরু হয় মাথা ব্যথা আর গা গোলানো। প্রায় সর্বক্ষণই একটা ঘোরলাগা অবস্থায় থাকতে হয়। রাতে ভালো ঘুমও হয় না। ফলে শরীর বিশ্রাম পায় না। চিন্তা-শক্তি কমে যায়। ভোঁতা হয়ে যায় প্রতিক্রিয়া। তখন ভরসা শুধুমাত্র মনের জোর।

আজ অপুরা যে পথে চলেছে তা সতেরো হাজার ফিটের ওপর। মাথার ওপর ঘন তুঁতে নীল আকাশ আর তীব্র গা-জ্বালানো রোদ। চারিদিকে আকাশছোঁয়া বরফের পাহাড়। কোনো পাহাড় থেকে নেমে এসেছে শুভ্র হিমবাহ। সহস্রধারার ঝরনা নেমে এসেছে অন্য কোনো পাহাড় থেকে। হতবাক

BanglaBook.org

করা, অপার্থিব সৌন্দর্য। কিন্তু এই অপরূপ সৌন্দর্যও আকর্ষণ করতে পারছে না অপুকে। তার সমস্ত শক্তি এক করে অপু শুধু এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যের দিকে। হিমবাহের দু'পাশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে কয়েক হাজার ফিট। মাঝের ফুটখানেক চওড়া একটা সরু পথরেখা ধরে চলা। একটু অসাবধান হলেই গড়িয়ে পড়বে কয়েক হাজার ফিট। এখানে তো পথ বলে কিছু নেই। নেই কোনো নির্দিষ্ট পথরেখাও। সামনে তাকিয়ে যে পথটাকে অপেক্ষাকৃত সুগম মনে হয় সেই পথ ধরে চলা। কখনো চড়াই বেয়ে ওঠা কয়েকশো ফিট, পরক্ষণেই খাড়া উৎরাই ধরে আবার কয়েকশো ফিট নেমে আসা। ওঠার সময় পাহাড়ের ওপর থেকে মাথায় পাথর পড়ার ভয়; নামার সময় পা পিছলে গড়িয়ে পড়ার ভয়।

এদিকে সূর্য ডুবিডুবি। সূর্য ডুবলেই নেমে আসবে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। তাই নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে চলতেই হয় অপুকে। পাহাড় বেয়ে নামতে থাকে শ্বেতা হিমবাহের প্রান্তরের দিকে, যেখানে পড়েছে ওদের তাঁবু। ওর জন্য অপেক্ষা করছে স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণতা, গরম পানীয় আর গরম খাবার।

তাঁবুতে শুয়ে ঘুম আসে না। অপু নিজেকে শুধোয়, এত অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে কেন আসে পাহাড়ে! এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের টানে! পাহাড়কে জয় করার উন্মাদনা! নাকি অন্তরের অতল গভীরে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো ইচ্ছা। আধো ঘুম আধো জাগরণে কাটে রাতটা।

পরের দিন সকাল হতেই জলখাবার খেয়ে আবার শুরু হয় অপুদের পথ-পরিক্রমা। শরীর আর চলতে চাইছে না।

আজকের দিনটা আবার মেঘলা। রোদ না উঠলে এই উচ্চতায় ঠাণ্ডা কষ্ট দেয়। অপু ভাবে, রঞ্জনা আর সোনাইকে ছেড়ে কেন এত কষ্ট সহ্য করে পাহাড়ে আসে! কতদিন খোঁজ পায়নি ওদের। নিজের খবর জানাতে পারেনি রঞ্জনাকে। বদ্রীনাথ পৌঁছতে এখনো পাঁচদিন হাঁটতে হবে।

আজ শিবিরে পড়বে কালিন্দী হিমবাহ। ১৮,৫০০ ফিট উচ্চতায়। সকালে অপুর জন্য দুধেগোলা কর্নফ্লেক্স আসে। গতকাল রাতের খাবার বমি হয়ে উঠে গেছে। এই উচ্চতায় খাবার, বিশেষ করে শক্ত খাবার পেটে রাখা খুবই কষ্টকর। কিন্তু দুধেগোলা কর্নফ্লেক্স খেতে তত কষ্ট হয় না। দলপতি লক্ষ্মীর ডাকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পা টলে যায় অপুর। অভিজ্ঞ লক্ষ্মীর চোখে ধরা পড়ে সে বিচ্যুতি।

BanglaBook.org

"কি হল শরীর খারাপ নাকি?" কোথা থেকে সাহাদা এসে হাজির—অপুদের দলের বর্ষীয়ান সদস্য।

"কে বলল?" —অপুর জিজ্ঞাসা।

"লক্ষ্মী।" বলে যোগ করেন, "চিন্তা নেই। আজ আমি আর আপনি একসঙ্গে হাঁটব।"

যেন নিজে কত সুস্থ? তবুও বাহান্নোত্তীর্ণ এই "যুবকের" আশ্বাস ভালো লাগে অপুর।

বাঁধাছাদা করে যাত্রা করার মুখে মালবাহক ভীমা এসে দাঁড়ায়। লাজুক হেসে বলে—"আপকা স্যাক দে দিজিয়ে।"

বলে কি! কেন রে?

"হাম লে যায়েঙ্গে"—সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ভীমা কোনোকালেই বেশি কথা বলে না।

কোন্ বোলা?—অপুর প্রশ্ন।

পাহাড়ে স্যাক ছাড়া হাঁটতে মানসিকভাবে দুর্বল লাগে।

"মোহন"—সংক্ষিপ্ত উত্তর ভীমার।

গাইড মোহন নয়, লক্ষ্মী এগিয়ে আসে।

দলপতির হুকুম শোনায়, "আজ থেকে কালিন্দীপাস পার না হওয়া অবদি স্যাক ছাড়া হাঁটবেন আপনি। তবে, ক্যামেরা-ব্যাগ আপনাকেই বইতে হবে। ছবিও তুলতে হবে। আমার দু-একটা বেশি।"

মুচকি হেসে সাহাদা সঙ্গত করেন, "পিঠে ভার না নিলে কোনো বিশেষ জন্তুর মতো আপনারও কি পিঠ চুলকোয়!"

রুকস্যাক-বিহীন হালকা হয়ে সবার আগে অপু উঠে আসে সুরালয় বামকের গ্রাবরেখায়। সামনে চতুরঙ্গীর প্রবাহ। পিছনে চন্দ্রপর্বতের চিরতুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গ।

চতুরঙ্গী হিমবাহের বাম গ্রাবরেখা ধরে চলা। খাড়া চড়াই-উৎরাই নেই এ পথে। অবশ্য ১৮,০০০ ফিটের উপরে চড়াই আর কোথায়! পথের নাম গন্ধও নেই। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে চলা। সব পাথরই নড়বড়ে। ফলে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে অপুকে। চলার গতি অত্যন্ত শ্লথ।

পথে কয়েকটা গ্লেসিয়াল লেকের দেখা পেল অপু। বরফগলা জলের

BanglaBook.org

ডোবা। কিন্তু কি অসাধারণ সব রঙ—যেন নীল, যেন একখণ্ড নীলকান্ত মণি, ঘন সবুজ, যেন একখণ্ড উজ্জ্বল পান্না।

স্বভাব-মুখর সাহাদাও আজ নির্বাক।

অপুই নিস্তব্ধতা ভাঙে। "সাহাদাকে বলে, কেমন দেখছেন?"

"এরপর ঘরে ফিরে মন বসবে?" সাহাদা যেন নিজেকে শুধোন।

এইজন্যই তো অপু ফিরে আসে। স্বার্থপরের মতো রঞ্জনা আর সোনাইকে বাড়িতে ফেলে রেখে! ঘরে তার মন বসে কই!

বিকেল চারটে নাগাদ সবাই তাঁবুতে পৌঁছয়। মালবাহক মঙ্গল আর যাদব চা নিয়ে আসে। চা তো নয়, এক কাপ সোনালী উষ্ণতা। কাল রাতে প্রকৃতির ডাকে একবার তাঁবুর বাইরে বেরোতে হয়েছিল অপুকে। ঠাণ্ডার ধাক্কায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। ঠাণ্ডা সামলে, চারপাশে তাকিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে অপু!

মেঘ কেটে গেছে। আকাশ ভর্তি তারায়। কোনদিনও ও আকাশে একসঙ্গে এত তারা দেখেনি।

চারপাশে ধ্যানমগ্ন পাহাড়েরা দাঁড়িয়ে প্রাচীন জটাজুটধারী ঋষিদের মতো। তাদের তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গ থেকে তারাদের আলো প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এই ক্ষুদ্র উপত্যকার কোণে কোণে। নৈঃশব্দ, তারাভরা আকাশ আর সারি সারি শুভ্র কিরীট-শোভিত মৌন পাহাড়—এক ভারি মিস্টিক জগৎ।

অপুর মনে পড়ে বিদ্যাপতির পদ, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু, নয়ন না তিরপিত ভেল।'

অপুরও তো রূপের আশা মেটে না। এই বাহ্যিক রূপ পেরিয়ে কোন্ এক অপরূপের আশা।

সকাল হতেই শিবির গুটিয়ে আবার চতুরঙ্গীর হিমবাহে।

সামান্য এগিয়ে অপু দেখে, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দুই পাহাড়ের মধ্যের গিরিখাত ধরে নেমে এসেছে কালিন্দী হিমবাহ। মিশেছে চতুরঙ্গীর অঙ্গে। চতুরঙ্গীর প্রান্তে শ্বেতা, কালিন্দী আর চতুরঙ্গী হিমবাহের সঙ্গম—ত্রিবেণী সঙ্গম।

আকাশ আজ ঘন নীল। সেই ঘন নীলের পটভূমিতে শ্বেতা পেরিয়ে চিরতুষারাচ্ছাদিত পর্বতের ঢেউ-এর পর ঢেউ।

BanglaBook.org

সুবিধামতো এক পাথরে জমিয়ে বসে অপু। চোখের তৃষ্ণা না মেটা পর্যন্ত সে এখান থেকে এক পা-ও নড়ছে না।

সবাই এগিয়ে যায়। শেষে সাহাদাকে নিয়ে লক্ষ্মী এসে হাজির। আজ সাহাদা কোনোরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছেন। তবুও অপুর পাশে বসে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন—"ওরে লক্ষ্মী, এ কোথায় নিয়ে এলি! এ কি স্বর্গ! বেঁচে আছি না মরে গেছি!"

অপুরা নামে কালিন্দী হিমবাহে। অসংখ্য তুষার-ফাটলে ভরা কালিন্দী। একবার তাতে পড়লে উদ্ধারের আশা কম। সলিল সমাধির মতো তুষার সমাধি। তাই সবাই এক লাইনে একে অন্যের পিছনে পথ চলে। সবার আগে মোহন চলেছে তুষার-ফাটল বাঁচিয়ে।

কিন্তু চলাই যে দায়! এক পা চলে কার সাধ্যি। দু'পা চলেই বিশ্রাম নিতে থামতে হচ্ছে। ক্যাম্প-সাইট আর কতদূর!

অবশেষে সন্ধ্যার মুখে কালিন্দী ক্যাম্পে।

রাতের খাবার আধসেদ্ধ খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা। এত ওপরে কুকারেও চাল-ডাল সুসিদ্ধ হয়নি।

আজ অপুরা সাফল্যের দোরগোড়ায়। প্রকাশ না করলেও সবাই উত্তেজিত। সবাই ক্লান্তির শেষ সীমায়। ১৮,৫০০ ফিটে শুধু শুয়ে থাকলেও পরিশ্রম হয়। এখানে বাতাসে অক্সিজেন এত কম যে নিশ্বাস নেওয়াই পরিশ্রমের।

সকাল থেকেই মোহনের মেজাজ খারাপ। ক্যাম্প থেকে অত্যন্ত বিপনক তুষার-পথে হাজার ফিট চড়াই ভেঙে তবে কালিন্দী গিরিবর্ত্ম-শীর্ষ (১৯,৫১০ ফিট)। যে কোনো গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে হলে যত সকাল সকাল বেরোনো যায় তত ভালো। সকালে পাহাড়ের আবহাওয়া ঠিক থাকে। গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে মারাত্মক তুষারঝঞ্ঝা বা খারাপ আবহাওয়ার মোকাবিলা করতে হয় না। তাই রাতে ঠিক হয়েছিল ভোড় সাড়ে পাঁচটায় বেরোনো হবে। কিন্তু, তা অপুরা পারেনি। শিবির গোটাতে গোটাতে বেজে গেছে সকাল সাতটা।

তাই আর দেরি না করে তুষার-প্রান্তরে নেমে পড়ে সবাই।

সাধারণত এইরকম পথ চলতে লাইফ লাইন বা জীবন-রজ্জু ব্যবহার করা হয়।

BanglaBook.org

অভিযাত্রীরা কোমরে নাইলনের দড়ি বেঁধে নেয়। একই দড়িতে চিন-চার জন করে বাঁধা থাকে, যাকে কেউ ক্রিভাসে পড়লে অন্যরা টেনে তুলতে পারে। কিন্তু, তাতে চলার গতি হয় শ্লথ। অপুদের রওনা হতে হয়েছে দেরি। তাই তাড়াতাড়ি চলার খাতিরে জীবন-রজ্জু ছাড়াই চলা শুরু করে ওরা।

মোহন অভয় দেয়, "কুছ ডর নেহী। আঁপলোগ মেরে পিছে আনা। জাঁহা মেরা প্যার পড়ে, উস্ জাগা পর আপনা প্যার রাখনা।"

আক্ষরিক অর্থেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ।

শুরু হয় অপুদের আরোহণ। প্রথমে মোহন তারপরে অপু আর অন্যরা।

একটা পাথরে (rock band) জায়গা পেরিয়ে ওরা নামে বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্রে। চারিদিকে শ্বেত-শুভ্র তুষার, নরম তুষারে পায়ের গোছ অবদি ডুবে যাচ্ছে। প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয়, এই বুঝি পা পড়ল তুষার ফাটল নামক মৃত্যু গহ্বরে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অপু পরিষ্কার। দু-পা চলেই থামতে হচ্ছে দম নিতে।

সামনে এক পাথুরে দেওয়ালের নীচে পড়ে আছে প্রায় তুষারে ঢাকা এক মৃতদেহ।

কোনো হতভাগা অভিযাত্রীর দেহ।

অপুও প্রায় মৃত। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চায়। এক বৃদ্ধের মতো ঝুঁকে ঝুঁকে শুধু এগিয়ে চলা। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় ব্যথা, ক্লান্তি অবসাদ সব মিলেমিশে হয়ে যায় একাকার। অনুভূতিশূন্য হয়ে শুধু পা পা করে এগিয়ে চলা।

সব কষ্টেরই অন্ত আছে। সব যন্ত্রণারই অবসান হয়।

তাই বেলা এগারোটা নাগাদ, চার ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রমের পর, অপুরা উঠে আসে কালিন্দী গিরিবর্ত্মের শীর্ষে।

যে তুষারপ্রবাহ বেয়ে উঠেছে অপুরা তা শেষ হয়েছে এখানে এসে। অন্য এক তুষারপ্রবাহ ওপার ধরে নেমে গেছে বহু নিচে। এখানে দুদিকে দুটি শৃঙ্গ। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়; ডোমাক-তি অ্যাভালাঞ্চ শৃঙ্ক (২১,১৪০ ফিট) ডাইনে। বাঁয়ে তীক্ষ্ণাগ্র শীর্ষবিশিষ্ট প্রস্তরপূর্ণ কালিন্দী শিখর (২০,০২০ ফিট)। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের ঢেউ। মানা পর্বতের দুই শৃঙ্গ।

BanglaBook.org

অপুর মনে পড়ে, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা—

"শব্দহীন স্তব্ধতায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত...কালিন্দীর শৈলশৃঙ্গে তুষার রাশির শান্ত অমল উজ্জ্বলতা। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অপূর্ব অনুভূতি জাগে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখের সব স্মৃতি কোথায় বিলীন হয়। দেহমন পরম তৃপ্তি ও শান্তিতে ছেয়ে থাকে; মনে হয় হিমালয় পথের এই তো পরম দান।"

সাফল্য! অবশেষে সাফল্য!

চকলেট আর বিস্কিটের পুজো চড়িয়েছে মালবাহকেরা। কে যেন একগুচ্ছ ধূপকাঠিও জ্বেলেছে। সবাই বসে ইতস্তত।

ইতিমধ্যে নীচ থেকে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ জমতে থাকে পাহাড়ের উচ্চ অঞ্চলে। এদিকে সামনে অনেক পথ পড়ে। তাই দেরি না করে নামতে থাকে সবাই। প্রায় ৭০ ডিগ্রি ঢালে নামা। ইতিমধ্যে দলসঙ্গী দীপকের শরীর খুব খারাপ হয়েছে। নিরুপায় হয়ে পিঠের রুকস্যাক নামিয়ে রাখে ও।

স্যাকহীন অপেক্ষাকৃত সুস্থদের দলে প্রথমেই অপুর নাম। তাই লক্ষ্মীর নির্দেশে দীপকের স্যাক নিতে হয় অপুকে।

আবহাওয়া দ্রুত খারাপ হতে থাকে। নীচ থেকে রাশি রাশি মেঘ ঢেকে ফেলে চারপাশ—হোয়াইট আউট। পাঁচ-দশ ফিটের বেশি পরিষ্কার দেখা যায় না। মোহনের তাড়ায় ঢালের মুখে দেহ ছেড়ে প্রায় ছুটে নামতে থাকে সবাই। সেই সকাল থেকে একনাগাড়ে পথ চলা। শুধু কালিন্দী গিরিবর্ত্মের মাথায় সবাই বিশ্রাম পেয়েছে আধঘণ্টা।

আর পারা যাচ্ছে না। অপু দেহ ছেড়ে দেয় নীচের টানে। যা হোক হবে। কোনোরকমে ভারসাম্য বজায় রেখে হড়বড় করে নামতে থাকে। হঠাৎ এক তীব্র ঝাঁকুনিতে শরীর কেঁপে ওঠে। কিছু বোঝার আগেই অপু দেখে কোমর অবদি ডুবে গেছে নরম তুষারে। অনুভব করে, তুষারে ডোবা পা কোথাও ঠেকছে না। পায়ের তলায় অনন্ত শূন্য। মুহূর্তে অপু উপলব্ধি করে তুষার ফাটলে পড়েছে। এক হিমশীতল স্রোত বয়ে যায় শিরদাঁড়া দিয়ে।

এই অভিযানে এই প্রথম তীব্র ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে আসে অপুর। সাক্ষাৎ মৃত্যু একটু একটু করে গিলে নিচ্ছে অপুকে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে বরফে ঢোকার বেগ কিছুটা

BanglaBook.org

কমায় অপু। পিঠের রুকস্যাকও আটকে যায়। তবুও অনিবার্যভাবে একটু একটু করে বরফে ডুবে যেতে থাকে ও।

মুহূর্তের জন্য ভেবে ওঠে রঞ্জনা আর সোনাই-এর মুখ। মনে পড়ে ছেলের প্রশ্ন, 'কবে ফিরবে বাবা'।

আর কি ফেরা হবে! হিমশীতল মৃত্যু যে একটু একটু করে গিলে নিচ্ছে অপুকে। কোমর থেকে বুক অবদি চলে এসেছে হিমশীতল মৃত্যুর পরশ। আর কয়েক মিনিট। তারপরেই তুষার-সমাধি। সমস্ত চিন্তাশক্তি লোপ পায় অপুর। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল-ভয়ের অনুভূতি উঠে যায় মস্তিষ্কে। নির্বোধের মতো নিঃসাড়ে একটু একটু করে, ধীরে ধীরে অপু ডুবে যেতে থাকে তুষারে।

এই সময়ে অপুকে ক্রিভাসে ডুবে যেতে দেখে, ওদের বোঝা ফেলে ছুটে আসে হীরা আর চন্দ্রমোহন—দুই মালবাহক। সাবধানে নিজেদের ক্রিভাস থেকে বাঁচিয়ে অপুর দুপাশে দাঁড়িয়ে ওর দুহাত ধরে টানতে থাকে ওপরের দিকে।

ওরা হাত ধরে টানে। বোধশক্তি ফিরে আসে অপুর। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে এখন। ওরা হাত ধরে টানে আর অপু গোড়ালি দিয়ে বরফের দেওয়ালে চাপ দিয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে মৃত্যু-গহ্বর থেকে উঠে আসে অপু।

একটু সরে এসে অপু শুয়ে পড়ে নরম তুষারে। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে বরফের ওপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে অপু ভাবে, বদ্রীনাথের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে আর রঞ্জনা-সোনাই-এর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে, এই মৃত্যুসঙ্কুল পথে এখনো হাঁটতে হবে তিনদিন।

BanglaBook.org

# জাতিস্মর

## সফিউন্নিসা

তারপরে, লাল আলোর এক সর্পিল রেখা পাহাড় থেকে পাহাড়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বয়ে গেল। উপরে অখণ্ড আকাশ। তারারা মুখ

লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। বিশাল এক খণ্ডহরের ঠিক মাঝখানে সিমেন্টের গ্যালারিটাও কখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। চারদিকে বৃষ্টির শব্দ, বিরামহীন। ঝলসে উঠল বিজলী, গুম গুম শব্দে মেঘের পাহাড় ভাঙছে। এক এক ঝলকে চকিতে জেগে উঠছে সামনের উঁচু ঝরোখার আভাস, বিশাল বিশাল থাম-ছাদহীন নিরালম্ব, চারদিকে কিছু অশরীরি অস্তিত্ব যেন জরিপ করছে সবকিছু।

আর তখনই, দূরে কোথায় অশ্বক্ষুরের শব্দ। থেমে গেল হঠাৎ, দরজায় মৃদু করাঘাত—'আমি এসেছি প্রিয়তমা'—গম্ভীর মৃদু পেলব সেই আহ্বান। ঘরের ভেতর থেকে একটু আগে ভেসে আসা চাপা কান্নার রেশটুকুও তখন থেমে গিয়েছে। বেজে উঠল অমিতাভ বচ্চনের গমগমে ব্যারিটোন কণ্ঠস্বর—তারামতি কি পেরেছিল শেষপর্যন্ত তার ভিনধর্মী দয়িতের সঙ্গে মিলতে! পাহাড় চূড়ায় একটি আলোর বিন্দু তখনো জ্বলছে।

দু-ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়তেই সম্বিত ফিরে এল। গোলকুণ্ডা ফোর্টের লাইট অ্যান্ড শ্যাডোতে তখনো সবাই আবিষ্ট। পথে বেরিয়ে আর্য জিজ্ঞাসা করল, হাঁটতে পারবে? এখান থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার, অনেকেই হেঁটে ফিরছে। অমাবস্যার অন্ধকার যেন চারদিকে বিছিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর হিমেল চাদর।

হাঁটতে হাঁটতে কখন এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চলে এলাম আমরা। হাঁটছি আর হাঁটছি। পথ অফুরান। হঠাৎ মনে হল ভুল দিকে যাচ্ছি না তো আমরা! এ ধ্বংসনগরী কবেকার? কোথাকার? এত নির্জন চারদিক! মানুষের কোনো চিহ্ন কিংবা সাড়াশব্দ কোথাও নেই। অনেক দূরে কাদের যেন আবছা অবয়ব কুয়াশা ভেদ করে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। তাদের আক্রমণাত্মক শরীরী ভাষা। জোরে পা চালালাম। ওই তো কুয়াশামাখা শরীরগুলি—কাকে মারছে ওরা নির্মমভাবে। নিশি পাওয়া মানুষের মতো এগিয়ে গেলাম। চাপা কান্না আর আর্তনাদ স্পষ্ট কানে এল—এই সেই অপরূপ সুন্দর মেয়েটি! প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো, আবছা অন্ধকারে যেন অনন্য এক বিভায় ভাস্বর। বন্ধ দরজায় কোন্ এক শাহজাদার করাঘাতের আগে যার চাপা বিলাপ শুনেছিলাম— সেই একই কণ্ঠ। অসহায় আকুতি—ছেড়ে দাও তোমরা আমাকে! আমি চলে যাচ্ছি এই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, এই দেশ ছেড়ে। তোমরা ওকে বাঁচতে দাও, ছেড়ে

BanglaBook.org

দাও আমাকে।...শব্দটা থেমে গেল। দৃষ্টিবিভ্রম কিনা জানি না, একটা ধূসর পর্দা মঞ্চের ড্রপসিনের মতো যেন নেমে এল সামনে ধীরে ধীরে। কনকনে এক দমকা হাওয়ার স্রোত বয়ে গেল তার ধারাল জিহ্বা বাড়িয়ে। কেমন যেন শিহরণ শরীর জুড়ে।...দূর থেকে কেউ যেন ডাকল আমায়—'এ কী! তুমি চোখ বন্ধ করে হাঁটছ নাকি? এইরকম সরে সরে যাচ্ছ কেন? এ-ই কী হল তোমার? আর্য আমার হাত ধরে জোর ঝাঁকুনি দিল একটা। চমকে উঠলাম—আরে! আমি—আমি কোথায়? একটু আগে যা দেখলাম, কোথায় গেল সব?

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? আর্যর ব্যাকুল প্রশ্ন। হতভম্ব আমি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন আমি এখানে, এই প্রায় নির্জন রাজপথে, পাশের এই মানুষটিই বা কে? সম্ভবত ঘাবড়ে গিয়ে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল আর্য। আমার দু-কাঁধ ধরে বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিল, আমার মুখের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে কেমন একটা কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করল—কী হয়েছে তোমার! তোমার চোখমুখ স্বাভাবিক লাগছে না। চলো—আমার হাত ধরো। প্রায় এসে গিয়েছি আমরা। ওই আমাদের হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। কোথায় আলো? হঠাৎ পিছনে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ কানে এল। এক পলকে যেন অন্ধকার ফুঁড়ে গাড়িটা এসে দাঁড়াল সামনে। কোচোয়ান মাথাটা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানানোর ভঙ্গি করে প্রশ্ন করল—'আপলোগ কাঁহা জানা চাহতে হ্যায়?

আর্য উত্তরে পালটা জিজ্ঞাসা করল—'তারামতি বেরাদরি হোটেল আপ জানতে হ্যায়'?

—জরুর, আপলোগ আইয়ে।

গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। পলক পড়ার আগেই আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলাম আলোর ঝালরে সাজানো তারামতি বেরাদরির সিংহদরজায়। চোখ ফেরাতেই হতবাক—কোথায় সেই ঘোড়ার গাড়ি, কোচোয়ানই বা কই! আমরা দু'জনেই কেমন যেন পাথর হয়ে গেলাম।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আমরা বিশাল গেট দিয়ে ঢুকে পড়লাম। রঙিন নুড়ি বিছানো চওড়া পথ—দু পাশে বাহারি ফুলের গাছ। ডানদিকে বিরাট ক্যান্টিন—আলো জ্বলছে, তবে লোকজন কম। শহর থেকে প্রায় বাইশ

BanglaBook.org

কিলোমিটার দূরে কে-ই বা থাকতে চায়। আমরা নির্জনতাপ্রিয়, অতীতচারী বলেই না এখানে আসার প্ল্যান। বাঁদিকে সুদৃশ্য ফুলের বাগান পেরিয়ে পথ ঘুরে গিয়েছে। রিসেপশানে কালোকোলো ভালোমানুষটি হাসির একটু আভাস ফুটিয়ে মাথা নাড়ল। আমরা ডানদিকের করিডোর ধরে এগিয়ে গেলাম। একেবারে শেষপ্রান্তে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট।

সেগুন কাঠের ভারী দরজা। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতেই সুগন্ধি অম্বুরি তামাকের গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। আমাদের ক্ষণিকাবাসের ড্রয়িংরুমটি আগাগোড়া দামি কার্পেটে মোড়া। বিশাল বিশাল সোফাসেট ও দারুণ এক বাদশাহী কৌচ দিয়ে সাজানো। পাশেই ঝকঝকে পিতলের ফুরসি—লম্বা নল, তাম্রসেবনের পরিপাটি বন্দোবস্ত। বড় দুটি ফুলদানিতে টাটকা তাজা লাল গোলাপ চিনামাটির বিশাল একটা জলাধার—তাতে পরিষ্কার টলটলে জলে শোভা পাচ্ছে ভেসে থাকা ক'টি শিউলি। ঝাড়লণ্ঠনের মৃদু মায়াবি আলোয় ঘরখানিকে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। সোফায় গা এলিয়ে দিলাম দু'জনে এবং চমকে উঠলাম এত উষ্ণ কেন সোফা? এইমাত্র কেউ যেন উঠে গিয়েছে, রেখে গিয়েছে তার শরীরের উত্তাপ। দু'জনেই তাকালাম দু'জনের দিকে—একই প্রশ্ন, সংশয়—কিন্তু কেউ কারও কাছে স্পষ্ট হলাম না।

একটা অদ্ভুত অনুভূতি, মনে হচ্ছে কেউ যেন অলক্ষ্যে থেকে দেখছে আমাদের। পর্দার ঠিক ওপারেই তার উপস্থিতি। আমি সরে গেলাম আর্যর পাশে। আর্য মুখে কিছু না বলে ধীরে ধীরে আমাকে কাছে টেনে নিল, তারপরে অদ্ভুত এক গলায় বলল—চলো শুয়ে পড়ি। আমি ঠিক এমন কিছু শুনতেই চাইছিলাম। চাইছিলাম এই ঘর ছেড়ে যেতে।

দু'পা এগোলেই শোওয়ার ঘর। পা দুটো যেন কেউ স্ক্রু দিয়ে মেঝের সঙ্গে এঁটে দিয়েছে। কোনোরকমে এলাম দু'জনে। শানদার পালঙ্ক। নকশাদার ছত্রি। শরীর ডুবে যাওয়া গদি। নীলাভ পর্দা, সাদা ঝালর। ঘরের প্রতিটি লাইটে মুকুট পরানো। তাতে আলোর ছায়ার মৃদু খেলা ঘরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন রচনা করেছে। পিতলের টিপয়ে রুপোর ট্রে। তাতে কাটগ্লাসের সারি বসানো। পাশে ঠাণ্ডি মেশিনে মৌতাতের হরেক আয়োজন। আমার যেন কেমন অনুভূতি—মনে হচ্ছে এসব যেন আমার বড় চেনা। কবে যেন, কোথায় যেন, আজকের এই তারামতি বেরাদরি প্রাসাদ সাজানো হয়েছিল আমারই জন্য।

BanglaBook.org

এখানে আমাকে আসতেই হত। এ যেন আমার বড় আপন নিজস্ব জায়গা।

অনেক দূর থেকে কে যেন কিছু বলছে আমায়। আর্য! হ্যাঁ আর্যই তো! আমার হাত ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল—স্বপ্ন দেখছ নাকি! কী সব বলছ বিড়বিড় করে! শুয়ে পড়ো—এসো।

আলোগুলো নিভিয়ে দিল আর্য। নাইট ল্যাম্পটা জ্বালতেই ঘরটা রূপান্তরিত হল একটা অন্য অস্তিত্বে। চাপা একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলাম। আর্যর মুখের দিকে তাকালাম—স্পষ্ট একটা ভয়ের চিহ্ন ওর চোখেমুখে। আমরা কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। শুয়ে পড়লাম।

নীল সরোবরে ভেসে চলেছি। এই ময়ূরপঙ্ক্ষীটা খুব ছোট, ঠিক দু'জনের মতো। কারিগরকে রীতিমতো নির্দেশ দিয়ে বানানো। কুঠ আর শঙ্খের সূক্ষ্ম জালিকাজে এমনভাবে ঢাকা যে বাইরের কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আর আমরা! আমাদের বাইরে তাকানোর সময় কোথায়? শুধু চোখ—নিবদ্ধ আরও দুটি চোখে। আমার হাতদুটি হারিয়ে গিয়েছে ওর দুটি কোমল অথচ বলিষ্ঠ করতলে। কত কথা বুকের ভেতর! সে বলল—কিছু বলো। বলল, এই রাত যদি আমার জীবনের শেষ রাত হয়, দুঃখ পেয়ো না। জীবন আমার অনন্ত হল আজ। দুনিয়ার বুকে এই শরীরটা না থাকলেও আমার অস্তিত্ব রয়ে যাবে যুগ যুগ ধরে। ঠিক এভাবেই।

প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল কোথাও। বাজ না কামানের শব্দ! ক্ষীণ আলোর অসংখ্য বিন্দু ছুটে আসছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে আলোগুলি, ওগুলো মশালের আলো—অকম্পিত কণ্ঠে বলে সে। একটু বাদে অশ্বক্ষুরধ্বনি। অনেকগুলি। আমাকে ঝটিতি উঠিয়ে নিয়ে বলল— পালাতে হবে। এখুনি। প্রবল শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার। তীব্র আতঙ্কে চোখ বুজে আসছে। আজ রাতেই কি আমার যাবতীয় স্বপ্ন, যাবতীয় বুভুক্ষা আর আশঙ্কার অবসান। হে ঈশ্বর!

বন্ধ দু'চোখ মেললাম জোর করে। তাকালাম ওর মুখে। পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেন উড়ে চলেছে সে। বড় সুন্দর ওর মুখ, কী গভীর দীঘল চোখ ওর। প্রাণপণে ওকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করছিলাম আমি। চড়াইপথের পরিশ্রমে ওর দরাজ বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। চুপি চুপি

BanglaBook.org

বললাম—আমি একা বাঁচতে আর পারব না, যা হওয়ার একসঙ্গেই হোক। আমি জানি ওদের হাতে ধরা পড়লে...হত্যাকারীদের আমি বিশ্বাস করি না... তার চেয়ে ঝাঁপ দাও নীচে, গভীর খাদ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। চিরকালের পুরুষালি কৌশলে আমার কথা বলা বন্ধ করে দিল সে।

বৃষ্টি নামল হঠাৎ। বিদ্যুতের তীব্র রেখা মাঝে মাঝে ফালা ফালা করে দিচ্ছে আকাশটাকে। চারদিকে শুধু বৃষ্টির শব্দ। আমরা পরস্পরকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছি। অনন্ত সময় বয়ে যায়। আমার ভেতরে আর কোনো অনুভূতি কাজ করছে না। যেন পৃথিবীর আদিলগ্ন থেকে এভাবেই আমরা চিত্রার্পিতের মতো চিরকালের যক্ষরূপে গণনা করে চলেছি পল, অনুপল, আয়ুর প্রহর।

কত শতাব্দী কেটে গিয়েছে কে জানে! হঠাৎ আগুনের তীব্র উত্তাপ। ঝলসে যাচ্ছে শরীর। চারদিকে শব্দহীনতা ভেঙে যাচ্ছে অতিদূর থেকে ভেসে আসা ভজনের সুরে। চোখ মেলা দায়—এমন তীব্র আগুন। প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ খুললাম—এ কোথায় আমি? রেটিনায় তীব্র জ্বালা। এই বিপন্ন, বিভ্রান্ত সময়ে আল মাহমুদ আমার চেতনাকে জাগিয়ে তুললেন। দেখলাম—'চারপাশে ইতস্তত ইট আর কোনো প্রাসাদোপম অট্টালিকার/ধ্বংসাবশেষ দেখে, আমার ভুল ভাঙল। /আমি দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকালাম। মনে হল,/ অভিশপ্ত নগরীর নির্জন রাজপথে আমি দাঁড়িয়ে আছি।/আমার ভয় হল, অথচ মনে হল বড় চেনা/কে আমাকে এখানে আনলো?/তবে কি আমি ভুল করে/রাতের অন্ধকারে অবলুপ্ত নগরী মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে এসেছি?"

এই প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি। শুধু মনে আছে, দু'জন সিকিউরিটি গার্ডের চেঁচামেচিতে আমার চেতনা ফিরে আসে। ওরাই দুজন আমাকে ধরে ধরে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল সামনের ওই উঁচু খাড়াই সবুজ টিলা থেকে। ভেজা, নরম জমিনে আমার পা বসে যাচ্ছিল বারবার। নীচে নামার পরে আর কিছু মনে নেই। নার্সিংহোমের কেবিনে যখন আবার নিজেকে আবিষ্কার করি, তখনো আমার চেতনা কুয়াশামাখা। মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে আর্যর আবছা মুখ।

দু'দিন পরের এমার্জেন্সি টিকিট কেটে সকালের ফ্লাইটেই ফিরে আসি

BanglaBook.org

আমরা। আমি কখন, কীভাবে ওই উঁচু টিলায় চলে গিয়েছিলাম কে জানে! ভোরে ঘুম ভেঙে আমাকে না দেখতে পেয়ে আর্য হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু করে দেয় হোটেলে। দরজা ভেজানো দেখে সবাই ধরে নেয় আমি বেরিয়ে গিয়েছি। কেউ বলছে শখ করে হাঁটতে বেরিয়েছে। কেউ বলছে ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারে। হোটেল-কর্মীরা সংলগ্ন বিশাল সুইমিং পুল আর গার্ডেনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চষে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত থানায় এফ আই আর করে আর্য।

সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ দু'জন সিকিউরিটি গার্ড গতরাতের প্রবল বৃষ্টিতে ফুলগাছগুলির কী দশা হয়েছে তা দেখতে গিয়ে ঝাঁকড়া ছাতিম গাছটার গোড়ায় আমাকে আবিষ্কার করে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। আমার গোটা শরীর ভিজে জবজব করছে, গা-এ ধুম জ্বর। গত রাতে সাড়ে বারোটা নাগাদ বৃষ্টি নামে, রিসেপশনিস্ট তখনো ডিউটিতে ছিলেন। তার মানে আমি গভীর রাতেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

# বক্তিয়ারপুরে একটি রাত

## গৌর বৈরাগী

ছ'টা তিরিশ নাগাদ সিডিউল টাইম। সেই হিসেবে ঠিক ছ'টাতে পৌঁছে গেছি স্টেশনে। একটা বড় বেডিং, বড় অ্যাটাচি দুটো, আর সব ছোটখাট ব্যাগ। অ্যাটাচি আর বেডিং কুলির দায়িত্বে। ব্যাগ হাতে আমরা প্ল্যাটফর্মে। জংশন স্টেশন। মাইকে ঘন ঘন অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। তিন নম্বরে একটা আপ ট্রেন এইমাত্র এসে থামল। এক নম্বরে দানাপুর প্যাসেঞ্জার তখনো দাঁড়িয়ে।

চারপাশ জুড়ে চরম ব্যস্ততা। হকারদের চিৎকার। কুলিদের সঙ্গে দরদস্তুর। যাত্রীদের হাঁকাহাঁকি। এই ব্যস্ততার ভেতর কুলি বলল, কৌন টিরেন বাবু?

BanglaBook.org

বললাম, দিল্লি-হাওড়া জনতা এক্সপ্রেস। এম সেভেন কামরাসে উঠানা পড়েগা।

কুলি মাথা থেকে বেডিং নামিয়ে হাসল। বলল, দিল্লি জন্‌তা দো ঘণ্টা লেট চলতা হ্যায়। আপলোগ ঠহরিয়ে ইঁহা। হাম ঠিক টাইম পর আ জায়গা বাবু।

এই ফিরতি পথে দু'ঘণ্টা লেট এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টও নেই যে সময় নিয়ে উদ্বেগ হবে। স্টেশনে পৌঁছে গেছি এটাই যথেষ্ট। একটা ফাঁকামতো জায়গায় কাগজ বিছিয়ে বসে পড়া হল।

আমাদের দলে সেবার মোট আটজন ছিল। আমি আমার মা আর আমার স্ত্রী জয়া। বছর দুয়েক বিয়ে হয়েছে আমাদের। সঙ্গে জয়ার মা বাবাও এসেছেন। আর সঙ্গে আমার বন্ধু অমল আর ওর মা। সঙ্গে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী প্রীতি। তিরিশের মধ্যেই আমাদের বয়স।

সেই প্রথম আমাদের রাজগীর বা রাজগৃহ ভ্রমণ। বোধ হয় তিনদিনের ট্যুর ছিল। শীতকালে জায়গাটা ভারি মনোরম। চারপাশে মাতি-উচ্চ পাহাড়। ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসের টুকরো। ধ্বংসপ্রাপ্ত নালন্দার ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য, রোপওয়ের রোমাঞ্চ আর উপরি পাওনা হল উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান। সবই প্ল্যান অনুযায়ী চলেছে।

রাজগীর থেকে বাসে বক্তিয়ারপুর জংশন। এখানেই এসে ট্রেন ধরতে হয়। তখন রাজগীর পর্যন্ত কোনো ট্রেন লাইন ছিল না। এখান থেকেই কলকাতা যাবার বেশ কটা ট্রেন পাওয়া যায়। দিল্লি-হাওড়া জনতা ছাড়াও, দানাপুর এক্সপ্রেস, দিল্লি-শিয়ালদা এক্সপ্রেস, অমৃতসর-হাওড়া মেল।

আমাদের গাড়ি দু-ঘণ্টা লেট। রাইট টাইম সাড়ে ছ'টা হলে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে আসার কথা। জংশন স্টেশনে রাত আটটা কোনো রাতই নয়। দু ঘণ্টা সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মাসটা ডিসেম্বর, বেলা ছ'টাতেই ঘন হয়ে রাত নেমেছে। হাওয়ায় শীতের ছোবল। আলো জ্বলে উঠেছে চারপাশে। আজকালকার মতো মার্কারি ভেপারের সাদা আলো নয়। একশো কিংবা দুশো ওয়াটের বাল্ব। তা থেকে হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। থিকথিক করছে ভিড়। বুক থেকে ফিতে দিয়ে ঝোলানো ঝুড়িতে মোমফালি, সিলভারের ডেকচিতে গরম সামোসা। হাতে ঝোলানো বড় কেটলিতে

BanglaBook.org

তিনফুটি চা। খবর আনল অমল। স্টেশনের হাতায় তোলা উনুনে গরম গরম লিট্টি বিক্রি হচ্ছে। সঙ্গে মুলো আর আচার। শালপাতার ঠোঙায় করে তাই কটা আনা হল। যদিও খুব একটা দরকার ছিল না। রাতের খাবারের আয়োজন রাজগীর থেকেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আসলে দু'ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। তাই লিট্টি।

জিনিসটা মুখে তুলেছি কি তুলিনি একটা ডাউন প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এখানেই যাত্রা শেষ। কামরা ফাঁকা করে সব যাত্রীই নেবে গেল। গ্রামগঞ্জের দেহাতি মানুষ। যার যার নিজস্ব লব্জে কথাবার্তা। কান পেতে শুনলেও মর্মোদ্ধার করা যাবে না। চলমান জনস্রোত। কোথা থেকে আসা যাবেই বা কোথা কিছুই বোঝার উপায় নেই। তবে দেখা গেল দ্রুত প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে গেছে। তখনই মাইকের ঘোষণা শোনা গেল, হাওড়াগামী এক্সপ্রেস ট্রেন এক নম্বরে আসছে। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা বাজছে। হিসেব মতো আরো একঘণ্টা বাদে আমাদের নির্ধারিত গাড়িটা ঢুকবে।

আসলে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণই ছিল না। অন্তত তখনো পর্যন্ত তার কিছুই আঁচ পাওয়া যায়নি। সেই রাতে যে একটা আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে সন্ধেবেলা তা ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি। শুধু তখনই বা কেন, ঘড়িতে আটটা বেজে গেলেও কোনো ঘোষণা না শুনতে পেয়ে স্টেশন-মাস্টারের অফিসে খোঁজ নিতে গেছলাম। হাওড়া-জনতার খবর কি?

স্টেশন-মাস্টার খুব ব্যস্ত হয়ে খাতায় কলম চালাচ্ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, তিন ঘণ্টা লেট।

বিশ্বাস হয়নি। ঠিক শুনলাম তো। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করাতে খাতা থেকে মুখ তুলেছিলেন মানুষটি, হাঁ জী, তিনঘণ্টা লেট চলতা হ্যায়।

তার মানে আরো একঘণ্টা লেট বেড়ে গেল। হিসেব বলছে রাত সাড়ে ন'টায় ইন করবে আমাদের ট্রেন। এটাও এমন কিছু রাত নয়। তার ওপর জংশন স্টেশন বলে ব্যস্ততা কোলাহল সবই থাকবে সঙ্গে। এরকম যখন ভাবছি তখনই একজন সহযাত্রী ভয়টা ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে রাজগীরেই আলাপ। তিনিও সপরিবারে এসেছেন। জায়গা তো আসলে ছোটই। আড়াই তিন কিলোমিটার রেডিয়াসে ঘোরাঘুরি।

BanglaBook.org

তাই বার দুয়েক দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। একবার রোপওয়ে যেতে আর একবার নালন্দায়। সেই সন্ধ্যায় তিনিই এগিয়ে এলেন প্রথম। আপনাদের কি জনতায় টিকিট?

বললাম, হ্যাঁ হাওড়া-জনতা। গাড়িটা তো এতক্ষণ ছেড়ে চলে যাবার কথা। কিন্তু তিনঘণ্টা লেট চলছে।

তাহলে কী করবেন? ভদ্রলোকের গলায় উদ্বেগ।

হাসলাম, কী আর করব, অপেক্ষা ছাড়া...

সেটা কি ঠিক হবে।

কেন?

তাহলে লেট গাড়ির আর টাইমের ঠিক থাকে না। তিনঘণ্টাটা চার হতে পারে। পাঁচ ঘণ্টা হলেও কিছু বলার নেই। তেমন হলে কিন্তু খুব বিপদে পড়ে যাবেন।

সেই প্রথম বিপদের কথায় উৎকর্ণ হয়েছি। বিদেশ বিভুঁই, কতরকম বিপদই তো থাকে। তবে এসময়েই তো মানুষ পাশের জনের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেই ভেবেই ভদ্রলোক বলেন, এক কাজ করতে পারেন আপনারা।

কী কাজ?

আমাদের গাড়ি ন'টা চল্লিশ, তা ধরুন দশটা নাগাদ ছাড়বে। দিল্লি-শিয়ালদা এক্সপ্রেস। আপনাদের টিকিটেই এ গাড়িতে ওঠা যাবে। শুধু রিজার্ভেশনটা করিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু তার আগেই যদি জনতা এক্সপ্রেস এসে যায়।

তাহলে তো মিটেই গেল। কিন্তু যদি আরো লেট বাড়ে তাহলে আপনাদের শিয়ালদা এক্সপ্রেস ধরাটাই ঠিক হবে। আপনাদের সঙ্গে তো আবার লেডিজরাও রয়েছেন।

বললাম, সে কারণেই তো অসুবিধে। রিজার্ভেশন ছাড়া উঠব কোথায়। জেনারেল কামরায় কি যাওয়া সম্ভব।

তা ঠিক। ভদ্রলোক বললেন। শিয়ালদা এক্সপ্রেসের একটা স্লিপার বগি এই বক্তিয়ারপুরে যোগ হয়। বগিটা এখানেই কেটে রাখা থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, কয়েকটা বার্থ ফাঁকা পেতেও পারেন।

BanglaBook.org

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। খুঁজে পেতে টিটিকে পাওয়া গেল। গাড়ির সঙ্গে উনিই যাবেন। সমস্যাটা বললাম। তিনি বললেন, হাঁ জী হো জায়গা। বলে যে ভঙ্গিতে টাকাটা উল্লেখ করলেন তাতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। ঘুষের অঙ্কটা যে বড় শুধু সে কারণে নয়। লোকটার গলায় পাকা ব্যবসাদারিত্ব। অন্যদিকে তখন আমাদের বয়সটা, তিরিশ একত্রিশ। বিবেকগুলি খুবই জাগ্রত। মনের জোরও কম নেই। তাতে হল কি শিয়ালদা এক্সপ্রেসে যাবার ইচ্ছেটা মাঠে মারা গেল।

ওদিকে সময়মতো গাড়িটা এসে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ইন করল। বক্তিয়ারপুরের বগিটা আমাদের সামনেই মূল গাড়িতে জোড়া হল। এবং রাত এগারোটা নাগাদ গাড়িটা ছেড়ে দিল। এটাই বোধ হয় শেষ গাড়ি। কেননা অন্যগাড়ির অপেক্ষমাণ কোনো যাত্রী আর প্ল্যাটফর্মে ছিল না। সারা প্ল্যাটফর্ম শূন্য খাঁ খাঁ। হকারদের চিৎকার চেঁচামেচি হঠাৎ থেমে গেল। বেশ অবাক হয়ে দেখলাম আমরা এই কজন ছাড়া আর কেউ অপেক্ষায় নেই। তার মানে হাওড়া-জনতার যাত্রী বলতে শুধু আমরাই। তখন সবাই মিলে ঠিক করা হল, ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের চত্বর না থেকে ওয়েটিং রুমের ঘেরাটোপে বসা যেতে পারে।

দরজা জানলা নেই। শুধু সামনে খোলা প্রবেশ পথ। মোটা মোটা দেওয়াল। দেওয়াল ঘেঁষে ভারী ভারী কাঠের বেঞ্চ, মাঝখানে একটা বড় টেবিল। দুশো ওয়াটের বাল্ব হলুদ আলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বেঞ্চের নীচে দুটো তাগড়াই কুকুর ঘুমচোখে আমাদের দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। চারপাশ এত খোলামেলা, যে কেউ, যখন ইচ্ছা ভেতরে চলে আসতে পারে। এসময় কোনো যাত্রীর কথা মনে আসছে না। কেননা ঘড়িতে প্রায় রাত বারোটা। এবং জায়গাটা বিহার। আরো বেশি করে বললে জায়গাটা বক্তিয়ারপুর।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। তখনো বিহারের একটা অঞ্চল ঝাড়খণ্ড নামাঙ্কিত হয়নি। বিহার সম্পর্কে বাঙালিদের ধারণাটা খুব একটা উচ্চস্তরের ছিল না। ভয়, সন্ত্রাস, গুণ্ডারাজ-এর সমার্থক ছিল বিহার। এর মধ্যে বক্তিয়ারপুর নামেই ছিল বিখ্যাত। সেদিন রাত বারোটায় এই

BanglaBook.org

আবহের মধ্যেও কেউ কাউকে সাবধান করিনি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা সকলেই কমবেশি টের পেয়েছিল।

ভ্রমণ শেষ করে ফেরার পথে ছিনতাই করার মতো কোনো রসদ আমাদের কাছে ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল পঁচিশের আশেপাশে জয়া আর প্রীতি। কি জানি কেন বৃদ্ধ বাবা মায়েরা ওই দু'জনকে চারদিক থেকে আগলে রেখেছিল। সম্মান লুঠ হয়ে যাবার ভয় টাকাকড়ির চেয়ে কম নয়।

আর আমরা দুজন ওই ফিনফিনে শীতে পায়ে বুট মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ, ফুলস্লিভ সোয়েটারে এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো হেঁটে যাচ্ছি। সাবধানী পদক্ষেপ, সতর্ক চাউনি। তখনই একটা লোককে দেখা গেছল। প্ল্যাটফর্মের ওমাথা থেকে হেঁটে আসছে এদিকেই। হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে টাল খাচ্ছে। হয়তো নেশায় চুর। এমন মাতালেরা খুব বিপজ্জনক হয়। এসময় শারীরিক সক্ষমতা না থাকলেও লাগামহীন মুখের তোড়ের কাছে আশেপাশের মানুষ সতর্ক থাকে।

ভেবেছিলুম লোকটা নিজের মনেই ওয়েটিং রুম পেরিয়ে যাবে। কিন্তু গেল না। কী খেয়াল হল, খোলা ওয়েটিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল। ভেতরে দুশো ওয়াটের বাল্ব হলুদ আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাতে সব দৃশ্যই বেশ স্পষ্ট। সেই দৃশ্যের দিকেই কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল লোকটা। রাত বারোটায় এমন দৃশ্য আগে কোনোদিনই দেখেনি। তাই হয়তো এবার ভেতরে পা রাখবে। এই দৃশ্যের সামনে আমরাও টেনসড্। মাতালটার ভাবগতিক লক্ষ্য করছি।

মুখে একমুখ দাড়ি। ময়লা ঝুল জামা। তার ওপর একটা নোংরা কম্বল। মুখ ফেরাতেই আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। কোনো কথাবার্তার বিনিময় হবার আগেই লোকটা উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল।

চাপা শ্বাস ফেলে অমল ঘড়ি দেখল। তারপর চাপা গলায় বলল, লেট নির্ঘাৎ আরো বেড়ে গেছে। আর একবার টাইমটা জেনে আসি চল।

আমি বললুম, কোনো লাভ নেই। গিয়ে শুনব লেট আট ঘণ্টা হয়ে গেছে। লেট না থাকলে নির্ঘাৎ অ্যানাউন্সমেন্ট হত।

আমার কথাটা যদি ঠিক হয় তাহলে রাত দুটো পর্যন্ত এখানে থাকতে হচ্ছে। ভাবতেই হু হু করে ভয় ঢুকে পড়ল ভেতরে। গভীর রাতের আলাদা

BanglaBook.org

একটা অনুভূতি থাকে। তার ওপর যদি সেটা এমন একটা অজানা অচেনা জায়গা হয়। দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক ভয়ংকর শোনায়। তার মধ্যেই স্টেশনের বাইরের রাস্তায় একটা ভয়ার্ত চিৎকার ওঠে...

বাচাইয়ে, বাচাইয়ে...

মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বাঁচাও বাঁচাও বলে নির্জন রাস্তা ধরে কেউ প্রাণ ভয়ে ছুটে যাচ্ছে। তার পেছনে উদ্যত অস্ত্র হাতে ঘাতক।

অমলকে নিয়ে দ্রুত এ.এস.এম. অফিসে যাই। এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তখনো খানিক আগের সেই ভয়ার্ত চিৎকার বাতাসে ভাসছে। কিন্তু স্টেশন মাস্টারের ওদিকে কোনো হেলদোলও নেই। মাঙ্কি ক্যাপে মাথা মুড়ে একমনে তিনি কাজ করছেন।

হয়তো এটাই দস্তুর এই বক্তিয়ারপুরে। ওটা হয়তো রাতের অন্ধকারে দু'দলের এলাকা দখলের লড়াই। খুন কিংবা ছিনতাই। কারো বা বাঁচার জন্য তীব্র আর্তরব। রাস্তার ওই আঁচ যে কোনো মুহূর্তে এই প্ল্যাটফর্ম চত্বরে এসে পড়তেই পারে। যতই রেলটা সরকারি সম্পত্তি হোক, যতই এ জায়গায় পাবলিকের অবাধ প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকুক, এখানে রাতগুলি শাসন করে ওরাই। সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি সবই তখন ওদের দখলে।

প্রায় অনুনয়ের গলায় স্টেশন-মাস্টারকে বলি, স্যার আপনার অফিস ঘরে যদি আমাদের জানানাদের একটু শেলটার দেন।

নেহি। স্টেশন-মাস্টার নিষ্প্রাণ-গলায় নিদান হাঁকেন, আপলোগোকো ওয়েটিং রুমমেহি-ই রহনে পড়েগা।

কথাটা শুনে জয়া বলল, রাতটা কাছাকাছি কোনো হোটেলে কাটালে হত না।

তা হয়তো হোত, কিন্তু হোটেলের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে গিয়ে ট্রেনটা মিস হয়ে যেত। গাড়িটা কখন আসবে তা যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না। অতএব ওই মধ্যরাতে নির্জন প্ল্যাটফর্মের অরক্ষিত ওয়েটিং রুমে শুধুই অপেক্ষা। শুধু নির্জনতা নয়, শব্দহীনতাও নিরেট পাথরের দেওয়াল হয়ে তখন আমাদের ঘিরে ধরেছে। মাঝে মাঝে দূর আউটার সিগন্যালের কাছে মালগাড়ির সান্টিং-এর শব্দ ভয়াবহতাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঘুমহীন

BanglaBook.org

চোখে বেঞ্চের ওপর আমরা বসে আছি। শুধু বসে থাকা নয় প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা কোনো অজানা বিপদের। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। রাত শেষ হতে আর কত বাকি।

হঠাৎ কারো হেঁটে আসার খসখস শব্দ কানে আসে। উৎকর্ণ হয়ে উঠি। কেউ আসছে এদিকেই। রাতের ট্রেনের কোনো প্যাসেঞ্জার কি? তখন দু'জন মানুষ ওয়েটিং রুমের প্রবেশ দ্বারে এসে থমকে দাঁড়ায়। হ্যাঁ তারা থমকায়। যেন ভেতরে যা দেখছে তা তাদের দেখার কথা নয়। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়েস। চোয়াড়ে টাইপের মুখ, চোখের মধ্যে বন্যতা। সারা গায়ে কুটকুটে আলোয়ান জড়ানো।

সে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপরই আমাদের পাত্তা না দিয়ে দেওয়াল লাগোয়া বেঞ্চে গিয়ে বসে। এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। তবু সাবধানে লক্ষ্য রাখছিলুম। তখন একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে।

প্রথমে বেরুল খবরের কাগজে মোড়া পাকানো এক বান্ডিল রুটি। তার সঙ্গে শালপাতার একটি বড় মোড়ক। সেটা খুলতেই মশলা দিয়ে রান্না করা কষা মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বদ্ধ বাতাসে। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। তারপর খবরের কাগজে মোড়া তৃতীয় মোড়কটা আলোয়ানের আড়াল সরিয়ে সামনে আসতেই দেখা গেল একটি নয় দুটি কান্ট্রি মিকারের বোতল। তার মানে ডিনারের সঙ্গে জম্পেশ করে পানেরও আয়োজন। কিন্তু পাবলিক প্লেসে এটা নিশ্চয়ই বেআইনি। কিন্তু কে করবে প্রতিবাদ। শুনবেই বা কে?

বাঁ হাতে বোতল ধরে দুজনেই রুটি ছিঁড়ছে তখন। সেই রুটিতে মাংসের গ্রেভি মিশিয়ে মুখে তুলেছে। খানিক চিবোনোর পর বাঁ হাতে ধরা বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল। দুজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। আশেপাশে তখন কোনো শব্দও নেই। ধীরে ধীরে রুটির সংখ্যা কমছে। বোতলের তরল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

আমরা শুধুই অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি পরের পর্বটির জন্য। খাওয়া শেষ হলে কি দাঁত নখ বার করবে দুজন। পরিস্থিতি কি অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে। বড় টেবিলটার ওপর গাদাগাদি করে আমাদের লোকজন। অ্যাটাচি আর বেডিং-এর ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে অথবা ঘুমের ভান করেই চোখ বুজে আছে। উলটো দিকে এদিকের বেঞ্চে আমরা দুই যুবক।

BanglaBook.org

ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখলাম। সময় যেন দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। অমলকে চাপা গলায় বললুম, আমি এদিকটা দেখছি। তুই ট্রেনের খবরটা একবার দেখ। দুটো বেজে গেল।

অমল উঠে দাঁড়াতে খাওয়া থামিয়ে দুজনেই তাকাল। যেন দুজন দুজনের প্রতিপক্ষ। কেউ কাউকে দৃষ্টির আড়াল করতে চাইছে না। ওই দুজন খাওয়ায় ফিরতে অমল দ্রুত পায়ে ঘর ছাড়ল। তাকে খুব তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসতে হবে। ও ফিরতেই বললাম, কী খবর?

মনে আছে অমল হেসেছিল। হাসতে হাসতেই বলেছিল, লেট বেড়ে গেছে। দশ ঘণ্টা। তবে আর ভয় নেই।

নেই?

না। আর মাত্র দু'ঘণ্টা বাদে দিনের আলো ফুটবে। সারারাত ধরে বয়ে যাওয়া আতঙ্কটা নিশ্চিত থাকবে না তখন।

কিন্তু সে তো এখনো দু'ঘণ্টা। তার আগেই যদি এই গভীর রাতে এই বিদেশ বিভুঁই-এ আক্রান্ত হই। এরকম ভাবনার ভেতরেই লোকদুটো বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খাবার শেষ। বোতলও শেষ। খবরের কাগজটা তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। খালি বোতল দুটো বেঞ্চির পায়ের কাছে শুইয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু যেন টাল খেয়ে গেল দেহ। এগিয়ে আসছে।

বুকটা ধক ধক করছে। এবার কোন্ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে কে জানে। টান টান হয়ে যাচ্ছে নার্ভ। সামনে দিয়েই বাইরে যাবার প্যাসেজ। যাবার আগে একজন তাকাল আমার দিকে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, আপলোগোঁকো টিরেন ছুট গয়া ক্যায়া?

নেই নেই। ছুটা নেহি। ও গাড়ি বহুত লেট চলতা হ্যায়।

এবার দ্বিতীয় লোকটা কথা বলল, আরামসে বৈঠিয়ে সাব কোঈ ফিকর মত করিয়ে। বলে হাত মুখ ধুতে বাইরে চলে গেল।

কোনো বিপদ হয়নি সেদিন। কিন্তু শুধু বিপদের সম্ভাবনায় একটা পুরো রাত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছিলুম। সে কথা আজও পরিষ্কার মনে আছে।

BanglaBook.org

# সেলফি

## অহনা বিশ্বাস

মুখের ওপর মাস্কটা লাগানো হয়ে গিয়েছিল। চোখের ওপর গোলাপজলে ভেজানো তুলোর প্যাড চাপিয়ে, রত্না বলল—আরাম করুন। নিজেকে একবারে ছেড়ে দিন। বেশিক্ষণ নয়, আমি ঠিক পাঁচমিনিট পর তুলে নেব।

এভাবে আরাম পাওয়া যায় না এমন নয়। এই পার্লারে বসেই অনুরাধা কতবার দেখেছে—কতজনা এ রকম অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এসব পারে না। ভেতরে ভেতরে কী যে টেনশন কাজ করে! নিজেই হাত দিয়ে তুলো

BanglaBook.org

সরিয়ে নেয়। চোখ খোলা থাকলে তবেই স্বস্তি। ইচ্ছেমতো চোখ খোলা আর বন্ধ করা এক জিনিস, আর এই জোরটুকুও সে নিতে পারে না। ফলত চোখগুলো তার অল্প ফোলা ফোলা। এটাকে কিছুতে সে ম্যানেজ করতে পারছে না। রত্না বলেছে প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা করে চোখে শশা বা তুলোর প্যাড নিয়ে শুয়ে থাকতে, অনুরাধা পারে না।

উঃ, এখন তো আবার চোখ বন্ধ করতেই ওই উঁচু-নিচু চামড়ার মুখটার কথা মনে পড়ছে। গোটা মুখটা থালার মতো প্লেন, কে যেন লেপেপুঁছে মুখ থেকে নাক ঠোঁট চোখ সব তুলে নিয়ে সমান করে দিয়েছে। নাকের জায়গায় শুধু গর্ত, মুখের জায়গায় গর্ত। তার পায়ের শব্দ পেয়ে সে মেয়ে ঘোমটা টেনেছিল ঠিকই, কিন্তু তার আগেই যে অনুরাধার চোখ চলে গিয়েছিল ওর ভয়ানক মুখটার দিকে। একটা বাচ্চা ছেলে ওর কাপড় টেনে টেনে ভিক্ষে চাইছিল। এগুলো ঘরের বাইরে বের হয় কেন? এগুলোকে আটকে করে রাখে না কেন?

চোখের প্যাড সরাতেই রত্না মৃদু বকুনি দিল। কী করছেন আপনি?

ইস রত্না, তোমাদের এখানে একটা যা ভিখারি দেখলাম—বীভৎস।

আঃ, কথা বলবেন না অনুরাধাদি। মুখে টান পড়ে যাবে। আপনার স্ক্রিন অনেকের থেকে ভালো বলে এই রিস্ক নেবেন না।

ওদিকে একটা স্কুলে পড়া মেয়ের ভ্রূ প্লাক করছিল ধ্রুবা। দাঁতে করে সুতো কাটতে কাটতেই সে বলল—কদিনই দাঁড়াচ্ছে দেখছি ওই ভিখারিটা। কোত্থেকে যে এল!

অনুরাধা এখানকার সবাইকে চেনে। এই পার্লারে সে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসে। বাইরে কোথাও গেলে মিস হয় মাত্র। ঘরের লোকের মতো হয়ে গেছে ওরা।

নতুন একটা মেয়ে এসেছে কাজ শিখতে। জল গরম করছে অনুরাধার পেডিকিওর করবে বলে। পা সাজাতে সে খুবই ভালোবাসে। তার বাবা মেয়ের পায়ের খুবই প্রশংসা করত। আরও একজন সেদিন করল। হর্ষ। দেখেই মনে হয় তোমার পা-টা ভীষণ নরম। অনুরাধা পাশে বসে হর্ষর পায়ের গোছাতে নিজের পায়ের নখ প্রায় ফুটিয়ে দিয়েছিল। দেখলে কেমন নরম আমি! ব্যাপারটাতে হর্ষ যে কেমন শিরশিরে শক্ত হয়ে গিয়েছিল সেটা

BanglaBook.org

বুঝতে অনুরাধার ওর দিকে তাকাতে হয়নি। তখন স্টেজে ডক্টর রাও-এর বক্তৃতা চলছে।

আবার মেয়েটার মুখ চোখের সামনে আসছে। ও বেঁচে আছে কেন? ওই মুখটার বদলে একটা সাদা হাড়ের খুলি বসানো থাকলেও এত ভয়ানক হত না। খুলির ওপরে উঁচু নিচু কালচে বাদামি তেলতেলে চামড়া। কোনো জন্তুও যদি এরকম দেখতে হত তার দিকে কি তাকানো যেত! ওকে কে ভিক্ষা দেবে?

আচ্ছা রত্না, তোমরা তো কাউন্সিলারকে বলে ওটাকে এখান থেকে তাড়াতে পারো?

কাউন্সিলার বলবে, আমার এসব কাজ নয়। ওকে তো চেনেন—সব কিছুতেই না।

তবে তো তোমার পার্লারে কেউ আসতেই ভয় পাবে। সত্যি বলছি, আজ আমি দেখা অবধি—কী যে ভেতরে হচ্ছে!

পা ঘষতে ঘষতে নতুন মেয়েটাও বলল—প্রথম যেদিন আমি ওকে দেখলাম, মাগো, খেতেই পারলাম না। বমি হয়ে গেল। মাথাটায় যে কেন সবসময় ঢাকা দিয়ে থাকে না! বাচ্চাটাই বা ওর মায়ের দিকে তাকায় কী করে?

ধ্রুবাও বলল—ওটা ওর মা কিনা কে জানে? দ্যাখো গে কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছে। ভিখারিদের তো ওইরকম ধরন।

রত্না পার্লারের মালকিন বলে একটু গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে। সে-ও বলল, ভাড়া করেনি, ওটা ওরই ছেলে। রেলপার কলোনির ওখানে বস্তিতে থাকত। আমাদের কাজের মাসির কাছে শুনলাম। ও তো ওই পাড়াতেই থাকে। মেয়েটার স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না। কোন্ রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভেগে এসেছিল। এখানেই ছেলেটা হল। তারপরও এদিক ওদিক করছিল, সেসব দেখে বাচ্চাটার বাপ রেগে মুখে অ্যাসিড মেরে দিল। বাঁচত না, পাঁচ-ছমাস হাসপাতালে থেকে এই ফিরেছে। ওই বস্তিতে আর থাকতে দেয়নি, তারপর এদিক-ওদিক ঘোরে।

ধ্রুবা মেয়েটার নরম ভ্রূ-তে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বলল—বেশ হয়েছে। এরপর যদি শিক্ষা হয়!

BanglaBook.org

অনুরাধার শরীরটা কাঠ হয়ে গেছে। শুধু পা দুটোতে সুড়সুড়ি লাগছে। আঙুলগুলোতে মালিশ করে দিচ্ছে যে মেয়েটির হাত—সেটা ছাড়া সে আর কিছুতে নেই। আয়নার সামনে প্রাণপণ চোখদুটো খুলে রেখেছে সে। এবার রত্না মাস্ক ওঠাবে—আয়নায় সে এখন অন্য লোক, সাদা শক্ত আবরণের নীচে তার রক্তমাংসের মুখ।

অনুরাধা দেখতে সুন্দর। যাকে সুন্দর বলে—যথেষ্ট ফর্সা গায়ের রঙ, লম্বা নাক, পাতলা ঠোঁট। সে তার মায়ের মতোও দেখতে নয়, বাবার মতোও নয়। গোটা বংশের সব ভালোগুলো উঠে এসে তার মধ্যেই জড়ো হয়েছে। তার বোনও তার মতো নয়। কেউ দেখলে বলবে না—অনসূয়া তার বোন। চেহারা, পড়াশোনা, কথাবার্তা—কিছুতেই সে তার দিদির ধারে কাছে লাগে না।

রত্না তার চেয়ারটাকে একটু উঁচু করে দিল। চুলে একটা প্যাক লাগাবে সে। চুলটা রেশমের মতো ফুলে উঠবে। আর তিনদিন পর সে সেমিনারে যাবে বিশাখাপত্তনমে। সেখানে সেমিনারে তার আর হর্ষর দুজনেরই পেপার প্রেজেন্টেশন আছে। তারপর বিকেলের দিকে যাবে সমুদ্রে।

কে জানে কেন অনুরাধার মনে হল এই যে সাদা প্যাক করা মুখ—তার একটা সেলফি তুলতে। হর্ষকে যদি তার অন্য একটা নম্বর থেকে এই ছবিটা পাঠানো যায়—সে কি তাকে চিনতে পারবে? বেশ মজা হবে।

অনুরাধা আয়নার নিচের তাক থেকে নিজের সেলফোনটা তুলতে গেল। মাথায় টান পড়ল।

কী যে করেন না আপনি অনুরাধাদি—রত্না মৃদু অনুযোগ করল।

তার মধ্যে অনুরাধা তুলে ফেলল তার সাদা প্লাস্টার অফ প্যারিসে মোড়া শক্ত মুখ, চোখের গর্তের সেলফি। ধ্রুবা সে দেখে হাসতে লাগল, আর পায়ে ফাইলঘষা মেয়েটাও।

বাড়ি ফিরে অন্যদিন নিজের ঘরের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অনুরাধা। এদিন ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে নিজের ছবিটা হর্ষকে পাঠাতে বসল। অনেকগুলো তার নিজের ছবি পর পর। নানা ভঙ্গিতে। ডক্টর রাও ঠিকই বলেন—রিসার্চের লাইন তোমার জন্য নয়, তোমাকে মডেল হলে বা সিনেমার নায়িকা-টায়িকা হলেই মানাতো ভালো। তবে এরকম মুখোশ পরা

BanglaBook.org

ছবি তো কখনো সে তোলেনি। এই ছবিটা তাহলে হর্ষ প্রথম দেখুক। তারপর না হয় ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচন হবে। হর্ষের হয়ে সে নিজেই শিহরণ অনুভব করল।

ছবিটা কম্প্যুটারে এডিট করতে গিয়েই সে চমকে ওঠে। মুখটা কেন যে তার মতো লাগছে। কেবল যেন চুনকাম করা। দুর! মাথা থেকে ওই ভিখারিটাকে সরাতে পারছে না। কী যে হল! ওটা কেন তার মুখ হতে যাবে। না, আবারও সেই মুখ! মাথাটা বিগড়াল বোধ হয়। এখন আর এসব কাজ নয়।

অনুরাধা অন্যমনস্ক হবার জন্য নিচের তলায় নেমে এল। ওপর তলায় তার ঘর, তার জগৎ। নিচের তলায় মায়ের। মার রান্নাঘর, শোবার ঘর, কুকুর বেড়ালের ঘর। বাবা মারা যাবার পর, বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর মায়ের পাড়াবেড়ানো স্বভাবটা বেড়েছে। পাড়ার কোন্ কুকুরের মাথায় ঘা হল, কোন্ বেড়ালের লাইগেশন করতে হবে—অনুরাধার মা এসব নিয়ে থাকেন। সকালবেলায় রান্নাবান্না করে বের হয়ে যান। তাদের দুজনের কাছেই চাবি থাকে। দুজনেই স্বাধীন মানুষ। বাবাই খুব ভালোবাসতেন অনুরাধাকে। বাবা বেঁচে থাকতে মায়ের সঙ্গে তার অনেক তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া হয়েছে। পড়তে পড়তেই শান্তনুকে বিয়ে করা, ডিভোর্স করা সবকিছুতেই বাবা পাশে থেকেছেন, মা নয়। বাবার একটাই কথা ছিল—আমার মেয়ে কি রেজাল্ট খারাপ করছে যে ওকে শাসন করব? মাকে বলতেন—তোমার আমার বংশে অনুর মতো লেখাপড়ায় কি কেউ ছিল, না আছে? মা বাবার প্রশ্রয় নিয়ে অনেক কথা বলতেন। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর মা বাবার বড় মেয়েকে আর কোনো শাসনগর্জন করেননি। দুজন দুই পৃথিবীর বাসিন্দা। এতে একপ্রকার হাত-পা-ঝাড়া অনুরাধা ভালোই আছে। নইলে রাও স্যারের সঙ্গে এত জায়গায় যাওয়া, বিশেষত ল্যাবরেটারিতে এত রাত পর্যন্ত থাকা নিয়ে মা কি কম অশান্তি করতেন! এই নিস্পৃহতা দুজনের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর।

আবার সেই মুখটা ভেসে আসছে। মানুষের চেহারা এরকম হয়! মানুষই তো করে নাকি! মেয়েটা নাকি ভেগে এসেছিল। আগে কি কোথাও বিয়ে করেছিল? ছেলেটা কি এই রিক্সাওয়ালার, নাকি তার আগের? ওকে কে ভিক্ষা দেবে? ভয়েই তো মানুষ কাছে যেতে পারবে না? যে ছোট ছেলেটা

BanglaBook.org

আজ আছে, সে-ও তো বড় হয়ে পালিয়ে যাবে। চোখে দেখতে পায় না, কোথায় যাবে ও। যার সঙ্গে নতুন ওর ভালোবাসাবাসি, নাকি মাখামাখি চলছিল, সে ওকে দেখবে না?

কী যে ভাবছে অনুরাধা। পেপারটা আজ ভালো করে দেখে নিতে হবে। এই প্রথম সে ডক্টর রাও-এর রেকমেন্ডশন ছাড়া একাই যাচ্ছে। হর্ষ তাকে সাহায্য করছে। এই ফিল্ডে হর্ষর নামডাক হয়েছে। আগেও অনেকবার ওকে দেখেছে অনুরাধা, কিন্তু ডক্টর রাও এমন করে তাকে আগলে রাখতেন, যে কোথাও এদিক-ওদিক সে চাইবে তার জো ছিল না। সবাইকার চোখে এটা সয়েও গিয়েছিল। অন্তত দেশের মাটিতে কাউকে মুখে জানাতেও হত না যে প্রফেসর রাওকে ডাকতে চাইলে দুটো প্লেনের টিকিট দিতে হবে, কিংবা ডবল বেড রুমে ডক্টর রাও-এর সঙ্গে কে থাকবে। কেউ জিজ্ঞাসাও করত না অনুরাধা ডক্টর রাও-এর মেয়ে কিনা, ভাই-ঝি কিনা। বিখ্যাত সায়েন্টিস্টদের এসব উপসর্গ তো থাকেই! আরে আইনস্টাইনও বৌকে ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতেন।

কিন্তু অনুরাধা তপাদার আজ যা—তা কি শুধু ডক্টর রাও-এর জন্যই? তার কি নিজের কিছুই নেই! এম এসসি-র সময় হিংসুক ক্লাসমেটগুলো তো এরকমই ভাবত। কিন্তু তার নিজের খেটে বানানো পেপারেও কি কখনো ডক্টর রাও নিজেব নাম প্রথমে রাখেননি! হ্যাঁ, মিথ্যে নয়—একসময় সে তার স্যারের প্রবল প্রেমে পড়েছিল। সামাজিক বিধিনিয়ম সব উপেক্ষা করে সে তার স্যারকে তখন বিয়েও করতে পারত। রাও সেসব চাননি। কী হত ডক্টর রাও না থাকলে? খুব জোর কোনো একটা কলেজে পড়াত, কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে ধীরে ধীরে কাজ করত। এত নাম ছড়াতো না। সে কি কিছু দেখছে না? কাজ করলেই কি নাম ছড়ায়!

কুকুরগুলো খুব ঘেউ ঘেউ করছে। কেউ এল নাকি। অনুরাধা গ্রিলের দিকে তাকায়। ওখান থেকে কেউ এলে স্পষ্ট দেখা যায়। ইস, আবার ওই ভিখারিটা। মাথার ঘোমটাটা খোলা। কুকুরের ভয়ে বাচ্চাটা মায়ের দুপায়ের ফাঁকে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ও কোন্‌দিকে যাবে? আঃ, ও এখানে দাঁড়িয়ে কেন? অনুরাধা মায়ের কুকুরগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। ও যে ওর তেলালো মাংসল গর্তগুলো নিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কী যেন বলছে। কুকুরগুলো যাচ্ছে না, ওদের ঘিরে ধরেছে। বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করল ভয়ে।

BanglaBook.org

অনুরাধার মা ঘরে নেই। তবু সে মা-মা করতে করতে দ্রুত তার নিজের ঘরে গেল, দরজা জানলা বন্ধ করে বিছানায় মুখ গুঁজে দিল। যেন সামান্য শব্দটুকু তার কানে না আসে। সে এই মুখ ভুলতে চায়। কিন্তু কানে আঙুল দিলেও সে মৃদু হলেও কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছে, আর তার মধ্যে সেই বীভৎস কুৎসিত উপস্থিতি।

ডক্টর রাও ইদানীংভাবে তার স্ত্রীর কথা খুব বলেন। ভালো কথা নয়। অভিযোগই সব। তবু অনুরাধার শুনতে ইচ্ছে করে না। অভিযোগের মধ্যেও মনোযোগটা তো লুকানো থাকে না। তারপর ছেলেমেয়ের গৌরবগাথা। বিচ্ছিরি লাগে। সেদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে হঠাৎ বললেন, অনু তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ। অবশ্য বয়েস হচ্ছে তো। কথাটা শুনে অনুরাধার হঠাৎ চড়াৎ করে রাগ উঠে গেল। সে বলে বসল—আমার তো এখন বয়স হচ্ছে, আর আপনি তো কবে থেকে বুড়ো হয়েই আছেন। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেন?

রাও এরকম কথা প্রত্যাশা করেননি। গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। হাতের কাছে তো অ্যাসিডও ছিল। যদি ছুঁড়ে মারতেন। আঃ বিছানায় গড়াগড়ি দিল অনুরাধা। মনগড়া কত কী আবোলতাবোল ভাবছে। ভিখারিটা তার মাথা খারাপ করে দিল, নাকি ডক্টর রাও করে দিলেন। দুর। ঘরে লাইট জ্বালিয়ে অনুরাধা টিভি চালিয়ে দিল। ধুমধাড়াক্কা নাচ হচ্ছে হিন্দি সিনেমার। এরকম নাচলে রোগা হওয়া যেত।

হর্ষ রোগা মোটা নিয়ে কিছু বলেনি। বলার পরিস্থিতিও আসেনি। সে তাকে রাধা সম্বোধনে মেল করে। তাদের দুজনেরই যে দুজনের প্রতি আগ্রহ আছে সেটা নিজেদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এবার অন্যদের চোখগুলোতে হাত চাপা দিতে হবে। একই গোষ্ঠীর লোকজন সবার সব কিছু জানে। কিন্তু ডক্টর রাও কি রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারেন? কতটুকুই বা পারবেন। হর্ষ এখন উঠছে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। পাবলিক রিলেশনের কাজটায় ও খুব দক্ষ। তেমন হলে এই শহর ছেড়েই চলে যাবে। হর্ষ তাকে নিশ্চয় কোনো ভালো জায়গায় সুযোগ করে দেবে। হর্ষ কি তার মাস্কটা তুলে গোলাপের মতো মুখটা দেখতে পাবে না? অনুরাধা কখনো হারেনি, এখানেও হারবে না।

BanglaBook.org

বিকেলে শপিং-এ বেরিয়েছিল অনুরাধা। কী পরলে ভালো লাগবে সে নিয়ে মনে মনে গবেষণা করল আর মলের দোকানগুলো ঘুরে বেড়াল। একটা এথনিক সরু রুপোর কোমরের গোট পাওয়া গেল। পরে থাকবে। বাইরে থেকে দেখা যাবে না। অথচ হঠাৎ চমকে ওঠার মতো স্পর্শ পাবে।

কী আশ্চর্য, রাতে খেতে বসেও মা ওই ভিখারিটার কথা তুললেন। মা বলতে লাগলেন, এর থেকে তো লোকটা মেয়েটাকে খুন করে দিলে পারত। চোখ নাক একেবারে গলে গেছে। অথচ শুনলাম নাকি দেখতে ভালো ছিল।

এই কদিন মাত্র হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছে না, সবাই তাড়াচ্ছে। মা স্বগতোক্তি করলেন। এই তো মানুষের কাজ কারবার, এই তো মানুষের জীবন। মা কথাটা সংশোধন করে নিলেন, মানুষের নয়, মেয়েদের জীবন। তারপর তার সঙ্গীর উদ্দেশে বললেন—যে রূপের নেশায় তাকে ঘরে এনেছিলি, সে রূপকে তুই নিজের হাতে মেরে দিলি! কদিন নাহয় জেল খাটলি, তারপর তো দিব্যি ঘুরে বেড়াবি। তোর তো আর মেয়েরও অভাব হবে না।

রান্নাঘরের সিংকে থালাটা নামিয়ে রেখে অনুরাধা নিজের ঘরে এল। কপালে একটু ওডিকোলন লাগাল। নিবু আলোতে ধীর লয়ের গান চালাল। সব মুছে ফেলতে হবে তার জীবন থেকে। নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে সে। নতুন বসন্ত। নতুন কুঁড়ি হবে, নতুন ফুল ফুটবে। পিছনের হাহুতাশ নিয়ে সে কখনো পথ চলেনি, চলবে না।

শুয়ে শুয়ে নিজের সেলফিগুলো সে ফের দেখতে থাকল। না, সে মোটা নয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সে যথেষ্ট সুন্দরী, আকর্ষণীয়। কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েরাও তার কাছে লাগে না। যত কেউকেটাই কেউ হোক না কেন তাকে সকলেই প্রার্থনা করবেই। হর্ষকে সে জিতে নেবেই। ভুল হল, জিতে সে নিয়েছেই।

ঘুমিয়েই পড়েছিল। তবু কার হাত এসে লাগল গায়ে। ডক্টর রাও-এর, না তো, শান্তনুর—না তো, সে তো কবেই চলে গেছে। তার কথা মনে এল কেন? হর্ষর কি? অনুরাধা অনুভব করল, কে তার মুখে হাত বোলাচ্ছে। চোখ মেলে তাকাল। কে ও? সেই তো ভিখারিটা! ও কি করছে? ও তার মুখের চামড়াটা টেনে তুলে নিচ্ছে কেন?

BanglaBook.org

সে কি স্বপ্ন দেখছে আলফাল ভাবতে ভাবতে। স্বপ্ন কোথায়? ও তো ওর ময়লা নোংরা নখগুলো দিয়ে ওর গালের মাংস তুলে নিচ্ছে। না একটুও লাগছে না। আপনাআপনি উঠে আসছে মাংস। আঃ, কী হচ্ছে! ও যে থুতনি তুলে নিল। এবার বাঁ গালটায় হাত দিল। নিজের দুটো হাত দিয়ে আটকাচ্ছে অনুরাধা। পারছে কই? ওর নোংরা শাড়ি, ঝুলন্ত বুকের চাপে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো বের হচ্ছে না। এই তো নাকটা তুলে নিল। নিশ্চয় ওর মতো ফুটো হয়ে গেল। কপালের চামড়াটা টান মেরে খুলে নিল। চড়চড় করে উঠে গেল। সাদা ফটফট করে উঠছে খুলিটা। চুলগুলো ওর হাতে উঠে আসছে, যেন উইগ। সকালেই রঙ করেছিল চুলগুলো। একটা একটা করে ঠোঁট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

অনুরাধা তাকে কোনোমতে সরিয়ে উঠে বসল। এই তো গান বাজছে, এই তো আলো জ্বলছে—সব ঠিক আছে। স্বপ্ন, সব দুঃস্বপ্ন। অনুরাধা টলতে টলতে বাথরুমে যায়। মুখে জল দেবে। কিন্তু আয়নার দিকে তাকাতেই সে চিৎকার করে ওঠে। ওই ভয়ানক মুখ তার! সে কীভাবে বের হবে, কীভাবে লোকের কাছে মুখ দেখাবে। সে যে ওই ভিখারির চেয়েও বীভৎস, পচা গলা রাক্ষুসীর মতো!

অনুরাধা চিৎকার করে মাকে ডাকতে ডাকতে নিচে নামে। ঘুম থেকে আচমকা উঠে মা-ও জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে। মেয়েকে ওরকম আচরণ করতে দেখে তিনিও কেমন ভয় পেয়ে যান। কী হয়েছে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। অনুরাধা কিছুই বলে না, পশুর মতো আওয়াজ করে কাঁদতে থাকে। তার নিজের গলার আওয়াজ নিজের কাছেই অসম্ভব ক্যারক্যারে জান্তব মনে হয়। সে নিজের মুখে হাত বোলাতে থাকে। সেখানে কপালে শক্ত সাদা করোটি-ফলক, চোখের গোল গোল ফুটো, নাকের গর্ত, বড় বড় ধারাল দাঁত, সে কোনোমতে তার এতটুকু মাংস, এতটুকু মেদ, এতটুকু কোমলতা খুঁজে পায় না। কেবল তার অন্ধ চোখ নাক থেকে বের হওয়া গরম আঠাল রস তাকে একটা মানুষী চেহারা দেবার চেষ্টা করে যায় যেন।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# সেই কুয়াশায়

## অরিন্দম বসু

সকালে ঘুম ভেঙে তমাল দেখতে পেল মাথার দিকের খোলা ফাঁকটুকু দিয়ে ঘন কুয়াশা ধোঁয়ার মতো ঢুকে আসছে।

খড়ের ওপর একখানা পাতলা তোশক পাতা। এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আশ্রম থেকেই সেটা দিয়েছে। তার ওপর নিজের আনা ফোম ম্যাট পেতে নিয়েছিল তমাল। যদি একে বিছানা বলা যায় তাহলে বলতে হবে এখানেই

কাল রাতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে গুটিপোকা হয়ে শুয়েছিল সে। আর আজ সকালে সেখানেই ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

তাঁবুর কাপড় পাকা বাঁশের খাটো লাঠিতে জড়িয়ে বানানো তাঁবুর দরজা। আসলে পরদা। সেই আড়ালটুকু উঠে যাওয়াতেই কুয়াশা আসার পথ পেয়ে গেছে। ভেসে পড়েছে তাঁবুর ভেতরেও।

তমাল বুঝতে পারল এই তাঁবুর পৃথিবীতে তার অনেক আগেই উঠে বসেছেন আরো অনেকে। বাইরে টিনের ঘেরাটোপে দুটো পায়খানা। সকাল সকাল দখল নিতে চান কেউ কেউ। তবে কুয়াশার কারণেই হয়তো তারা এখনো বেরোতে পারেননি। আপাতত ডান দিকের বিছানায় বসে গীতা পাঠ করছেন ভারী চেহারার বয়স্ক একজন। ইনি এই আশ্রমের কাশী মঠের প্রেসিডেন্ট। সত্তরের ওপর বয়েস। বাঁ দিকের বছর পঁয়তাল্লিশের রোগা, কালো মানুষটি তমালের চোখে চোখ রেখে ঘুমভাঙা হাসি হাসলেন। ইনি অনিমেষ ঘোষ। স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি। গুয়াহাটিতে বাড়ি। অরুণাচলে পোস্টেড।

'আপনি তো ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপরেও কাল রাতে আরো বৃষ্টি হয়েছিল জানেন।'

হয়েছিল নিশ্চয়ই। দেখতে তো পায়নি তবে তাঁবুর ওপর মোটা দানার বৃষ্টির আওয়াজ শুনেছিল তমাল। স্লিপিং ব্যাগের ভেতরেও নিজেকে একটি জ্যান্ত এবং ভিজে কোলবালিশ মনে হচ্ছিল। এই অনিমেষ তখন তিন-চারখানা কম্বল দিয়ে নিজেকে মুড়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। বলেছিলেন, 'ঘুম আসছে না। এত ঠান্ডা! এসব চাপিয়েও কিছু হচ্ছে না। আপনার স্লিপিং ব্যাগ খুব গরম, না? কী আছে বলুন তো ওর ভেতরে?'

তমাল বলেছিল, 'পাখির পালক।' বলার পরেই মনে হয়েছিল স্লিপিং ব্যাগ তো দূরে থাক, কত লোকের তো তাঁবুও জোটেনি। খোলা আকাশকে ছাদ করে নিয়ে বালির ওপরেই শুয়ে আছে। হয়তো একটি কম্বলকে সম্বল করে। তাদের কী হবে এখন? কেন আসে এত লোক কষ্ট করে এই কুম্ভমেলায়? ধর্মের টান? পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা? পাপমোচনের অভিলাষ? মোক্ষলাভের লোভ? বৃষ্টির চড়পড় শব্দ তার প্রশ্নগুলো মুছে দিচ্ছিল একটু একটু করে। সারাদিন ঘোরার ক্লান্তি পেড়ে ফেলছিল তাকে।

BanglaBook.org

তিন দিন হল এলাহাবাদের প্রয়াগে এসেছে সে। এসে বুঝেছে, দিনেরবেলায় তেতে ওঠা বালি যেন চাটু হয়ে থাকে। সেই বালিতে যত সে হাঁটছে, ঘুরছে—রোদ তাকে তত সেঁকছে। অথচ না হাঁটলে, মানুষের সঙ্গে কথা না বললে তার স্টোরি হয় না। চাকরি বলে কথা। সন্ধের মুখে মুখে ফিরে তাকে ল্যাপটপ খুলে বসতে হবে। লিখতে হবে। লেখাই তো সময় নেবে। তারপর তো টেকনোলজি। ডঙ্গল লাগিয়ে নেট খুলে নিলেই হল। কাগজের অফিসের রান্নাঘরে মেইল পৌঁছতে কতক্ষণ আর লাগে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল তমাল। দাঁত পরে মাজলেও চলবে। এখানে এসে অনেক নিয়মই এলোমেলো হয়ে গেছে। কুয়াশাটা দেখা দরকার। আজকের স্টোরি এই কুয়াশাও হতে পারে। মাথার কাছে ব্যাগ রাখা আছে। তার ওপরে ছেড়ে রাখা প্যান্ট আর লম্বা জ্যাকেট। গোড়ালি অব্দি ঢাকা পড়ে তাতে। পাজামা ছেড়ে ড্রয়ারের ওপর প্যান্ট চাপিয়ে নিল। ফুলহাতা সোয়েটার পরেই শুয়েছিল। খোলার দরকার নেই। জ্যাকেটটা গায়ে ঝোলাল। মাঙ্কি টুপিতে মাথা আর কান ঢাকল। হাত ঢাকল গ্লাভসে।

'আপনি কি এই কুয়াশায় বাইরে বেরোচ্ছেন না কি?'

মেলায় আশ্রমের কাজকর্ম যিনি দেখভাল করেন সেই অসীম পাল এসে দাঁড়িয়েছেন। কলকাতা থেকে এখানে এসে এঁর সঙ্গেই দেখা করে থাকার জায়গা পেয়েছে তমাল। মানুষটি ভালো।

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আমি কিন্তু অনেকগুলো কুম্ভ দেখেছি। এমন কুয়াশা আগে কোনোদিন দেখিনি। সাবধান হওয়া ভালো নয়?'

অনিমেষ ঘোষও মুখ তুলে তমালের দিকে তাকিয়ে। 'কত নেমেছে বলুন তো টেম্পারেচর? দুই কী তিন হবে। এর মধ্যেই যাবেন?'

'যেতে হবে। কুয়াশা আর ঠান্ডার ভয়ে আটকে থাকলে আমার লেখাটা তো হবে না।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়ালেন। 'একা বেরোতে সাহস হচ্ছে না? যাব আপনার সঙ্গে?'

'চলুন।'

বাইরে বেরিয়ে তমাল টের পেল বাকি সব কিছু উধাও। আকাশ নেই।

BanglaBook.org

সূর্যও নেই। যা আছে তা শুধু কুয়াশা। উল্টোদিকের সমস্ত তাঁবু, রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্ট, এমনকি তাদের তাঁবুর পাশের জলের কলটা অব্দি কুয়াশা ঘষে তুলে দিয়েছে। গাড়ি যাওয়ার জন্য বালির ওপর লম্বা করে লোহার পাটি ফেলা আছে গোটা মেলাতেই। হিমে ভিজে যাওয়া সেই পাটি শুধু সে দেখতে পাচ্ছে পায়ের নীচে।

এ হল গঙ্গাদ্বীপ। এখানকার লোকেরা বলে আরাইল। এর পিছন দিকে ঝুসি। সামনে দারাগঞ্জ। এই পুরো তল্লাট জুড়ে সারি সারি তাঁবু। সেখানে গান বাজে মাইকে। গঙ্গাকি জয় জয়...যমুনাকি জয় জয়। রাতে আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোকনগরীতে কাল রাতেও ঘুরে বেড়িয়েছে তমাল। আর আজ কুয়াশার দখলে চলে গেছে সমস্ত। মাইকের গান বোবা হয়ে রয়েছে।

আন্দাজে হাঁটতে শুরু করে দিল তমাল। দু'হাত দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জমাট কুয়াশার ভেতর থেকে। কে কোথায় যাচ্ছে, কোথা থেকে আসছে, কিছু বোঝার উপায় নেই। খুব কাছাকাছি এসে তবে তাদের কেউ কেউ ভেসে উঠছে। মাথায় পুঁটলি, কানে মাকড়ি, হাতে লোটা, উদোম পায়ে বালি ঠেলতে ঠেলতে গাঁও দেহাতের মানুষ চলেছে গঙ্গা নাহাতে। মেয়েদের শাড়ির খুঁট দাঁতে আটকানো। তাদের পায়ের খাঁড়ু আওয়াজ তুলছে ঠমঠম।

তমাল লোহার পাটি ছেড়ে বালিতে নামল। অনিমেষ তার গায়ে গা ঘষে হাঁটছিলেন। মুখ শুকনো হয়ে গেল তার। 'যাচ্ছেন যে, চিনে ফিরতে পারবেন? কুয়াশা যদি না সরে। আমি কিন্তু কিচ্ছু চিনি না।'

অনিমেষ ঘোষের কথার মধ্যেই দূরে একটা গম্ভীর ভোঁ ছড়িয়ে গেল মেলায়। কীসের আওয়াজ? গাড়ির মনে হচ্ছে। কোনো আশ্রমের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে হয়তো বা সরকারি ট্রাকও হতে পারে। কিন্তু কিছুই দেখতে দিচ্ছে না কুয়াশা। ওরা দুজন দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়ের নীচের বালি কাঁপছে। কাঁপছে লোহার পাটি। অনিমেষ এদিক ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছেন। তমালও। গাড়ির ড্রাইভার যদি তাদের দেখতে না পেয়ে ঘাড়ে এসে পড়ে! একটু পরেই কুয়াশা ফুঁড়ে দুটো হেডলাইট ফুটে উঠল সামনে। মনে হল যেন ঘষা কাচের চশমার ভেতর দিয়ে কেউ তাকিয়ে রয়েছে। তার পিছনেই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে দেখা দিল একটা ট্রাক।

BanglaBook.org

'সরে আসুন, সরে আসুন এদিকে'—বলতে বলতে হ্যাঁচকা টানে অনিমেষকে নিয়ে নিজেও এক পাশে ছিটকে গেল তমাল। ট্রাকটা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তার ড্রাইভারও ভয়ে ভয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছে মেলায়।

অনিমেষ যেন খানিকটা দম নিয়ে নিলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমায় আগে অরুণাচলের সাপ্পা বলে একটা জায়গায় পোস্টিং দিয়েছিল। সেখানে ওয়েট টেম্পারেচর ছয় আর ড্রাই তিন। কী কষ্ট রে বাবা ঠান্ডায়! মদ খাই না অন্য কলিগদের মতো। ফিল্ড ওয়ার্কে যেতে পারতাম না। টেবিল ওয়ার্ক করতে গিয়েও মনে হত জমে যাব। বলেকয়ে বদলি নিলাম তাওয়াংয়ে। সেখানেও ঠান্ডা আছে তবে কম। কুয়াশা সেখানেও আছে কিন্তু এরকম কুয়াশা জীবনে দেখিনি। আরে, একটু আস্তে হাঁটুন না।'

জোরে হাঁটছে না তমাল। হাঁটা সম্ভবও নয়। তার পাশের লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে ওরকম বলছে। ডান হাতে গঙ্গা থাকতে পারে ভেবে নিয়ে সে সেদিকেই এগোচ্ছিল। আরো কিছুটা গিয়ে বুঝতে পারল ঠিক পথেই এসেছে। সামনেই নদী।

এই হিম কুয়াশাতেও গঙ্গার ঘাটে স্নানের জন্য অনেক মানুষ। লজ্জা, শীত—সবই কুয়াশার আড়ালে। দেহাতি মেয়েরা দঙ্গল বেঁধে একে অন্যকে ঘিরে কাপড় ছাড়ছে। ছেলেদের সেসবেরও বালাই নেই। বালিতে চৌকি গেঁথে বসে পাণ্ডারা। তার ওপর স্তূপ করে রাখা চাল, আয়না, চিরুনি, হলুদ, সিঁদুর। চৌকির পায়ায় বাঁধা ঘন খয়েরি রঙের বাছুর। শীত থেকে বাঁচাতে তার পিঠে বস্তা জড়িয়ে দেওয়া। তীর্থযাত্রীদের গো-দানের পুণ্য দিতে সে দাঁড়িয়ে। তার ছলছল চোখদুটিতে নদীর জলের ছায়া দেখতে পেল তমাল।

এই লোকনদী গঙ্গার সঙ্গে যমুনার সঙ্গমে স্নান আজ রাত পোহালেই। সরস্বতীও নাকি আছে। গঙ্গা এখানে যুক্তবেণী। অমৃত মন্থনের উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে প্রয়াগ তীর্থরাজ। তমালকে সেখানে থাকতে হবে। যা দেখবে লিখতে হবে। যারা আসতে পারেনি কুম্ভ মেলায় তারা মনে মনে স্নান সারবে, পুণ্য ছুঁয়ে নেবে কাগজের অক্ষর থেকে। আসতে তো চেয়েছিল তমালের মা-বাবাও। কী করে আসবে? তমাল আর নন্দিতার মেয়ের বয়েস তো সবে তিন মাস। এমনিতেই সে দেরি করে এসেছে। বিয়ের পাঁচ বছর পর।

BanglaBook.org

নন্দিতার এখন চৌত্রিশ। মেয়েদের পক্ষে খানিকটা বেশি তো বটেই। তমাল তার চেয়ে এক বছরের বড়। আসার সময় নন্দিতাও বলেছিল, 'ইস, আমিও যদি যেতে পারতাম। কুম্ভ তো একটা এক্সপিরিয়েন্স, না। কবে, কোথায় হবে, সেখানে যেতে পারব কিনা কে জানে!'

হ্যাঁ, এ এক অভিজ্ঞতা। জেনেছে তমাল। বালিতে লক্ষ পদচিহ্ন। কত রকমের মানুষ। ভক্তের দল। বেশিরভাগই গাঁ-গঞ্জের গরিব গুরবো। তাদের জন্য কুম্ভের ধুলোবালিও পুণ্য হয়ে উড়ছে চারপাশে। কত সাধু, সন্ন্যাসী, সন্ত, বাবাজি আর তাদের আখড়া। নিরঞ্জনী, জুনা, মহানির্বাণী, উদাসীন, বৈরাগী। মহান্ত, মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বরদের শোভাযাত্রা। আবার সাধুর ভেক ধরেও ঘুরছে অনেকে। তাঁবুতে শামিয়ানার নীচে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রবচন। ভাণ্ডারা দিয়ে পুণ্য ঝোলায় ভরার লোভে কত ব্যবসায়ীও রোজ লোক খাওয়াচ্ছে। এ এক আশ্চর্য দেশ। এভাবেই কি পূর্ণ হয়ে উঠবে কুম্ভ? জানার জন্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে তমাল ভট্টাচার্য। তারই মতো কত মিডিয়ার কত রিপোর্টার ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদী আর মানুষের সমাগমে। তাদের কেউ কি আজকের এই কুয়াশায় বেরিয়ে পড়েছে তার মতো?

ভাবতে ভাবতে কতখানি এগিয়ে গিয়েছিল খেয়াল নেই তমালের। পিছন ফিরে তাকাতেই জমাট কুয়াশা যেন চোখে ধাক্কা দিল। অনিমেষ ঘোষ গেলেন কোথায়? এখানে তো কেউ নেই। অদ্ভুত শান্ত হয়ে রয়েছে জায়গাটা। একটা টুকরো শব্দও ভেসে আসছে না কোথাও থেকে। নদীর পাড় ধরেই তো হাঁটছিল সে। অতগুলো মানুষ একসঙ্গে উবে গেল! গঙ্গা কোন্ দিকে, মেলাই বা কোন্ দিকে—কিছুই তো ঠাহর করে উঠতে পারছে না তমাল। ঠান্ডায় নাকের ডগা জমে যাচ্ছে। ঢোলা জ্যাকেটের পকেট থেকে হাত বের করা যাচ্ছে না।

খানিকটা এগোতেই সে টের পেল পায়ের চাপে বালি থেকে উঠে আসছে জল। সামনে এত জল কেন? পিছনে ঘুরল তমাল। পাণ্ডাদের বসার একটা চৌকি উল্টে পড়ে আছে। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে খড়ের ছাউনি, গাঁদাফুলের ছেঁড়া মালা, সিঁদুরের প্যাকেট, শালপাতা। সব জলে ভিজে নেতিয়ে রয়েছে। এই চরের মধ্যেই কিছুটা জায়গা বাঁশ আর দড়ি দিয়ে ঘেরা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে যেতে হল তাকে। একটা লম্বা বাঁশের

BanglaBook.org

ডগায় একটা পিজবোর্ড টাঙানো। হিন্দি পড়তে পারে তমাল। সেখানে লেখা—ইহাঁ দল্‌দল্‌ হ্যায়। সাবধান! এখানে চোরাবালি!

ঠান্ডা কি বেড়ে গেল আরো? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না তমাল। ডান দিকে এগিয়ে গেল। সেখানেও জল। বাঁ দিকে গেল। জল সেখানেও। দিকভুল হয়ে এ কোথায় এসে পড়েছে। এখান থেকে চেঁচিয়ে উঠলেও কেউ শুনতে পাবে না। তবু সে হাঁক পেড়ে উঠল—কোই হ্যায়? তার সেই ডাক যে কোথাও পৌঁছল না তাও সে বুঝতে পারল।

সোজা যাবে বলে পা ফেলতেই আবারও জুতোসুদ্ধু ডুবে গেল তুলতুলে বালির ভেতরে। পা টেনে তুলতে চাইছিল সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হাতদুটো ঢুকে যাচ্ছে। কোমরের জোর দিয়ে কোনোমতে যেন নিজেই নিজেকে সরিয়ে আনতে পারল। চারদিকেই কি চোরাবালি? তাহলে কোন্‌ পথে এখানে এসেছিল? কুয়াশা এখনো ঘিরে রয়েছে চারপাশ। এতটা সময় ধরে কি কুয়াশা থাকে? সূর্য কি উঠবে না আজ? কুয়াশাই কি ডেনে আনল তাকে? এতক্ষণে একটা গন্ধ পাচ্ছে সে। কুয়াশার ভেজা ভেজা গন্ধ। কর্পূরের গন্ধের মতো জ্বালা ধরানো। নাক দিয়ে ঢুকে সোজা বুকের ভেতরটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। শ্বাস ফেললেও হয়তো ভেতর থেকে কুয়াশাই বেরিয়ে আসবে।

না, ওই তো। কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে। একমুহূর্তে তমাল দেখতে পেল চওড়া গঙ্গা, কোনো মন্দিরের চুড়ো, একটা রেল ব্রিজও যেন। আঃ, সব পরিষ্কার। ঝকঝকে। ওইদিকে গেলেই হবে। কিন্তু তারপরেই আড়াল হয়ে গেল সেই ছবির পৃথিবী। নেমে এসেছে কুয়াশা। পিছনে তাকাল সে। সেই চৌকি, খড়ের ছাউনি আরো অনেকটা তলিয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকেও গিলে নিতে পারে চোরাবালি।

জায়গাটা দৌড়ে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখবে? যদি পা গেঁথে যায় বালিতে? নড়তে পারল না তমাল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটু আগের দেখা সবকিছু আবছা হয়ে যাচ্ছে! কী বলে একে? মৃত্যুভয়? গ্লাভসের ভেতরে হাত শিরশির করছে। খুলে ফেলল সে।

সেই গন্ধটা কেমন ঘোর লাগিয়ে দিচ্ছে মাথার ভেতর। জীবন তো পাখির পালকে মোড়া নয় যে তার ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে রেখে পার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার সংসার, পরিবার, চাকরি, বন্ধুবান্ধব, আড্ডা,

BanglaBook.org

হাসি-মজা-গান, এল.আই.সি. পলিসি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চেনা-আধাচেনা মানুষজন, সেই কবেকার ভাড়াবাড়িতে টুসি নামের তেরো বছরের মেয়েটার সঙ্গে লুকিয়ে কলঘরে জামাকাপড় খুলে চান করার পাপ, মাথার মধ্যে জমে থাকা পঁয়ত্রিশ বছরের স্মৃতি নিঃশব্দে মুছে দেবে কুয়াশা? নিজের তিন মাসের মেয়ের মুখটাও তো ভালো করে মনে করতে পারছে না সে। গঙ্গা নাকি আগুনের মতো সব পাপ পুড়িয়ে দেয়। গঙ্গার তীরে মরলে স্বর্গ নাকি বাঁধা। স্বর্গ কে চাইছে? তমালের মনে হল সে যেন একটা গোটা জীবনের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো এক কুয়াশার ভেতর দিয়ে এসে আর এক কুয়াশার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।

ঠিক এই সময়েই চারদিকের কুয়াশা কোনো মেয়ের গলায় হেসে উঠল যেন। ঝটিতি তাকাল তমাল। দেখা যাচ্ছে! ওই যে, বেশ কিছুটা দূরে বালিতেই একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। চুল ছেড়ে রেখেছে পিঠের ওপর। হয়তো স্নান করে উঠে এসেছে নদী থেকে। কিন্তু একা একা কোনো মেয়ে এভাবে স্নানে আসতে পারে? নাকি এও হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেলে কেউ হাসে!

চেঁচিয়ে উঠল তমাল—'এখান থেকে ফেরার রাস্তা জানো?'

মেয়েটি হাত দিয়ে বালির দিকে ইশারা করল। 'চুনা কা দাগ হ্যায় না।'

এত দূর থেকেও তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেল তমাল। হ্যাঁ, চুনের হালকা দাগ রয়েছে ভেজা বালিতে। আশ্চর্য! এতক্ষণ সে দেখতে পায়নি।

সেই দাগে চোখ রেখে পা ফেলতে থাকে তমাল। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে কোথায় চলে যাবে কে জানে।

খানিকক্ষণ পরে সে শুকনো বালি পেয়ে গেল পায়ের নীচে। এবার মুখ তুলতে পারল। কিন্তু সেই মেয়েটাকে তো দেখতে পাচ্ছে না। গেল কোথায়? সামনেই কিছুটা উঁচু বালির ঢিবি। তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল সে। নাঃ, কোথাও কেউ নেই। কুয়াশাও নেই। পড়ে আছে নদীর জল আর নির্জন বালুচর।

সামান্য সময়। চরের ওপর দিয়ে আবার গড়িয়ে আসতে শুরু করেছে কুয়াশা। সবকিছু আবার তার অন্তরালে।

BanglaBook.org

# জলের বিপদ

## শুভমানস ঘোষ

ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলাম ভরা পদ্মায় মাঝনদীতে নৌকো ফুটো হয়ে যাওয়ার ভয়ংকর বিপদের গল্প। যাত্রীরা নৌকোয় জল ঢোকা আটকাতে কীভাবে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়েছিল, মিলিত কান্নার রোলের মধ্যে মাঝিরা অসুরের মতো পরিশ্রম করে ক্রমাগত জল ছেঁচে নৌকোকে বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলকে কীভাবে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেয় তা বর্ণনা করতে করতে আতঙ্কে মায়ের গলা বুজে আসে, আমাদের গায়ে কাঁটা দিত, দৃশ্যটা কল্পনা করতাম আর ভাবতাম, এই রকম বিপদে যেন আমাকে পড়তে না হয়।

BanglaBook.org

কিন্তু ভাবলে কী হবে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের চিত্রনাট্যে প্রায় এইরকম খান দুই জলের বিপদ যে লেখা হয়ে গিয়েছিল তা আর কী করে জানব? প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল যখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। পাহাড়ি নদীর হড়পাবানে ভেসেই যাচ্ছিলাম, একবার ডুবছিলাম একবার উঠছিলাম, জলতলে পাথরের ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে সলিল সমাধি হতে হতে কোন্ অলৌকিক শক্তিতে বেঁচে ফিরেছিলাম তা আজও জানি না। সে ঘটনার কথা আমার একটা বইয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছি বলে না লিখে দ্বিতীয় ঘটনাটার কথাই লিখি। সে-ও কম ভয়ংকর ঘটনা নয়। নেহাত পরমায়ু ছিল বলে সে যাত্রা বেঁচে ফিরেছিলাম।

তখন আমি হাওড়ার শালকিয়ায় থাকতাম—আমার জন্মভূমি। স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে ভরতি হয়েছি। রোজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাঁধাঘাটের ফেরিঘাটে আসি, লঞ্চ ধরে গঙ্গা পেরিয়ে আবার হাঁটা লাগাই, আহিরিটোলা, বি কে পাল অ্যাভিনিউ হয়ে গ্রে স্ট্রিট ধরে সোজা হেদুয়া, হেদুয়া পার্কের পেছনেই কলেজ।

সকালের দিকে ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাসগুলো থাকার জন্য স্নান-খাওয়া সেরে সাধারণত সাড়ে দশটার মধ্যে বন্ধু স্বপন আঢ্যর সঙ্গে বাঁধাঘাটে পৌঁছে যেতাম। তখন সদ্য যুবক, গায়ে শক্তি, মনে সাহস, কথায় কথায় বাহাদুরি করি। লঞ্চ ছেড়ে দিলেও ছুটতে ছুটতে জেটি থেকে রানিং লঞ্চে কতবার যে লাফিয়ে উঠেছি ঠিক নেই।

এইভাবে ওঠানামা করতে গিয়ে মাঝেমাঝেই অ্যাকসিডেন্ট হত, যাত্রীরা জলে পড়ে নাকানিচোবানি খেত, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে, কিন্তু বয়েস কম বলে আমরা গ্রাহ্যই করতাম না, লঞ্চ থেকে জেটির অনেকটাই ফাঁক হয়ে গিয়েছে, একচুল এদিক ওদিক হলেই জলে, প্যাসেঞ্জাররা 'উঠো না, উঠো না' বলে চিৎকার করছে, কিন্তু কে শোনে? ডায়েরি-হাতে দুই বন্ধু বীরবিক্রমে একলাফে সোজা লঞ্চে। এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে লঞ্চে ওঠা উচিত নয় তা নিয়ে যাত্রীরা কথা শোনাতে এলে গম্ভীরভাবে দুই বন্ধু উত্তর দিচ্ছি, "কী করব দেরি হয়ে গেছে, কলেজে প্র্যাকটিক্যাল আছে।"

প্র্যাকটিক্যাল না ছাই, আসলে সেদিন হয়তো কলেজ কেটে আমাদের

BanglaBook.org

সিনেমা দেখতে যাওয়ার আছে, শো-এর টাইম হয়ে যাচ্ছে বলেই এত তাড়াহুড়ো। কিন্তু কে আর তার জন্য গোয়েন্দা লাগিয়ে বসে আছে? তাই আমাদের উত্তরে তারা চুপ মেরে যেত, আমাদের ঘাঁটাত না, আমরা অনেক কষ্টে হাসি চাপতাম। পড়াশোনা-কলেজ-স্টুডেন্টদের প্রতি লোকজনের শ্রদ্ধা আজকাল একটু কমলেও এখনো যা আছে তা নিয়ে দুটো জেনারেশন হেসেখেলে কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু একদিন সকালে লঞ্চঘাটে এসে আমাদের হাসি শুকিয়ে গেল। সেদিন আমাদের আর এক বন্ধু অজিত আমাদের সঙ্গী হয়েছে। শালকিয়া চৌরাস্তার কাছে অমিতদের ফার্নিচারের বড় দোকান—বেশ মালদার পার্টি। স্কুল ফাইনালের পর আমাদের সঙ্গে একই কলেজে ভরতি হলেও পড়াশোনায় মন নেই, কলেজেই যায় না, যেদিন যায় সেদিন আমাদের আনন্দের দিন, কারণ নিজেদের পকেট খসিয়ে সেদিন আমাদের সিনেমা দেখতে হয় না, অমিতই দেখায়, শুধু সিনেমা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না, পরীক্ষার সময় পাশে বসে যাতে সে আমাদের খাতা দেখে লিখতে পারে সেই শর্তে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ায়।

ফলে আজ আমাদের আনন্দের শেষ নেই, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ, হইহই করে ইয়ার্কি-ফাজলামি দিতে দিতে তিনবন্ধু চলেছি হাতিবাগানে। সিনেমা শুরু দুপুর বারোটায়, তাই আজ একটু দেরি করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, কিন্তু লঞ্চঘাটে গিয়ে আমাদের আনন্দ হোঁচট খেয়ে পড়ল, মাথায় হাত। নদীতে বান আসছে বলে লঞ্চ বন্ধ।

বান আসার নির্ধারিত সময়ের আগেই লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়, লঞ্চগুলো মাঝগঙ্গায় গিয়ে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে যায়। বান চলে যাওয়ার পরে জলের টান কমলে তার পর আবার লঞ্চ চলাচল শুরু হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা। বর্ষার সময় বানের আকার বড় হয়, তখন আরো দেরি হয়। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, সময়টাও এখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি না হলেও আকাশে মেঘের আনাগোনা, রোদ্দুর এই আছে এই নেই।

কী করি ভাবতে ভাবতে একবার ভাবলাম বাস ধরে চলে যাই হাতিবাগানে, কিন্তু বাস যত জোরেই যাক, রাস্তার জ্যাম ঠেলে হাতিবাগানে পৌঁছতে পৌঁছতে সিনেমার হাফটাইম হয়ে যাবে। তাই নিরুপায় হয়ে বাড়িই

BanglaBook.org

ফিরে যাব কিনা ভাবছি তখনই মেঘ না চাইতেই জল, আমাদের দমে-যাওয়া উৎসাহে অক্সিজেন দিয়ে জেটির ব্রিজের নীচে ঘাটে একটা নৌকা এসে ভিড়ল, আহিরিটোলা ঘাটের যাত্রী হাঁকতে লাগল। মাঝি জানাল, বান আসতে এখনো আধঘণ্টা, ততক্ষণে আরামসে নৌকা ওপারে পৌঁছে যাবে। লঞ্চ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাঝি এই তালে কিছু কামিয়ে নিতে চাইছে।

তা নিক, কিন্তু নদীর কথা বলা যায় না, হুট করে বান আগেই চলে এলে কী হবে? বানটা আবার যায় কলকাতার দিক দিয়েই। ভয়টা এই কারণে আরো বেশি। বানের যা সাইজ, যা রোখ তার কাছে নৌকো তো একটা মোচার খোসা বই না। যতই সাঁতার জানি, হড়পাবানে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে জানি জলে পড়লে আর উঠতে হবে না, নদী বিকট ঢেউয়ের থাপ্পড় লাগিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দেবে, কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই। স্রেফ দমবন্ধ হয়েই ডুবে মরতে হবে।

আমাদের মধ্যে স্বপনের যেমন চেহারা, তেমনি সাহস, খেতেও পারত খুব। একে সিনেমা তার ওপর গরম গরম বিরিয়ানি, তাকে আর রোখা গেল না, 'চল চল' বলে আমাদের গুঁতো মেরে নৌকায় তুলে দিল। আমরা ইতস্তত করতে লাগলাম, কিন্তু সে কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। সময় মতো সিনেমাহলে পৌঁছতে গেলে এ ছাড়া আর পথ নেই বলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়ে মাঝিদের তাড়া লাগাল, "শিগগির নৌকা ছাড়ো। জলদি! শো-এর টাইম হয়ে যাচ্ছে।"

ততক্ষণে আমাদের দেখে ঘাটে আটকা-পড়া লোকজন সাহস পেয়ে গিয়েছে, টপটপ অনেকেই উঠে পড়েছে নৌকায়, তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও উঠে পড়ে চলে গেল নৌকার ছইয়ের ভিতরে। আমাদের নয় জোড়া টান, কিন্তু মহিলাদের কীসের এত তাড়া, কীসেরই বা এত টান বুঝলাম না।

মোটামুটি খান কুড়ি লোক হতেই মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল। তখন ইঞ্জিনচালিত ভুটভুটির প্রচলন হয়নি, মাঝিদের একজন হালে বসল, নৌকার মাঝামাঝি করে দু'পাশে দু'জন বসে ছপাং ছপাং করে দাঁড় টেনে চলল। দেখতে দেখতে বাঁধাঘাট ছেড়ে নৌকা প্রায় মাঝগঙ্গায় চলে এল, জল সশব্দে উলটোমুখে বইতে শুরু করেছে—বান আসার পূর্বলক্ষণ। বুক ঢিপঢিপ করে উঠল আমার। মনে হল আজ একটা অঘটন না হয়েই যায় না।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা নজরে করে যাত্রীরাও ভয় পেয়ে গেল, আরো জোরে নৌকা চালানোর জন্য চেঁচামিচি জুড়ে দিল। কিন্তু মাঝিদের তাড়া আমাদের চেয়েও বেশি। বান আসার আগেই তারা আমাদের পৌঁছে দিয়ে আবার ওপার থেকে আর একট্রিপ যাত্রী নিয়ে ফিরতে চায়। আমাদের চুপ করে নির্ভয়ে বসে থাকতে বলে তারা হাঁইহুঁই করে দাঁড় টেনে চলল আর মধ্যে মধ্যে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বান এসে গেল কিনা।

আরো মিনিট পাঁচেক কাটল, নৌকা আহিরিটোলার ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি লঞ্চের জেটি, ব্রিজ এমনকী, ঘাট বা ঘাটের সিঁড়ি ঝাঁ ঝাঁ করছে, একটা লোক নেই, বানের ভয়ে সকলে বেশ খানিকটা তফাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। তাদের মধ্যে যেমন আটকা-পড়া লঞ্চের যাত্রী আছে, সাধারণ দর্শকও আছে। যত নৌকো তীরের দিকে এগোচ্ছিল তত তাদের মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে আসছিল। অজানা এক আশঙ্কায় আর ভয়ার্ত কৌতূহলে আমাদের নৌকার দিকে চেয়ে আছে তারা। দেখে গা ছমছম করে উঠলেও মুখে বাহাদুরির ভাব করে আঙুল তুলে ঠাট্টার সুরে বন্ধুদের বললাম, "আমাদের দিকে চোখ গোল গোল করে কেমন দেখছে দ্যাখ সব। নিজেদের মাইরি হিরো হিরো লাগছে।"

স্বপনও হাসছিল, ঘাড় নেড়ে বলল, "সব বান দেখতে এসেছে।"

অমিতের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই, 'বান এসে গেলে হিরোগিরি বেরিয়ে যাবে' বলে আমাকে ঝেঁঝে দিয়ে স্বীকার করল, "এখন দেখছি বাড়ি ফিরে গেলেই হত, আমার ভয় করছে।"

"ন্যাকা!" যখন বিরক্তভাবে আঙুল তুলে দিয়ে দেখাল, "দ্যাখ লোক দুটোকে। সাহস কাকে বলে দ্যাখ। ডরপুক কোথাকার!"

আমরা চেয়ে ছিলাম তীরের দিকে, দেখলাম, হাফপ্যান্ট-পরা দু'জন লোক জেটির ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে জেটিতে এসে লাফ দিয়ে পড়ল জলে, তার পর স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতরাতে শুরু করল। ভরা গঙ্গায় বানের মুখে এরা কী করতে জলে নামল রে বাবা?

স্বপন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল আমাদের। এরা বানের সঙ্গে টক্কর নিতে যাচ্ছে, ঢেউয়ের দোলনায় দোল খেতে খেতে এরা গঙ্গা ভ্রমণের প্ল্যান

BanglaBook.org

করেছে। এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করতে হলে শুধু সাহস থাকলে হবে না, বানকে ফেস করার টেকনিকও জানতে হবে।

আমাদের কথা শুনতে শুনতে মাঝিগুলো হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, পলকে তাদের মুখচোখ বদলে গেল, 'বান আসছে', 'বান আসছে' বলে চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হালে যে ছিল সে বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মোচড়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল, যে পথে এসেছিলাম সেই পথে বাঁধাঘাটের দিকে তীব্রগতিতে নৌকো ছুটিয়ে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, "সবাই ভেতরে যান, ভালো করে ধরে বসুন।"

যে-ভয়টা করছিলাম ঠিক তাই হয়েছে, বান এসে গিয়েছে। 'বাবাগো' বলে ভয়ে-আতঙ্কে অমিত হুড়মুড় করে নৌকার ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল, তার পেছন পেছনে বাকি সকলে। আমরা অবশ্য গেলাম না, বাহাদুরি করে যেমন দাঁড়িয়েছিলাম দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে চেয়ে রইলাম হাওড়ার ব্রিজের দিকে। মাঝিদের পাত্তাই দিলাম না।

প্রথমটা কিছুই চোখে পড়ল না, কয়েক সেকেন্ড পরে ব্রিজের তলা দিয়ে ভালো করে নজর করে যা দেখলাম চোখ ঠেলে বেরোল আমাদের। কালো একটা ঢেউয়ের পাহাড় ওলটপালট খেতে খেতে ধেয়ে আসছে, তাকে স্বাগত জানাতে আগে আগে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাদা ফেনার মতো বিপুল জলরাশি। কালোর সঙ্গে সাদার এমন ম্যাচিং সত্যিই ভাবা যায় না। লোকদুটো সাঁতার কেটে সেদিকেই যাচ্ছে, ভয়ে-আতঙ্কে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে ধপ করে বসে পড়লাম।

আমার দেখাদেখি স্বপনও বসে পড়ল, উত্তেজিতভাবে বলল, "ভালো করে ধরে বোস, নৌকো উলটে গেলেও ছাড়বি না।"

নৌকো ভীষণভাবে দুলতে শুরু করল, জলের টান আর নৌকোর গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল। ভয়ে নিঃশ্বাস আটকে আসছিল আমার, কিন্তু কৌতূহলও চাপতে পারছি না, বসে বসেই দেখছি, নদীর বহর, আয়তন আর চেহারা চোখের পলকে বদলে দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে বানের পাহাড়। মাঝগঙ্গায় নোঙর করে দাঁড়ানো লঞ্চগুলো একসঙ্গে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে, বান এসে পড়ার সঙ্কেত দিচ্ছে তারা।

দেখতে দেখতে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে নিমতলা ঘাটে চলে এল বান,

BanglaBook.org

শ্মশানের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বিশাল এক জলস্তম্ভ তৈরি করে আক্রোশে ফেটে পড়ল, তার আড়ালেই ঢাকা পড়ে গেল লোকগুলো। সমুদ্রে ঢেউ এলে যেমন তার তলায় ডুব দিতে হয়, ঢেউ মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, ক্ষতি হয় না, ঠিক সেই কায়দায় লোকগুলো নির্ঘাত বানের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, একটু পরেই ভেসে উঠবে।

ততক্ষণে মাঝিদের তৎপরতায় আমরা মাঝগঙ্গায় চলে এসেছি, সেখান থেকে যে দৃশ্য দেখলাম জীবনে ভুলব না। বান আহিরিটোলার ফেরিঘাটে আসতেই অতবড় লোহার জেটিটা খেলনার মতো প্রায় বিশ হাত ওপরে উঠে গিয়ে পরক্ষণে অবিকল ঢেউয়ের মতোই সুন্দর ডিজাইন করে আবার নীচে নেমে গেল, এক ঝটকায় জলের উচ্চতা বেড়ে যেতেই জেটির ব্রিজটাও টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমার মনে হল, বানটা যেন পাগলা হাতির মতো জেটিটাকে শুঁড়ে তুলে দিল এক আছাড়।

এদিকে আমাদের নৌকা তখন মাঝগঙ্গায় থাকলে কী হবে, আমরাও তো তখন বানের লাইনে চলে এসেছি, জেটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের নৌকোও ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সাঁ করে শূন্যে উঠে গেল, পরক্ষণে ঠিক ততটাই উচ্চতা থেকে আবার নীচে। কিন্তু ধন্য মাঝিদের হাতের খেল, নৌকো ওলটাল না, তারা নৌকোকে সোজা রেখেই আবার একটা বিশাল ঢেউয়ের মুখোমুখি হল, আবার সেই উচ্চতা, আবার সেখান থেকে পতন।

এইভাবে একটার পর একটা ঢেউ আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা জুড়ে দিল, আমাদের নৌকোকে চরকিবাজি খাওয়াতে লাগল আর খলখল করে হাসতে থাকল। হাসতে হাসতে আঁশটে গন্ধের জলে নৌকাসুদ্ধ আমাদের স্নান করিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "আর কোনোদিন কলেজ কেটে সিনেমা দেখতে যাবি? ক্লাস বাদ দিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ার লোভ করবি?"

আর করে কখনো? আর অমিতের পাল্লায় পড়ছি না বাবা। আমাদের সব বাহাদুরি তখন শেষ, মুখ শুকিয়ে আমসি, পারলে কান ধরে ওঠবোস করি, নাকে খত দিই। নৌকার যাত্রীদের অবস্থা তো আরো কাহিল। ভয়ে চিৎকার চেঁচামিচি জুড়ে দিয়েছে, মেয়েগুলো গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে লোকজনের সে কী হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ভগবানকে। নাক মলে কান মলে তারা বলছে, জীবনে আর অন্যায় করবে

BanglaBook.org

না, এখন থেকে সৎপথে থাকবে। একজন তো পারলে মাঝিদের পায়েই পড়ে যায়, নিরাপদে তাদের তীরে পৌঁছে দিক তারা, নগদ একশো টাকা বখশিশ দেবে সে।

ওদিকে নৌকোর অবিরাম নাগরদোলায় অমিতের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, ওয়াক তুলছে সে। যে কোনো সময় কারো গায়ে বমি করে দিতে পারে। স্বপন হুঙ্কার ছাড়ল, "অ্যাই বমি করবি না, বমি করবি না!"

তাড়াতাড়ি মুখ চেপে বমি সামলে অমিত গজগজ করে উঠল, "আর জীবনে যদি তোদের সঙ্গে আসি!"

বিপদে পড়লে মানুষের কী অবস্থা হয়, তাদের আচার-আচরণ, ডায়লগের ধরনধারণ, এমনকী, স্বভাবও কেমন পালটে যায় সেদিন নিজের চোখে দেখতে দেখতে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ভরা পদ্মানদীতে নৌকাডুবির মুখে পড়ে মায়ের মনের অবস্থা সেদিন কেমন হয়েছিল, নৌকোর লোকজন ভয়ে-তরাসে কেমন আচরণ করছিল তার একটা আঁচ ভালোই পাচ্ছিলাম। সেদিন নৌকাটা ওলটালে কী যে হত এখনো ভাবি আর শিউরে শিউরে উঠি। সেদিন জোর ফাঁড়া গিয়েছিল আমার।

তবে সব কিছুরই শেষ আছে, এটারও হল। আরো প্রায় দশ মিনিট মাঝগঙ্গায় আমাদের তুর্কিনাচন নাচিয়ে একসময় ঢেউয়ের মাতামাতি ও নৌকোর নাচানাচি বন্ধ হল, আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, বান আহিরিটোলা ছাড়িয়ে শোভাবাজার পেরিয়ে চলে গেল, অনেক দূরে লোকদুটোর কালো কালো মাথাও ভেসে উঠল, বানকে ফাঁকি দিলেও জলের টানে ভেসে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে তাদের গঙ্গাভ্রমণ শেষ হবে কে জানে। তবে তারা পাক্কা সাঁতারু, ঠিক সময় পারে উঠে আসবে।

এদিকে সবে বান গিয়েছে, তখনো বুলেটের মতো জল ছুটছে। কচুরিপানার ঝাঁক, গাছপালা, মড়া জীবজন্তু, প্লাস্টিক-আবর্জনা কী নেই তাতে? মাঝিরা সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় টানছে, হাল চালাচ্ছে, কিন্তু নৌকাকে রাখা যাচ্ছে না, স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ওদিকে বানের জল আহিরিটোলার ঘাটের সব সিঁড়ি ডুবিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে রাস্তায়, থইথই করছে জল আর জল!

দেখতে দেখতে আহিরিটোলা ছাড়িয়ে আমাদের নৌকা আরো উত্তরে

BanglaBook.org

চলে গেল, শোভাবাজার ঘাটের কাছাকাছি হতে নদী একটু যেন শান্ত হল, সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল গন্তব্যের দিকে। স্রোতের টানে কয়েক মিনিটেই নৌকা কলকাতার তীরে পৌঁছে গেল, কিন্তু তখনো এমনই জলের তোড় তীরের মতো তীর দৌড়চ্ছে, কিছুতেই নৌকা বাঁধা যাচ্ছে না।

শোভাবাজার ঘাট ছাড়িয়ে নৌকা বাগবাজার ঘাটের দিকে এগোতেই মাঝিরা মরিয়া হয়ে গেল, হেডমাঝির নির্দেশে নৌকা বাঁধার কাছিটা নিয়ে একজন দাঁড়ি লাফিয়ে পড়ল জলে, কিছুক্ষণ নৌকার সঙ্গে ভেসে হ্যাঁচড়প্যাচড় করে অদ্ভুত কায়দায় তীরে উঠে আসুরিক শক্তিতে নৌকাকে দিল টান, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে নৌকা থেমে গেল, আমরা উলটে পড়তে পড়তে কোনোরকমে নিজেদের সামলালাম।

কিন্তু অমিত নিজেকে সামলাতে পারল না, ছই থেকে বেরিয়ে এসেছিল আগেই, স্বপনের ভয়ে বমি চেপে ছিল, নৌকো থামতেই সকলকে বাঁচিয়ে জলেই বমি করে ফেলল। শুধু তাই নয়, স্রোতে নৌকো টলমল করছে, থরথর করে কাঁপছে, তার মধ্যে ব্যালান্স করে আমরা এক এক করে নামছি, নামতে গিয়ে হঠাৎ ধড়াস করে সে মুখ থুবড়ে পড়ল জলেকাদায় ভরা মাটিতে।

ততক্ষণে ধড়ে প্রাণ এসেছে আমাদের, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম এই ভেবে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে হেসেই ফেললাম, ফুর্তির মেজাজে অমিতকে বললাম, "কী রে সিনেমায় যাবি আর?"

জামাকাপড় কাদায় মাখামাখি, একেবারে ভূতের দশা তখন তার, আমার খোঁচায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, বলল, "নিকুচি করেছে সিনেমার! নিকুচি করেছে কলেজের!"

হুঁ, অমিত কথা রেখেছিল, সত্যি সত্যি পরের দিন থেকে পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সঙ্গে দোকানেই বসতে শুরু করেছিল। মা গঙ্গার এক বানেই তার জীবনের খাতা থেকে পড়াশোনার পাটটাই ভেসে চলে গিয়েছিল। আমরাও কলেজ কেটে প্র্যাকটিকালের নাম করে সিনেমা দেখার নাম করতাম না। লোকঠকানো বাহাদুরি বন্ধ করে লক্ষ্মীছেলের মতো পড়াশোনায় মন দিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

# শিকার

## অনিন্দিতা গোস্বামী

দরজায় কান পেতে আছে লক্ষ্মী। কিন্তু কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না। আম কাঠের দরজা বেঁকে ফাঁক হয়ে আছে, তার মধ্যে দিয়ে চোখ দিলে দেখা যাচ্ছে ঘরের কোণে একটা কুপি জ্বলছে আর মাদুরের ওপর বসে কি একটা শলা করছে কজনে মিলে। কিন্তু ওই দলে ঠিক কে কে আছে ঝাপসা আলোয় তা ঠাওর করতে পারছে না সে।

ঠেয়ে ঠেয়ে পা লেগে গেল লক্ষ্মীর। কুপির তেল শেষ হয়ে আলো নিভু নিভু, তবু যেন এদের মিটিং আর শেষ হয় না। কি এত কতা কে জানে বাপু, মিটিং তো হয় পোধানের বাড়ি তা হঠাৎ আজ তাদের বাড়িতে মিটিং কেন? পিত্তি জ্বলে যায় লক্ষ্মীর, তেল কি মাগনা আসে হ্যাঁ। সব ওই হতচ্ছাড়া

BanglaBook.org

হাসনুর বাপটার কাম, দিন রাত্র পাটির পাছে পাছে লেগে রয়েছে। তা তোরে পাটি কি দেছে শুনি? না কাজ কাম না দুটো টাহা পয়সা, সব ওই দেবে, তা আজও দেছে তো কালও দেছে। পাটির কথায় ভুলে তার ছেলে দুটো লেখাপড়া গোল্লায় দেছে এহন পরানডা দিলে ষোলো কলা পুন্নি হয় আর কি। গজ গজ করতে করতে লক্ষ্মী বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে বসে।

বসে বসে ঘুমের ঝুল আসে লক্ষ্মীর। সারা দিনের খাটা খাটনির শরীল। ঢুলুনির মধ্যেই তার মনে হয় কারা যেন তার কোল থেকে ছেলে তুলে নিয়ে পালায়। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দাওয়ায়। উঠোনের মাঝে কোথা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কুচকুচে একটা কালো বেড়াল, তাঁর চোখ দুটো সবুজ, জ্বল জ্বল করছে, হ্যাস্ হ্যাস্ করে দুবার তাড়া দেয় লক্ষ্মী ওটাকে, অলুক্ষুনে কোথা থেকে কদিন জুটেছে কে জানে। লক্ষ্মী বন্ধ দরজাটার দিকে তাকায়, তার ছেলে দুটোও আছে ওই ঘরে, আছে হাসনুর বাপও। হাসনু ওই কোণে লণ্ঠনের আলোয় দুলে দুলে পড়ছে ওর পাশের পড়া। ওর পরীক্ষা চলছে। বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে এবার হাসনু। ছেলে দুটোর তো হল না যদি মেয়েটার একটু লেখাপড়া হয়, কত কষ্ট করে যে সে লণ্ঠনের তেলটুকু জোগাড় করেছে তা সে-ই জানে।

হাঁড়ির ভাত কটাতে জল উঠে গেল। পৌষ মাসের শেষ, ঠাণ্ডা নামছে হু হু করে। দূরে শেয়াল ডাকছে দুই প্রহরের, গাঁয়ে গঞ্জে মানুষের এ সময়ে নিশুথ রাত তবুও ওদের মিটিং শেষ হচ্ছে না। এবার ভোটে নাকি তাদের পাটি জিতবে আর তালেই তাদের ফিরে যাবে ভাগ্য। এত খাটনি খাটছে তারা বাপ বেটায় মিলে কি এমনি! এখন এ গাঁয়ে সকলেই সেই আশায় বুক বেঁধে আছে, অনেক কষ্ট করেছে তারা খালের এপারের লোকেরা এতদিন। এখন ধীরে ধীরে সুদিন আসছে তাদের। তাদের পার্টির জোর বাড়ছে। এ গাঁয়ের কত লোক গাঁয়েই থাকতে পারেনি এতকাল তারা আবার ফিরে এসেছে। এখন তারা তাল খুঁজছে প্রতিশোধ নেবার।

হাসনুর বাপ অবশ্য আগে অত পাটি টাটি করত না। খেতে কাম ধাম করত কিন্তু একবার বুকের ব্যামো হয়ে ফিট গেল। সদর হাসপাতালের ডাক্তার বলল রোদে জলে খেতে কাম করা চলবে নি। সেই থেকে পাটি করা ধরল। বাপের দেখাদেখি ছেলে দুইটোও লেখাপড়া চাঙে তুল্যা পাটি ধরল।

BanglaBook.org

হাসনুর বাপ স্বীকার যায় না কিন্তু লক্ষ্মী জানে পাটি করার নামে হাসনুর বাপ আর তার দুই পোলায় বোমা বাঁধে। ওই পারের পোধানের নাকি বোমা বাঁধবার সময় বোমা ফাইটা একখান হাত কবজি থ্যাক্যা উইড়া গ্যাছে, হেই জন্যই তো সে পোধান হইছে। হাতের বদলে মাথাডাও তো উইড়া যাইতে পারে যে কুনো সময়। দুধের বোঁটা দুইডা এহনও সুলায় হাসনুর বাপ, আমার পোলা দুইডারে খাইয়ো না তুমি। ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মীর বুকের হাপর টেনে উঠে আসে একটা দীর্ঘ শ্বাস।

দরজা খুলে যায়। মাথা মুখ চাদরে ঢেকে ঝমঝম করে নেমে যায় লোকগুলো। ঠাণ্ডা ভাতগুলো সানকিতে বেড়ে দিতে দিতে লক্ষ্মী বলে, বড় খোকা, কি এত মিটিং হল তদের শুনি? বড় খোকা জবাব দেয়, তুমি শুইনা কি করবা, মেয়ে মানষের অত কথায় কান দিতে নাই। লক্ষ্মী বলে, দেখস প্যেটে ধরছি তো তাই ভয় লাগে। যা করছস ভাইবা করস। হাসনু বলে, চুপ কর মা নিজের ভালো পাগোলেও বুঝে ওরা বুঝে না। দেখলানা, এত কইরা বলা সত্ত্বেও বড় জন কলেজে ভর্তি হইল না, আমার পারের ক্লাসেই তো ছিল, আমার সব বই খাতা নোট পত্তর পায়া যাইতো, তা বাবু শুনল? না পাটি হইতাছে, দেশ উদ্ধার হইতাছে। সব দায় তো ওরই ঘাড়ে না। আর ছোট জন তো আরো সরেস, মাধ্যমিকেই শেষ করল না, ওদের বুঝায়ে কোনো লাভ হইব না, পার্টিই ওদের খাইব।

এই! চোখ পাকিয়ে ছোটজন তেড়ে যায় দিদির দিকে, লক্ষ্মী দুহাত ছড়িয়ে দুজনের মধ্যে দেওয়াল হয়ে দাঁড়ায় বলে, রাত দুপুরে আর ঝগড়া বাধাস নি বাবা। এখন ভালোয় ভালোয় একটু শুইতে দে।

এঁটো নিকিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে চৌকির এক কোণে শুলো লক্ষ্মী। পাশে গুনগুন করে পড়ছে হাসনু। দুই ছেলে আর তাদের বাবা চলে গেছে পাশের ঘরে ঘুমোতে।

হাসনুহানা ডাকল, মা ঘুমাইলা? লক্ষ্মী ফিরল মেয়ের দিকে, বলল, ক। হাসনু বলল, আর কটাদিন কষ্ট কর মা, আমি একটা চাকরি পাইলে তোমাগো কোনো কষ্ট আর থাকব না।

লক্ষ্মী বলল, তোর বাবা বলে পার্টি না ধরলে নাকি আজকাল চাকরি হয় না?

BanglaBook.org

হাসনু বলে, বাজে কথা, কত পরীক্ষা আছে চাকরির, আমি চাকরি পায়া তোমাগো দেখায় দিমু। তবে হ্যাঁ আমি কিন্তু আর এই গাঁয়ে থাকব না, ভাইদের একটা দোকান কইরা দিয়া, আমি তোমারে নিয়া অন্য কোথাও চইল্যা যামু। এই গাঁয়ে থাকতে আর আমার ইচ্ছা যায় না, সারাক্ষণ মারপিট বোমাবাজি।

কিছু পালটাইব না মা, এত বোমা এত বন্দুক এসব কি আর ঘরে রাইখ্যা দিবে কেউ?

তবু জন্ম ভিট্যা ছাইড়ে চইল্যা যাবি?

বিয়া বসলে যাইতাম না?

হঁ হেইডা হইল গিয়া আলাদা।

কুনো আলাদা না, মেয়েদের কুনো ঘর নাই মা।

লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়ে মায়ের গায়ে হাত দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে হাসনু। লক্ষ্মীর ঘুম আসে না। মেয়ের ভারী নিঃশ্বাস তার হাতের ওপর পড়ে। উঠোনের পারে ছিল মস্ত এক হাসনুহানার ঝোপ, গন্ধে ম ম করত বাড়ি। তার শাউড়ি সাধ কইরা তার মাইয়ার নাম রাখছিল হাসনুহানা। এ নাম কারো পছন্দ না। হিঁদুর ঘরে এ নাম মানায় না। তাছাড়া লোকে কয় হাসনুহানার গন্ধে ঘরে সাপ আসে। কিন্তু লক্ষ্মীর পছন্দ ছিল নাম। মেয়ের গুণ ফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে যাবে চারদিকে মনে মনে এই ছিল লক্ষ্মীর আশা। তা সে আশা পূর্ণ করেছে তার মেয়ে। গ্রামের ইস্কুলে তার মেয়ে সবসময় হতো ফার্স্ট। উচ্চমাধ্যমিকের পর পঞ্চায়েত থেকে একটা সাইকেল টাকা অনেক কিছু পেয়েছে তার মেয়ে। ওই খাল পারে মেয়েদের ইস্কুল। শহর থেকে ট্রেনে করে দিদিমণিগুলা আসে জামা পরে চুলে ঝিটকি বেঁধে। এই তার হাসনুরই মতন। হাসনু বলে না মা ওদের বয়স আছে, দূর থেকে তোমার অমন লাগে তাই। ওরা কত পড়াশোনা করছে, পরীক্ষা দিয়া চাকরি পাইছে। লক্ষ্মীর খুব শখ তার মেয়েও ওই ইস্কুলে পড়াবে। হাসনু বলে এখন অমন ভাবে চাকরি হয় না মা, ওই স্কুল বললেই ওই স্কুলে চাকরি পাওয়া যায় না। পরীক্ষা দিতে হবে তারপর ওদের যেখানে ইচ্ছা হবে সেখানে তোমায় চাকরি দেবে ওরা। সে যেখানে দেয় দেবে তার মেয়ে দিদিমণি হলেই হল। ছেলে দুটোকে পারেনি লক্ষ্মী কিন্তু মেয়েটাকে তো পেরেছে। আনন্দে চোখের কোন চিক্‌চিক্ করে লক্ষ্মীর।

BanglaBook.org

পাখি ডাকার আগেই দুমদাম বোমার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লক্ষ্মীর। ওই খাল পারে শুরু হয়েছে বোমাবাজি। পেটো না এটা বেশ বড় মাপের বোমা। এখন শব্দ চিনে গেছে লক্ষ্মী, বড় বোমার শব্দ গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, ওরা দুটো ফেলেছে মানে এরা কাল চারটে ফেলবে, এত বোমা পড়ছে বলেই না হাসনুর বাবার খাতির বেড়েছে পার্টিতে, তা শুধু খাতিরে তো আর পেট ভরে না, টাকা আসে কই? ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মী কুয়োতলায় এসে দাঁতে মাজন নেয়। আর তক্ষুনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অজয় কচার বেড়া ধরে দাঁড়ায়, কাকী কাকা কোথায়? প্রধান সবাইকে ডাকতিছে।

পিক্ করে থুতু ফেলে লক্ষ্মী বলে, হঁ সকাল থিক্যা শুরু করলা হুজ্জুতি। বোমা লাগব তোমাগো এহন না তাজা বোমা?

অজয় আমতা আমতা করে, কি যে কও কাকী।

ঠিক কই, এর শ্যেষ হইব কবে?

আমাগো একবার জিততে দাও কাকী, সব শান্ত হইব।

হঁ শ্মশানের শান্তি।

হই চই-এ সকলেই উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। হাসনুর বাবা দিবাকর মণ্ডল লুঙ্গিতে গিঁট দিতে দিতে উঠোনে নেমে চললেন। চ চ অজয় কথা বাড়াস না। হাসনুর দুই ভাইও ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেল বাবার পাছে পাছে। বেড়া ধরে ক্ষণিক দাঁড়াল অজয়। কোমরে ওড়না খানি জড়িয়ে হাসনু একবার কটমট করে তাকাল অজয়ের দিকে, অজয় মাথা নামিয়ে দ্রুত পা বাড়াল। লক্ষ্মীর নজর এড়াল না কিছুই। এই ছেলেটা পছন্দ করে তার মেয়েকে, তার মেয়েও একসময় বেশ পছন্দ করত ছেলেটিকে। কিন্তু এই ছেলেও তার বড় খোকার মতো উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর ভিড়ল গিয়ে ওই পাটিতে, লেখাপড়া আর করল না, তাই হাসনুর খুব রাগ, এখন আর কথাই বলে না ওই ছোড়ার সঙ্গে। আনমনে হাসে লক্ষ্মী, ওপরের কথা বন্ধ হলেই কি চোখের কথা বন্ধ হয়। কিন্তু না লক্ষ্মীরও এই সব বাউণ্ডুলে ছেলে এক্কেবারে পছন্দ না, সে তার হাসনুর বিয়া বসাবে আপিস বাবুর সঙ্গে। তার মেয়েকে এত কষ্ট করে পড়াচ্ছে কি সে এমনি?

চোঙ্গা ফুঁকে গরম গরম বক্তিমে ঝাড়ছে পার্টির নেতারা। অশান্তি বেশ ভালোমতোই শুরু হয়েছে। এলাকার দখল নিতে হবে। সামনাসামনি যুদ্ধ হবে এবার দুই গেরামের মধ্যে। মহাভারতের কথা শোন নি? এ হল বাঁচার লড়াই

BanglaBook.org

ধর্ম যুদ্ধ। মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ার ওপর বসে বসে বক্তৃতা শোনে লক্ষ্মী। সারাদিন ছেলেদুটো ঘরে ফেরে নাই, ভাত খায় নাই। যুদ্ধে গেলে কি কেউ মরব না? নিচ্চয় মরব। তার পোলা দুটো আগে মরব। বোমা ফাইট্যা ছেন্ন ভেন্ন হইব তার দুই পোলার দেহ। যার বাপ বোমা বানায় তার পাপ লাগব না? নেতারা ডাক দিতাছে, মা বোনেরাও আসেন। মিছিল কইরা যাইতে হইব তাদের আগে আগে, লক্ষ্মী বলেছে হাসনু তুই এ সবে এক্কেবারে যাইবি না, আমার পোলা দুইডা খায়া ওদের প্যাট ভরে নাই, এখন আমাগো দিকে হাত বাড়ায়। চাপ দিতাছে বইল্যা আমি যামু। তুই ঘরের খিল তুইলা পড়, কাল না তর পরীক্ষা। পরীক্ষা তরে বাঁচায়ে দেছে।

লক্ষ্মী শুনে আসে গ্রাম দখলের পরিকল্পনা। তাদের পার্টি লড়াই চায় না। তাদের গেরাম থ্যেকে মিছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে গিয়া ওই গেরামে ঢুইকা পরব। অনেক লোক আসছে। সব কিছু কাজ কাম সাজাইতে দুইডা দিন সময় লাগব। তবে ঘরের মধ্যে তোমরা যে যার অস্ত্রে শান দাও। না হেই কথাডা নেতারা জোরে বলে নাই, ফিস ফিস কইরা ঘুরতাছে সবার মুখ্যে মুখ্যে। সেদিন রাতে আবার কালো কালো কতগুলো ছায়া মানুষ তাদের উঠোনের ওপর টর্চ মেরে মেরে দেখে তাদের ঘরের আনাচ কানাচ, সর্বত্র। এরা কারা? লক্ষ্মী কি এদের চেনে? মাথা মুখ সব চাদরে ঢাকা। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে লক্ষ্মীর, চেঁচিয়ে ওঠে লক্ষ্মী, কে? কে ওখানে? না আজ এই দঙ্গলের মধ্যে হাসনুর বাপ বা ভাইরা নেই। তবে কি এরা পুলিশের লোক? বোমা খুঁজছে এরা? নাকি হাসনুর বাবাকেই? ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হাসনু। লোকগুলো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পরে। লক্ষ্মীর মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলতেই লক্ষ্মী ঘোমটার আড়ালে মুখ পর্যন্ত ঢেকে ফেলে, হাসনু ওড়না দিয়ে ঢেকে ফেলে তার মাথাও। লোকগুলো আঁতিপাঁতি করে কি যেন খোঁজে তারপর চলে যায়। সারা রাত হাসনুর বাবা ভাইরা কেউ বাড়ি ফেরে না, উৎকণ্ঠায় ঘুমোতে পারে না মা, মেয়েও।

পরদিন সকালে দুটো ভাত মুখে দিয়েই পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে গেল হাসনুহানা। সেদিনই তার পরীক্ষার শেষ দিন। এর পরেই বি.এ. পাস করে যাবে হাসনু। হাসনু সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিতেই কপালে হাত ঠেকায় লক্ষ্মী, দুগ্গা দুগ্গা।

সাইকেল চালাচ্ছিল হাসনুর ছোট মামা, সাইকেলের কেরিয়ারে পা

BanglaBook.org

ঝুলিয়ে বসেছিল হাসনুহানা। নাগাড়ে বকবক করে চলেছিল হাসনু ছোটমামার সঙ্গে। হাসনুর মামা হুঁ হ্যাঁ এক আধ শব্দে জবাব দিচ্ছিল। হাসনু বলল, কাল তো পরীক্ষা শেষই হয়া গেল আমার, তা দুটো দিন তো মামার বাড়ি থাইক্যা বাড়ি ফিরলেই হইতো। তা না জামা জুমা নে আয়। মামির শাড়ি পইরা না হয় দুদিন কাটায় দিতাম। আর যামু না যাও, একটা সিনেমা দেখাইলা না। মারে কয়া আয়। কেন্ মা রে ফোনে কয়া যাইত না?

তর মায়েরে ফোনে পাইলি কি? তদের তো ফোনের সুইচ অফ্। মামা সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

গ্রামে ঢোকার মুখে থিক থিক করছে ভিড়, গাড়ি, ক্যামেরা। ফের গণ্ডগোল। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল হাসনুর, বলল তোমারে কইলাম মামা আজ আইব না। গ্রামে আজ বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু হাসনুর মামা যেই বলল আমি দিবাকর মণ্ডলের শালা লক্ষ্মী মণ্ডলের ভাই অমনি তাদের ভিতরে যেতে রাস্তা করে দিল সবাই। ধক্ করে উঠল হাসনুর বুক, তার বাবা ঠিক আছে তো? তার ভাইরা?

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হাসনু জটলার ভেতরে, মাথা ঝুঁকিয়ে দেখল, এ কে। মাঠের মধ্যে দু-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে যে তার মা। পরনে তারই নীল চুড়িদার। জামা পরে তার মাকে কত কম বয়স দেখাচ্ছে, ঠিক যেন ওই ইস্কুলের দিদিমণিগুলার মতন। মা মাগো, হাঁটু মুড়ে হাসনু বসে পড়ে লক্ষ্মীর পাশে। হাসনুর ধাক্কায় লক্ষ্মীর নিথর দেহখান একটু নড়ে ওঠে। বাতাস বিদীর্ণ করে হুইসলের মতো বেজে ওঠে হাসনুর চিল চিৎকার মা-আ-আ।

অজয় নীচু হয়ে টেনে আনতে যায় হাসনুকে কিন্তু হাসনু এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দেয় অজয়কে। সকলে মিলে ধরাধরি করে হাসনুকে নিয়ে যায় বাড়ি। হাসনু চিৎকার করে বলতে থাকে, আমার মা শহীদ হইছে না? মিছিলে সবার আগে ছিল আমার মা না? মাতঙ্গিনী হাজরার মতন? কেউ তার কোনো কথার উত্তর দেয় না, সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। হাসনু চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও তার বাবা আর ভাইদের দেখতে পায় না।

ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে হাসনু সারাটা দিন। ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে লোকজন পাতলা হতে থাকে, রাত বাড়ে। বেশ রাতের দিকে এক মাথা মদ গিলে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে হাসনুর বাবা আর অতর্কিতে গলা টিপে ধরে হাসনুর, হতচ্ছাড়ি মা রে খালি?

BanglaBook.org

ছুটে আসে হাসনুর মামা, কর কি জামাইবাবু? ওর কি দোষ? তোমরাই তো দিদিরে শহীদ বানাইছ।

শহীদ! ওয়াক থু, তোর দিদিরে রেপ করছে। তারে রেপ কইরা মারছে উয়ারা সক্কলে। হেই মাইডার তো আসবার কথা ছিল ওই সময়, তুই কাল বাড়ি ফিরস নাই কেন্ ক? তর মা কেন তর জামা গায়ে দিল ক? সব তর কারসাজি। কে তরে খবর দিল ক?

হাসনুর বাবাকে সরিয়ে আনে হাসনুর মামা, বলে, মাইয়া মরলে কি তুমি শান্তি পাইতা জামাইবাবু?

চিল্লিয়ে ওঠে হাসনুর বাবা, হ পাইতাম, আমার ইস্ত্রির গায়ে হাত দিছে পোধান আমি ওরে ছাড়ুম না, বোমা মাইরা সব উড়াই দিমু।

কেমন যেন ধন্ধে পড়ে যায় হাসনু, তার বাবা কি তবে জানত সব কিছু? মাতাল মানুষ কি বলতে কি বলছে তার ঠিক নাই। স্ত্রী যে তার সম্পত্তি, তাই মা রে ধর্ষণ করায় বাবার মানে লেগেছে খুব, মেয়ে তো পরায়া ধন। হাসির সঙ্গে চোখের কোণে জল চিক্ চিক্ করে ওঠে হাসনুর। তবে কিছু একটা ষড়যন্ত্র তো ছিলই। তার মা জানত সবকিছু, না হলে মা তার মামাকে বলবে কেন তাকে কলেজ ছুটির পর মামাবাড়ি নিয়ে যেতে, বলবে কেন গেরামের অবস্থা ভালো না, হাসনু যেন আজ কিছুতেই বাড়ি না ফিরে। মা কেন সেদিন তার চুড়িদার গায়ে দিল, মা তো কোনোদিন জামা পরে না। বরং বিয়েওয়ালা দিদিমণিগুলা চুড়িদার পরে ইস্কুলে আসে দেইখ্যা মা খুক্ খুক্ কইরা হাসত। কিন্তু তার মা কী জানত? আর তা মাকে জানালোই বা কে?

তাদের বাড়িতে পার্টির নেতাদের আসার কামাই নাই। সবাই বলছে তারে নাকি ভোটে দাঁড়াইতে হইব। মায়ের মৃত্যুর বদলা নিতে হইব তারে। যে পার্টি করাকে ঘৃণা করত হাসনুহানা সেই পার্টির কথাতেই রাজি হয়ে গেল সে। মাথার ভেতর তার আগুন জ্বলছে। তার সম্মতিতে হই হই শুরু হয়ে গেল গ্রামে। কিন্তু এত লোকের ভিড়ে অজয়ের আর দেখা নেই। ইস্ কি জোরে সে অত লোকের মধ্যে ধাক্কা মেরেছিল অজয়কে। একবার যেতে হবে অজয়দের বাড়ি, বলতে হবে তখন মাথার ঠিক ছিল না তার। অজয়ের বাড়ির পথে পা বাড়ায় হাসনু।

পথের মাঝখানে অজয়ের সঙ্গে দেখা, হন্তদন্ত হয়ে সে যাচ্ছে কোথায়, বলল, এই যে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

তোর ওহানেই।

BanglaBook.org

কেন?

আমি গ্রাম ছাইড়া চইল্যা যাইতাছি।

আমি ভোটে দাঁড়াইছি বইল্যা?

বলতে পারস। পার্টি করতাম বইল্যা তুই না আমারে ঘৃণা করতিস?

হ্যাঁ করতাম। কিন্তু মায়ের এই ঘটনার পর।

সেই খবরটাই দিতে যাইতেছিলাম তোরে। তোরে একা পাওয়াই তো মুশকিল। তোর তো ঘরেই শত্রু।

মানে?

তোর বাবা তোরে বাইচা দিছিল পার্টির কাছে। প্রধান ওই পার্টির দুজনকে ফিট করছিল তুই যখন কলেজ থ্যাকে ফিরবি তখন বাইরের ছেলেপুলে আইনা তোরে তুইল্যা নিয়া যাইব। কাকার মতিগতি দেহে আমার সন্দেহ জাগে মনে—তক্কে তক্কে থাহি, কাকারে ফলো করি, আড়ি পাইতা শুনি কাকার সঙ্গে প্রধানের সব শলা পরামর্শ। তদের বাড়িতেই তো প্রথম মিটিংটা হইছিল। আমি তোদের চৌকির নীচে লুকায়ে ছিলাম। দরমা ফাঁক কইরা গইলা। তরে টর্চ নিয়া একদিন খুইজা গেল কয়জন লোকে, সব দেখছি। কাকা মোটা টাকা দাঁও মারছে পার্টির কাছে। হাতে পাইছে কিনা জানি না। ওই পার্টিরে লোকে এহন থুতু ছেটাইব। আমাগো পার্টির এহন কত সহজ হইল ভোটে জেতা। তুই মরলে কাকীরে দাঁড় করাইত ভোটে, এহন কাকী মরছে তুই দাঁড়া। আমি আর এর মধ্যে নাই।

কি বলছিস কি তুই অজয়—বলে অজয়ের হাত খামচে ধরে হাসনু। অজয় বলে, আমিই কাকীকে খবর দিছিলাম। প্রধান বলছিল মাইয়া না পাইলে কাকার গলা কাইট্যা ফেলাইব। কাকী তোরে তো বাঁচাইলোই, কাকারেও বাঁচায়ে গেল। আমিই কাকীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমারে মাফ করস।

দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার ওপর বসে পড়ল হাসনু, তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, শুধু কি বাবারে বাঁচায়ে গেল মা, শোধও তুইল্যা গেল হয়ত। রাতের অন্ধকারে প্যাঁচা ডেকে উঠল ক্যাঁ ক্যাঁ করে, অজয় হাত ধরে টেনে তুলল হাসনুকে। হাসনুহানা মাথা গুঁজল অজয়ের বুকে। বলল, আমার খুব ভয় করতিসে রে অজয়। অজয় ফিসফিস করে বলল, চল পলাই। পলাইবি?

BanglaBook.org

# পাহাড় চূড়ায় একা

## সাত্যকি হালদার

যেখান থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হবে সে জায়গাটা অনেকেরই চেনা। উত্তর সিকিমের একটা জনপদ। আগের দিন বিকেলে আমরা সেখানে এসে পৌঁছেছি। গ্যাংটক থেকে জিপে পৌঁছতে প্রায় সাত-আট ঘণ্টা লেগে গেছে।

সিকিমে বেড়াতে আসা ট্যুরিস্টদের অনেকেরই শেষ গন্তব্য এই জায়গাগুলো। গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে কনডাক্টেড ট্যুরে একদিন লাচুং, আরেকদিন লাচেন। লেপচা এবং সিকিমিজদের দুটো পুরানো গ্রাম। সাপ্তাহিক হাট, মনাস্ট্রি-নির্ভর জীবন, প্রাইমারি স্কুল। ১৯৯৫ সালে আমরা চার বন্ধু কলকাতা থেকে নানা ভাবে যখন লাচেন পৌঁছই তখন জায়গা দুটোর কোনোটাই তেমন পরিচিতি পায়নি। জিপ থেকে নেমে শেষদিকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ হেঁটে পৌঁছতে হত লাচেন-এ। এবং আজকের মতো লাচেন তখন হোটেল আর বড়সড় বাড়িতে ছেয়ে যায়নি। লাচেন থেকে যাত্রা শুরু হবে আমাদের। উদ্দেশ্য গ্রিন লেক। সেটা স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারনেটের যুগ নয়। পথ এবং পথ-সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করা কঠিন ব্যাপার। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে পুরানো বইয়ের দোকানে অতি পুরানো একটা বই হাতে এসেছিল একসময়। জেস গোয়ারিং নামে এক সাহেবের লেখা। 'থ্রু দ্য ট্রেলস্ অব হিমালয়'। বেলজিয়াম থেকে এসে গোয়ারিং সাহেব আর তার বান্ধবী উত্তর সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় বছরখানেক ছিলেন। তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিক। তিব্বতের সঙ্গে গ্যাংটক, কালিম্পং এবং সিকিমের ছোট ছোট অনেকগুলো জায়গার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ। গোয়ারিং সাহেব লাচেন থেকে ভেড়া চড়ানো মানুষদের মুখে শুনে তিব্বত যাওয়ার একেবারেই কম জানা একটা পথ বার করতে চেয়েছিলেন। যেটা দিয়ে নাথু লা বা জোলেপ লা ছাড়াও অনেকটা কম ঘুরে লাসা পৌঁছনো যায়। গোয়ারিং সেটা পারেননি। চারদিন পাহাড় জঙ্গল আর সরু পথে হেঁটে তারা শেষপর্যন্ত গ্রিন লেক-এ এসে পৌঁছন। গ্রিন লেক-এর অন্তহীন সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান সাহেব আর তাঁর বান্ধবী। তবে তারা এও বোঝেন সামনের বরফে ঢাকা এবং হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় এমন কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং কাবরু থাকা সত্ত্বেও তাদের ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক কোনো লা বা গিরিপথ নেই। একমাত্র যাওয়া মানে কাঞ্চনজঙ্ঘা টপকে যাওয়া। গোয়ারিং সাহেব কাঞ্চনজঙ্ঘা টপকানোর কথাটা লিখেও সিকিমের বিশ্বাসী মানুষদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। বৌদ্ধ লামাদের বিশ্বাস কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় আদি দেবতাদের বাস। সেখান থেকেই আদি-দেবতা গাছ, পাখি, নদী এবং শেষে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ফলে এভারেস্ট বা কারাকোরামের অভিযান হয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান বলে

BanglaBook.org

কিছু হয় না। এবং পৃথিবীর এক আশ্চর্য এবং একমাত্র গিরিশিখর সেখানে এখনো মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি।

ফলে গোয়ারিং সাহেব লাচেনেই ফিরে আসেন। ছোট্ট পাহাড়ি জায়গাটায় থাকতে শুরু করেন আরো কিছু দিন। সেখানে একটা মিশনারি স্কুলের কথা ভাবেন। কিন্তু সেটা ভাবতে ভাবতেই মৃত্যু হয় তাঁর। পরে সাহেবের বান্ধবী বেলজিয়ামে ফিরে প্রায় দশ বছর পরে সাহেবের ডায়েরিটা প্রকাশ করেন।

বইটা শমীক খুঁজে পেয়েছিল ইউনিভার্সিটির সামনের ফুটপাথে। তারও ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই। পরে পুরানো বইয়ের দোকানে চলে আসে। সে বই থেকে আমাদের লাচেন এবং সবুজ হ্রদের পরিকল্পনা হয়।

আগের দিন বিকেলে লাচেন পৌঁছে আমরা দিন সাতেকের মতো রেশনিং গুছিয়ে ফেলি। তখন ট্রেকিং-বন্ধু এতরকম পোশাক আর শুকনো খাবার আসেনি। সিলড্ জলের বোতল বলে কিছু ছিল না। আমরা ওপরের দিকে আরো কটা গ্রামের খোঁজ পেয়েছিলাম। সেখানেই রাতের থাকা এবং খাবার পাওয়া যাবে। গোয়ারিং সাহেব যেমন লিখে গেছেন। গোটা দশ-বারো বাড়ি নিয়ে যে লাচেন গ্রাম সেখানের লোকেরাও আমাদের তেমনই বলেছিল।

ফলে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এক সকালে আমরা হাঁটতে শুরু করি। দলে চারজন। ফুটপাথে বই খুঁজে পাওয়া শমীক, পাহাড় এবং হিমালয় নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করা দেবল, আমি এবং কোনো কিছু না জানা, শুধুমাত্র উৎসাহে আমাদের সঙ্গে চলে আসা প্রসেন। প্রসেনের কাছে লাচেন, সিমলা, কন্যাকুমারী একই ব্যাপার। এমনকি বকখালিও।

এপ্রিল মাসে সেখানে ঘোর শীতকাল। হিমালয়ের ওসব দিকের নিয়মের মতো মাঝরাত থেকে শুরু হয়ে যায় ঠাণ্ডা হাওয়া, সকালবেলা তা তীব্র রূপ পায়, দুপুরের পর বিকেলে সেটা কমে আসতে থাকে। তেমন ঠাণ্ডা হাওয়া ঠেলেই লাচেন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। শীতের কষ্ট গায়ে লাগেনি, হয়তো গায়ে লাগার বয়সও সেটা নয়, তাছাড়া আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম ওই সকালে আমাদের সামনের তিনদিকে জেগে থাকা আশ্চর্য সব গিরিশিখর দেখে। অন্তহীন সুন্দর বললে খানিকটা হয়তো কম বলা হয়, হঠাৎ করে যে সুন্দরের সামনে দাঁড়ালে কথা বলা যায় না। আমরা কোনো

BanglaBook.org

তাড়াহুড়ো না করে হাঁটছিলাম। প্রথম দিনের গন্তব্য জকথাং, ঘণ্টা ছয়েকের পথ। হাতে যথেষ্ট সময়।

সকাল নটা নাগাদই জঙ্গল শুরু হয়ে গেল চারপাশে। খুবই আদিম ঘন জঙ্গল। আকাশে মাথা তোলা গা-ভর্তি শ্যাওলা নিয়ে দাঁড়ানো বুড়ো-বুড়ো পাইন। তাদের ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো চেহারা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু ও একমাত্র পথ। সে পথে ঘণ্টাখানেক চললে এক-দুজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষ। হাসিমুখ। হয়তো জকথাং থেকে লাচেনে নামছে, কিংবা জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল। আমরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি।

মাঝখানে ছোট্ট নদী এসেছিল একটা। নদী কিংবা পাহাড়ি ঝরনা। পায়ের পাতা ডুবিয়ে চারজনে পার হয়ে গেলাম। দেবল একটা নাম বলল ওটার, সিনজোর চু, লাচেনের পর থেকে এই ঝরনাই নাকি বড় নদীর আকার পেয়েছে। কিছু-না-জানা প্রসেন বলল, এই জঙ্গল শেষ হবে কখন? এতক্ষণ আকাশ না দেখে আমি থাকতে পারি না।

গোয়ারিং সাহেবের বই পড়া শমীক বলল, এই পথের মজাই এটা। পুরানো পাহাড় একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আবার কাল দুপুরের পর আমরা যেখানে পৌঁছব সেখানটা একেবারেই ন্যাড়া, সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

ক্যামেরায় ছবি তুলছিলাম আমি। পথের প্রতিটা বাঁক, গাছেরা, গাছের মাথায় হালকা হয়ে যাওয়া রোদ, সবই নতুন, যেন একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো মিল নেই। ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে কখনো একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম। দেবল বা শমীক তখন থাকছিল আমার পাশে। ওরাও নতুন ছবি দেখাচ্ছিল। কখনো পিছনে ব্যাক-প্যাক নেওয়া সামনের তিন অভিযাত্রী বন্ধুর পেছন থেকে আমি ছবি নিয়ে নিচ্ছিলাম।

দুপুর দুটো নাগাদ রোদ অনেকটাই কম। হঠাৎই কুয়াশা। ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে আমি খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। সামনে তাকালাম যখন ওরা খানিকটা এগিয়ে চলে গেছে। আমি একটু পা চালিয়ে দেখি পথ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমি ওদের নাম ধরে ডাকলাম। সাড়া পেলাম না। সোজাসুজি পথটাই জোকথাংয়ের পথ বলে মনে হল আমার। আবারও জোরে ডাকলাম। এত তাড়াতাড়ি ওরা দূরে চলে গেল!

সেটা মোবাইল ফোনের যুগ নয়। যদিও আজও সেখানে টাওয়ার কাজ

BanglaBook.org

করে কিনা সন্দেহ। আমার কেমন একটা সন্দেহ হল। তাহলে কি ওরা ডান দিক ধরেছে! ওটাই কি জোকথাংয়ের পথ? শমীক ছাড়া তো পথের নিশানা আর কেউ জানে না। ওরা কি একবারও পেছনে তাকিয়ে দেখছে না আমি দলছুট হয়ে গেছি?

এই প্রথম দুপুরের পর গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ে ঘন কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার কেমন একটা ভয় হল। লাচেনে থেকেও দেখেছি বিকেল তিনটে বাজলেই একেবারেই সন্ধে হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। কুয়াশার মধ্যে দু-হাত দূরেও কিছু দেখার উপায় থাকে না। ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তাও বুঝে ওঠা যাবে না। তাহলে? আমি প্রায় দৌড়ে আবার পেছনে ফিরে এলাম। সেই যেখানে রাস্তা দুভাগ হয়ে গেছে। অন্য দিকের সরু পথটার দিক মুখ করে প্রাণপণে ডাকলাম ওদের। প্রসেন...দেবল...শমীক...। আবারও ডাকলাম, বারবার ডাকলাম। কোথাও কোনো সাড়া নেই। এমনকি কোনো শব্দও নেই। যেন ওখানের ধারেকাছেও কখনো কেউ ছিল না। তাহলে কি রাস্তার এই জায়গাটা নয়, অন্য কোনো দুভাগ হওয়া মোড়ে আলাদা হয়ে গেছি আমি!

সকালের দিকে হলে এটার তেমন কিছু মনে হত না আমার। খুঁজে বেড়ানোর অনেকটা সময় পাওয়া যেত। কিন্তু এই অজানা এবং কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ে, সেখানে ধারেকাছেও কোনো বসতির চিহ্ন নেই, সামনে নিশ্ছিদ্র রাত, সেখানে কীভাবে কী করা যাবে। আমার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সামনে নয়, পেছনে নয়। সবই এক এবং একাকার। সেই ঠাণ্ডাতেও কপালের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল আমার। শীতে জমে কিংবা বন্যজন্তুর পেটে পাহাড়ি রাতে মারা পড়ব না তো!

তবু পায়ে পায়ে এগোতে থাকলাম। কোনো একটা সরু পথ ধরে হাঁটলাম। কুয়াশার মধ্যে একেবারেই পা মেপে মেপে চলা। কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছি জানি না। উত্তর দক্ষিণ বোঝার উপায় নেই। পেছনের ব্যাগ থেকে বার করে দু ঢোক জল খেলাম। সঙ্গে শুকনো ও ভাজা চিড়ে বাদাম ছিল। তবু কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হল না। কুয়াশা হাতড়ে হাতড়ে কোনো মতে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

অন্ধের মতো, দিকশূন্যের মতো কতটা হেঁটেছি জানি না, তবে বেশি দূর

BanglaBook.org

যে এগোতে পারিনি তা বুঝছিলাম, সম্বিৎ ফিরল হঠাৎই একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। চোখের কাছে এনে ঘড়ি দেখলাম সাতটা। পিঠ থেকে বের করে সরু গোল টর্চটা আগেই হাতে রেখেছিলাম। কিন্তু সেই কুয়াশায় টর্চের আলো অচল। তবু সেই ধাক্কা খাওয়া গাছের গায়ে টর্চ ঠেকিয়ে বুঝলাম পথের মাঝে মস্ত এবং গা ফাটা ফাটা পাহারাদারের মতো দাঁড়ানো সেই গাছেই পথ শেষ। গাছের পাশে আরো গাছ। সবই গায়ে গা ঘেঁষা। যেন হঠাৎ উদয় হয়ে শাসাচ্ছে আমাকে। হিসহিসে গলায় বলছে, খবরদার!

কিন্তু সেটুকু শুনলেও যেন স্বস্তি হত। সত্যিই যদি কেউ খবরদার বলতেও আসত। শাসানি হলেও যদি একটু মানুষের গলা শুনতাম। কিন্তু তা তো নয়। কোথাও কেউ নেই। গাছে ধাক্কা খেয়ে একটুখানি পাশ কাটিয়ে গেলাম। আবার একটু ফাঁকা জায়গা। অন্ধের মতো আবার একটু হাঁটলাম। তারপর বসে পড়লাম শক্ত পাথরে।

আমার নিয়তি বুঝতে পারছিলাম। অন্ধকার পাহাড়ে একলা হয়ে যাওয়ার নিয়তি। সামনে আরো রাত, আরো গভীর কুয়াশা। ভয় দেখানো দৈত্যের মতো কুয়াশারা যেন উঠে আসছে আমার চারপাশে। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিংবা ঠাণ্ডায় অবশ করে গিলে খেয়ে নেবে। কুয়াশার সঙ্গে বাতাস মেশাতেই সোঁ-সোঁ করে শব্দ হচ্ছিল চারপাশে। গাছের ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আমি আরো এক ঢোঁক জল খেয়ে টান হয়ে পাথরে শুয়ে পড়লাম। অন্ধকারে চোখ বোজা আর খোলা একই ব্যাপার। এরপর যা হবে হোক। পাথরে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। তবে ঘুম যখন ভাঙল তখন আমি অবাক। একেবারেই বদলে গেছে চারপাশ। কুয়াশা নেই। দমবন্ধ হওয়া ভাবটাও আর নেই। যদিও বাতাস বেড়েছে। আর সেই বাতাসের ভেতর প্রায় ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশে প্রায় সম্পূর্ণ একখানা চাঁদ। দূরে দু'এক জায়গায় ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ। আকাশ বলে যেখানে কিছু ছিলই না সেখানে মস্ত এক আকাশ উঠে দাঁড়িয়েছে জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথায়, এমনকি আমার চারপাশেও। এবং আমি অবাক হয়ে দেখি যে পর্যন্ত আমি এসেছি তার পরেই এদিকের পাহাড় শেষ। অতলান্ত খাদ। আমি যেখানে শুয়ে তার হাত দুই-তিন তফাতেই পাহাড় শেষ হয়ে যেন পাতাল শুরু হয়েছে।

BanglaBook.org

কিন্তু হঠাৎই সেই গাঢ় জ্যোৎস্নায় মনে হল চাঁদ না উঠলেই যেন ভালো ছিল। চারদিক না দেখার সঙ্গেই যেন খানিকটা মিলে ছিলাম আমি। কারণ সব পরিষ্কার হতে নতুন আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমায়। সে আতঙ্ক উচ্চতার, সে আতঙ্ক খাদের, এমনকি সে আতঙ্ক আকাশেরও। খাড়া হয়ে দাঁড়ানো মোটা গাছগুলোও যেন চেপে ধরতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে পড়েনি যে তাকে বোঝানো সম্ভবই নয়, নির্জন বিশালত্ব কী বিপুল আতঙ্ক নিয়ে হাজির হতে পারে। বিশালের মধ্যে একা হয়ে পড়া কী প্রচণ্ড চাপের। আকাশ, পাহাড়, খাদ যেন তাদের নানারকম হাঁ-মুখ নিয়ে গ্রাস করতে চাইছে আমাকে...। আমাকে পেড়ে ফেলতে চাইছে।

সকাল হল পাখির ডাকে। সকাল হল গাছের মাথায় সূর্যের আলোয়। তখন সেই পাহাড় আর বনভূমি একেবারেই আলাদা। একেবারে অন্যরকম। যেন তারা কিচ্ছু জানে না। যেন তারা সারারাত ছিল না। সকালবেলা বন্ধুর মতো আমার খোঁজ নিতে এসেছে। কিংবা দেখতে এসেছে আমি বেঁচে আছি কিনা। আর শুধু মাত্র বেঁচে থাকার আনন্দেই আমি পাথরে বসে ব্যাগ থেকে বার করে শুকনো চিঁড়ে খেলাম। বোতলের শেষ জলটুকুও শেষ করে ফেললাম।

সরু পথে হাঁটতে গিয়ে যাদের দেখা পেলাম তাদের ভাষা বুঝিনি, তবে হাসিটুকু চিনেছি। আর জোকথাং শুনে বুঝি তারাও সাতসকালে জোকথাং চলেছে। তাদের পিঠে কাঠ রাখার ঝুড়ি। ঝুড়ির দড়ি মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া।

জোকথাং পৌঁছে তিন জনের দেখা পেলাম। আগের বিকেলে ছাড়াছাড়ি হওয়া তিনজন। সারা রাত ঘুমোয়নি ওরা। আতঙ্কে পায়চারি করেছে। ভেবেছে, এই জীবনে হয়তো দেখা পাবে না আমার।

যা হোক, জোকথাং থেকে আবার আমরা পর দিন সকালে সবুজ হ্রদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

# সাপের মাথায় পরি নাচে

## নীহারুল ইসলাম

স্কুলে এলেই হামিদ ভয় পায়। বিশেষ করে স্কুলের ওই পরিত্যক্ত ঘরটা—যার পেছন দিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল গোরস্থান—মানুষ মরলে যেখানে মরামানুষকে নিয়ে গিয়ে সবাই গোর দেয়, যখনই স্কুলের পেছন

দিকে পরিত্যক্ত ওই ঘরটার দিকে হামিদের চোখ যায়, গোরস্থানের ওপরেও তার দৃষ্টি পড়ে, আর তার বুকের ভেতরে কী যেন শিরশির করে ওঠে, কলজে ঠাণ্ডা মেরে যায়, গলা শুকিয়ে আসে, ভয়ে সে তখন দোস্ত মতিকে জড়িয়ে ধরে।

এই দোস্ত মতিই তাকে একদিন ওই ঘরটার গল্প করেছিল, কত কাল আগে নাকি ওই ঘরের বারান্দায় কোথা থেকে একজন ফকিরবাবা এসে বসেছিল। সেই যে এসে বসেছিল তারপর না নড়ত, না চড়ত। কারও সঙ্গে কোনো কথা বলত না। কারও কিছু শুনত না। কী খেত না খেত তাও কেউ কোনোদিন দেখেনি। অথচ ফকিরবাবা নামে একজন ছিল। অনেকদিন ছিল। লোকে দেখেছিল। একদিন নাকি স্কুল চলাকালীন সেই ফকিরবাবা সবার সামনে ওই ঘরে ঢুকে স্বেচ্ছায় সমাধিস্থ হয়েছিল এই বলে, আমাকে তোরা কেউ বিরক্ত করবি না। এই ঘরই আমার কবর। এই ঘরেই আমি শুয়ে থাকব কেয়ামত পর্যন্ত। বিরক্ত করলে গাঁসুদ্দ সবাই মজা টের পাবি!

সেই থেকে আজ পর্যন্ত একজন ছাড়া আর কেউ ওই ফকিরবাবাকে বিরক্ত করেনি। গাঁসুদ্ধ সবাই নয়, শুধু ওই 'একজন' চরম শাস্তি পেয়েছিল। লোকে দেখেছিল সেই শাস্তি। এমন কী হামিদও দেখেছিল। তারপর থেকে ফকিরবাবা ওই ঘরে দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। আর ওই ঘরটাও এতদিনে গোরস্থানেরই অঙ্গ হয়ে গেছে। ফকিরবাবা আর কারও কোনো ক্ষতি করেনি আজ পর্যন্ত, তবু হামিদ ভয় পায়।

কীসের ভয়—কেমন ভয়, হামিদ তা ব্যক্ত করতে পারে না। তবে বুঝতে পারে ভয়টা সাংঘাতিক! বুকের ভেতর শিরশির করে ওঠা, কলজে ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া, গলা শুকিয়ে আসা—এসব চলতেই থাকে যতক্ষণ সে স্কুলে থাকে। ওই সময়টুকু তাও হয়তো সে স্কুলে থাকতে পারবে না যদি না তার দোস্ত মোতি তার সঙ্গে থাকে!

দোস্ত মোতি তার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়লেও বয়সে বেশ বড়। দেখতেও একেবারে ষণ্ডাগণ্ডা। স্কুলে সবসময় তার সঙ্গেই থাকে। সেই সাহসে তাই তো সে রোজ স্কুলে আসে। যদিও লেখাপড়ায় মন বসাতে পারে না। প্রথমে তার বিশ্বাস হয়নি দোস্ত মোতির বলা ফকিরবাবার সেই গল্প। অবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করছিল। মা বলেছিল, খবরদার

BanglaBook.org

বাপ হামার—ভুল করিও ওই ঘরের দিকে যেস ন্যা খো! যাবি কী, তাকাবি না পর্যন্ত! যে সে মানুষ ছিল না, মানুষটো খাস খোদার পয়গম্বর ছিল। আর পয়গম্বরের বারণ না শুনলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হয়— পুড়তে হয়, তার আগে বেঁচি থেকি মেলা শাস্তি ভোগ করতে হয়।

—কী কী শাস্তি মা?

কী কী শাস্তি মা কি তা ছাই জানে নাকি? তবু ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাকে। সে যে মা!

—চোখের সামনে রাস্তা সাপ হুন যায় বাপ! গাছপালা ভাল্লুক হুন যায়! রাস্তার মানুষজন জিনপরি হুন যায়! বেঁচি থেকি মানুষ স্বস্তি পায় না। ভুল দেখে, ভুল কাম করে। ওই করি একদিন ভয় আর আতঙ্কের ভিতর মানুষের মওত হয়। সেবুলি গোরে যেইও শাস্তি কমে না। সেখানেও আজাব পোহাতে হয় যতদিন না কেয়ামত আসে।

মায়ের কাছে এই গল্প শোনার পর থেকে বাড়ির কান্টার দিকে এঁকেবেঁকে যে পাঁচসড়ক জঙ্গলের দিকে ঢুকে গেছে সেটাকে সে মেঠো-আলাদ সাপ মনে করতে শুরু করে। দিনের বেলা সূর্যের আলোয় দেখলে মনে হয় সাপটার গা থেকে তার হিসহিস শব্দ ফুটে বেরোচ্ছে। আর রাতের অন্ধকারে সে তো মিশে থাকে অন্ধকারেই। তারপর থেকে সবসময় তার ওটাকেই নিয়েই যত ভয়! তাই আর তার পীচসড়কটা দেখা হয় না। বাড়িতে থাকলে সে তার নিজের ঘরেই শুয়ে থাকে। শুধু সড়কটাকে ভাবে। নাকি মেঠো-আলাদ সাপটাকে?

আসল কথা হামিদের কাছে ওই সড়কটা কবে যে সত্যি সত্যি একটা মেঠো-আলাদ সাপে রূপান্তরিত হয়েছে হামিদ তা নিজেও জানে না। একদিন মাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, মা—ওই সাপটা কোন্‌দিকে গেছে?

মা বলেছিল, জঙ্গলের দিকে।

সত্যিই হামিদদের বাড়ির কান্টার দিকে বিশাল একটা জঙ্গল আছে। পেছনের জানালা খুললে হামিদ সেই জঙ্গলটাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। কী ঘন আর কী মিশমিশে কালো ওই জঙ্গলের ভেতরে মেঠো-আলাদ সাপটা মুখ ঢুকিয়ে বসে আছে সেই কবে থেকে। হামিদ আর একদিন তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা মেঠো-আলাদ সাপটা ওই জঙ্গলে মুখ ঢুকিয়ে কী করে?

BanglaBook.org

মা উত্তর করেছিল, দম লেয়।

হামিদ নিজেও দম নেয়। বিশেষ করে শীতের রাতে। কিন্তু সে দম নেয় লেপের তলা থেকে মুখ বের করে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে বলে মা যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লেপ মুড়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে বলে, তার তখন দম বন্ধ হয়ে আসে। সে তখন লেপ থেকে মাথা বের করে দম নেয়। স্বস্তি পায়। শান্তি পায়। তাহলে মেঠো-আলাদ সাপটা ওই ঘন জঙ্গলে মুখ ঢুকিয়ে কীভাবে দম নেয়? সাপটার দম বন্ধ হয়ে আসে না?

হামিদ কিছুই বুঝতে পারে না। মাকে তাই সে আবার জিজ্ঞেস করে, সাপটা দম নেয় কেন মা?

—তুমার মুতোন বাচ্চা ছেলাপিলাকে গিলে খাবে বুলে।

হামিদ মাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। তবে ভয় পায়। সাংঘাতিক ভয়! স্কুলের পরিত্যক্ত ওই ঘরটার চেয়েও বেশি ভয়। যদিও যে রাত্রে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে, সেই রাত্রে মনের ভয়কে উপেক্ষা করে তার সাপটাকে দেখার বড্ড সাধ জাগে। কিন্তু তার মা বলে, খবরদার বেটা! জানালার খিড়কি খুলবি না খো। এখন এই জ্যোৎস্নায় রাতপরিরা সাপের মাথায় নাচতে নামবে।

মায়ের কথা শেষ হয় না, রাতপরিদের পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসে তার কানে। সঙ্গে মাদলের বোল। সেই সঙ্গে কোন্ এক অজানা সুর! ঘরে বসে সব শুনতে পায় হামিদ। মা তখন হয়তো রান্না ঘরে, রাতের খাবারদাবার রাঁধতে ব্যস্ত। আব্বা তো বাড়িতেই থাকে না। চেন্নাই না কেরালায়। রাজমিস্ত্রির কামে! ছ'মাস-ন'মাস অন্তর বাড়ি আসে। আব্বাকে তার মনেও পড়ে না। যদিও সে জানে তার আব্বা বিদ্যাশে থাকে তাকে পড়ানোর জন্য। সেখান থেকে নিয়ম করে মাসে মাসে টাকা পাঠায়। রোজ সকালে যে-দিদিমণি সাইকেল চড়ে তাকে পড়াতে আসে, ওই দিদিমণিকে সঙ্গে করে ইলিমপুর মোড়ে বটগাছতলায় যে ব্যাঙ্কটা আছে, সেখানে যায় তার মা। মাসের এক তারিখ কি দুই তারিখ। ওই ব্যাঙ্কেই তার মায়ের নামে টাকা আসে। সেই টাকা তার মা দিদিমণিকে সঙ্গে করে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনে। সেই সঙ্গে ইলিমপুর মোড়ের গোবিন্দ ঘোষের দোকান থেকে কিনে আনে লাল লাল জিলাপী-সিঙ্গাড়া, নিয়ামতের মনোহারির দোকান থেকে হরেক রকমের খেলনাপাতি, খাইরুলহাজীর 'হাজী বস্ত্রালয়' থেকে

BanglaBook.org

জামাকাপড়। কিন্তু ওসব কোনো কিছুই তার মন থেকে ভয় তাড়াতে পারে না। দিনের বেলা বাড়িতে মেঠো-আলাদ সাপের ভয় আর রাতে রাতপরিদের ভয়। তার ওপর স্কুলের সেই পরিত্যক্ত ঘরটার সাংঘাতিক ভয়টা তো আছেই।

## দুই

এইসব ভয় একদিন হামিদকে অসুস্থ করে তুলল। সত্যি সত্যি হামিদ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এটা অবশ্য সে বুঝতে পারল না। তার মা বুঝতে পারল। সেই কখন থেকে দিদিমণি এসে বসে আছে বারান্দার চৌকিতে, আর ছেলে কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! মা আঙিনা ঝাঁট দিচ্ছিল, হাতের ঝাঁটা ফেলে তক্ষুনি ছুটে গেল ঘরে, এতক্ষুণ ঘুমিন আছি কী করি বেটা? পড়বি না! উঠ-উঠ-উঠ!

ছেলে উঠল বটে! কিন্তু রোজকার মতো মাকে জড়িয়ে ধরল না। কেমন ঘোলাটে চোখ তার! ফ্যাল ফ্যাল চাহনি। মুখে কোনো কথা নেই। ছেলেকে দেখে ভয়ে মায়ের মুখের কথাও হারিয়ে যায়। বুকের ভেতরটা কেমন আঁকুপাঁকু করে। সে অপেক্ষা করতে পারে না, ওই আঁকুপাঁকু বুকেই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, কোনোরকমে বাইরে নিয়ে আসে। বারান্দায় পাতা চৌকিতে বসায়। নিজে একটু ধাতস্থ হয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কী হলছে বেটা? বুল-বুল-বুল কেনি? কী হইল তোর?

দিদিমণি নিজেও ভয় পায়। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে ভাবী? কী হয়েছে হামিদের?

—দ্যাখো তো বহিন! হামার বেটার চোখমুখ কেমুন হুন গেলছে। কুনু কথা বুলছে না?

—দাঁড়ান ভাবী—দাঁড়ান! আমাকে দেখতে দেন।

বলে দিদিমণি ঝটপট উঠে দাঁড়ায়। হামিদের কাছে এগিয়ে যায়। হামিদকে নেড়েচেড়ে দেখে। হ্যাঁ—ভাবী যা বলছে, একেবারে ঠিক বলছে। আর পাঁচদিনের হামিদের মতো নয় আজকের এই হামিদ। তাহলে হঠাৎ করে কী হল ছোঁড়ার? দিদিমণিও কিছু বুঝতে পারে না। তার ভয় বাড়তে থাকে।

শেষপর্যন্ত মা আর দিদিমণি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে হামিদকে সঙ্গে করে যায় গ্রামের ইমাম মৌলবি বরকতসাহেবের কাছে। সব দেখেশুনে ইমামসাহেব বললেন, সব হাওয়াবাতাসের খেল মা! ফাগুন পড়্যাছে।

BanglaBook.org

ফাগুন্যা বাতাস বহিতে শুরু কর্যাছে। খিয়াল আছে কি তুমহাদের। বালবাচ্চার ওপর এই সময়ে নজর রাখতি হয়। তা যকুন তুমরা নজর রাখোনি তখন আর কী করা যাবে? দাঁড়াও হামি দেখছি। বলে ইমামসাহেব দোয়া পড়ে হামিদের মাথায় তিন-ফুঁ দিলেন। পানি পড়ে মাথায়-শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। তেলপড়া দিলেন রাতে শোয়ার আগে শরীরে মাখানোর জন্য। আর নিজ হাতে একটা তাবিজ বেঁধে দিলেন হামিদের কোমরে।

ইমামসাহেব খুব ইমামদার মানুষ। রীতিমতো আমল করেন। তাই তার এইসব টোটকা খোদার আরসে কবুল হয়। আর মানুষের বালামুসিবত দূর হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ একথা জানে। এমনকি অসুস্থ হামিদও জানত। নিজের চোখে কতজনকে ভালো হতে দেখেছে। কিন্তু এখন সেসব কিছুই মনে পড়ছে না তার। হাঁ করে সে তাকিয়ে আছে ইমামসাহেবের ঘরের সামনে যে বড় আমগাছটা আছে, তার একটা ডালের দিকে। যে ডালে বসে আছে একটা শালিখ পাখি। যার শরীরে ফাঁস হয়ে আটকে আছে সাদা রঙের একটা পলিথিনের ক্যারিব্যাগ। ওটার ভেতরে একটা কাগজের খালি ঠোঙাও আছে। নিশ্চয় ওটার ভেতর কিছু খাবার ছিল। যা খেতে গিয়েই শালিখটা ফ্যাসাদে পড়েছে। খাবার শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কাগজের ঠোঙাসহ ক্যারিব্যাগটা তার গলায় ফাঁস হয়ে লটকে আছে। ঠোঁট আর দু'পায়ের নখ দিয়ে সেটাকে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে, পারছে না। আরও জড়িয়ে যাচ্ছে। এরকম টানাটানিতে হয়তো তার জীবনটাই যাবে! হামিদের আশঙ্কা হয়। তাই কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে সে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে ছুটে যায় আমগাছটার দিকে। তরতর করে গাছটার ওপর চড়তে শুরু করে। যে করেই হোক, শালিখটাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কোথায় শালিখ? গাছে উঠে আর তার হদিস পায় না। বদলে তার চোখে পড়ে দূরে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যাওয়া মেঠো-আলাদ সাপটাকে। সাপের পিঠটা মিশমিশে কালো। আর কী ভয়ংকর! যার ওপর জ্যোৎস্না রাতে রাতপরির দল নাচতে নামে!

না, সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না হামিদ। শালিখটার কথা ভুলে যায়। আর অন্তরের ভয়টাকে আবার অন্তরে অনুভব করে। সুড়সুড় করে গাছ থেকে নেমে ছুটে এসে একেবারে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এহেন ঘটনায় মা একেবারে আনন্দে আত্মহারা। ইমামসাহেবের ঝাড়ফুঁকে তার ছেলে তাহলে ভালো হয়ে গেছে। এই তো তার ছেলে! যে

BanglaBook.org

ছেলেকে সে চেনে, জানে। এতক্ষণ কী হয়েছিল কে জানে! ভাগ্যিস ইমামসাহেব ছিলেন।

ছেলেকে বুকে জড়িয়েই ইমামসাহেবের পা ছুঁয়ে শুকরিয়া আদায় করে মা। ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। বলে, তুমাকে আইজ আর ইস্কুল যেতি হবে না বাপ! তুমি ঘুমিন থাকো। তুমার দোস্ত মতি তুমাকে ডাকতে এলি বুলব তুমার শরীর খারাপ। আইজ তুমি ইস্কুল যাবা না। হামি রাঁধাবাড়া করছি। দুপ্পহরে উঠি খাবা একেবারে। বলে মা নিশ্চিন্ত হয়। তারপর সংসারের কাজকামে লেগে পড়ে।

## তিন

হামিদ মায়ের কথামতো ঘুমোনোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। বারবার শালিখপাখিটার কথা মনে পড়ছে। কিছুক্ষণ আগে ইমামসাহেবের ঘরের সামনেকার আমগাছের ডালে যেটাকে দেখেছিল সে! যার গলায় ফাঁস হয়ে আটকে ছিল সাদা রঙের একটা পলিথিনের ক্যারিব্যাগ। যার ভেতরে কাগজের একটা খালি ঠোঙা ছিল। যেটাকে পায়ের নখ দিয়ে গলা থেকে ছাড়ানোর খুব চেষ্টা করছিল! কিন্তু ছাড়াতে পারছিল না!

মা একটা কাঁথা চাপিয়ে দিয়েছিল শরীরের ওপর। হামিদ এতক্ষণে সেটার অস্তিত্ব টের পায়। আর তার হাঁসফাঁস শুরু হয়ে যায়। কাঁথাটাকে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে, পারে না। তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সে তখন দম নেওয়ার জন্যে চিৎকার শুরু করে।

মা রান্নাশালে রান্নায় ব্যস্ত ছিল। ছেলের চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে ছুটে এল ঘরে। দেখল, ছেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্চে। ছেলের শরীরের ওপর কাঁথাটা যেভাবে বিছিয়ে দিয়েছিল, সেভাবেই আছে। তাহলে ছেলের কণ্ঠে অমন করে চিৎকার করল কে? তবে কি সে নিজেই ভুল কিছু শুনল? হবেও বা! আজকাল চারপাশে কত রকমের আওয়াজ! উনুনে ভাত চড়ানো আছে। সেদ্ধ হয়ে এল বোধ হয়। বেশি সেদ্ধ ভাত আবার ছেলে খেতে পছন্দ করে ন। অগত্যা মা আবার রান্নাঘরেই ফিরে গেল।

এর মধ্যে হামিদ শালিখটাকে ভুলে গেছে। তার স্কুলটাকে মনে পড়ছে। বিশেষ করে স্কুলের ওই পরিত্যক্ত ঘরটাকে। যে ঘরে এক ফকিরবাবা স্বেচ্ছায় আত্মসমাধিস্থ হয়েছিল কোন্‌কালে! যেটা এখন সবুজ ঘাসে ঢাকা তাদের

BanglaBook.org

গোরস্থানেরই অঙ্গ। কিন্তু সেই ঘরের দরজার পাল্লা খোলা কেন? কে খুললে ওই দরজার পাল্লা? ফকিরবাবা যে বলেছিল, আমাকে তোরা কেউ বিরক্ত করিস না। এই ঘরই আমার কবর। এই ঘরেই আমি শুয়ে থাকব কেয়ামত পর্যন্ত। বিরক্ত করলে গাঁসুদ্দ সবাই মজা টের পাবি!

এখন কী হবে তাহলে? হামিদ বুঝে উঠতে পারছে না। প্রচণ্ড গরম অনুভব করছে সে। নিজেও তো গ্রামের একজন। ফকিরবাবার মজা তাহলে তাকেও ভুগতে হবে! মজা তো নয় শাস্তি। মতি বলেছিল, গাছের ডালে চড়ে ঝুল্লু খাওয়ার মজা লয়, গলায় দড়ি পরে গাছের ডালে ঝুলার মজা! এক হাত জিভ বেরিয়ে পড়ার মজা! যে মজা টের পেয়েছিল খানুহাজীর পুত জুলুম সেখ। মুনে আছে তোর?

হ্যাঁ, খুব মনে আছে। খানুহাজীর পুত জুলুম সেখ তার সহপাঠী সুর্মা খাতুনকে সঙ্গে করে ঢুকেছিল ওই ঘরে। আর ফকিরবাবা মজা টের পাইয়েছিল। না, সুর্মা খাতুন কিংবা গ্রামের আর কেউ সেই মজা টের পায়নি, মজা টের পেয়েছিল শুধু একা জুলুম সেখ। গাঁসুদ্ধ সবাই দেখেছিল গোরস্থানের ভেতর একটা কতবেল গাছের ডালে গলায় দড়ি পরে ঝুল্লু খেয়েছিল জুলুম। এক হাত জিভ বেরিয়ে পড়েছিল।

না, ওরকম মজা সে টের পেতে চায় না। কোনোকিছু ঘটার আগে ওই ঘরের দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিতে চায়। সেই মতো উঠে যায় সে। কিন্তু ওই ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে দেখে, ঘরের ভেতর থেকে দোস্ত মতি বেরিয়ে আসছে। সে চমকে ওঠে। মতিকে মতি মনে হয় না তার, সেই ফকিরবাবার মায়ারূপ মনে হয়। আর তার মনের ভয় যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়। সে চিৎকার করে ওঠে, কে আছ বাঁচাও আমাকে। ফকিরবাবা আমাকে মজা দেখাইছে!

মা রান্নাবান্না শেষ করে তখন গোসুলখানায়। একেবারে উলঙ্গ। সারাদিনের সব পাপ ধুয়ে সে পাক-পবিত্র হবে। তারপর ছেলেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খাওয়াবে। নিজেও খাবে। কিন্তু ছেলে আবার চিৎকার করছে কেন? কী হল?

মা ছেলে কী বলছে বুঝতে পারছে না। তবে ছেলের চিৎকার শুনে সে নিজে এমন ভয় পেল যে, ভুলে গেল তার শরীরে কোনো কাপড় নেই, ওই অবস্থায় বেরিয়ে এল গোসুলখানা থেকে। তারপর ছুটে গিয়ে ঢুকল ছেলের ঘরে। দেখল ছেলে যেমনকার তেমনি শুয়ে আছে, গভীর ঘুমে। শুধু শরীরে

BanglaBook.org

যে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়েছিল সেটা শরীরের ওপরে নেই। পাশে কুঁকড়িমুকড়ি হয়ে পড়ে আছে। তবে, ছেলের মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তা দেখে অভ্যাসবশত মা নিজের আঁচল দিয়ে ছেলের মুখ পোছাতে গেল। কিন্তু নিজের আঁচলটাই খুঁজে পেল না।

ওদিকে হামিদ ফকিরবাবার মায়ারূপ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতে করতে তার ঘরের জানালার পাল্লা দুটি খুলে ফেলেছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় এখন তার চোখের সামনে মেঠো-আলাদ সাপটা। যার মুখটা এখন আর জঙ্গলের ভেতরে নেই, বাইরের দিকে। একবারে তার জানালার কাছে। খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সাপটা। এমনই জোরে যে জানালায় শক্তপোক্ত শিক না থাকলে সাপটা হয়তো তাকে ঘর থেকে টেনে গিলে ফেলত! এতক্ষণ তার ঠাই হত সাপটার পেটে।

হামিদের খুব ভয় হয়। তবু জানালার ওই শিকগুলির ভরসায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। সাপটাকে দেখে। সাপটার চকচকে কালো পিঠ দেখে। আশ্চর্য—সেই অচেনা সুরটা এসে ধাক্কা মারে তার কানে। সঙ্গে মাদলের বোল। আরও আশ্চর্য—সেই সুর, সেই বোলের সঙ্গে হামিদ দেখে সাপটার মাথায় তার উলঙ্গ মাকে নাচতে।

মা কি তাহলে রাতপরি? বুঝতে পারে না। অগত্যা বাপটাকে মনে করতে চেষ্টা করে হামিদ। না, বাপকে মনে পড়ে না। কত দূরে আছে তার বাপ! চেন্নাই না কেরালায়। তবে শালিখটাকে মনে পড়ছে। ওই তো শালিখটা! গলায় আটকে থাকা সাদা রঙের একটা ক্যারিব্যাগ। যার ভেতরে একটা কাগজের খালি ঠোঙা। কোনো খাবার নেই তাতে। অথচ ওই কাগজের খালি ঠোঙা ভরা সাদা রঙের ক্যারিব্যাগটা কী অদ্ভুত কৌশলে শালিখটার পায়ের নখ এবং ঠোঁটের টানাটানিতে গলায় চেপে বসছে, শালিখটা টের পাচ্ছ না। কিন্তু হামিদ টের পাচ্ছে। তার ভয় হচ্ছে, ভীষণ ভয়! যদিও তার বুকের ভেতরে কোনো কিছু শিরশির করে উঠছে না। কলজে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে আসছে না। তবু কেন যেন সে চিৎকার করতে পারছে না। শুধু ড্যাগ ড্যাগ চোখে তাকিয়ে দেখছে, কাগজের খালি ঠোঙা ভরা সাদা রঙের ক্যারিব্যাগটা শালিখটার গলায় নয়, যেন তার গলাতেই আস্তে আস্তে চেপে বসছে। আর তার দম বন্ধ হয়ে আসছে...

BanglaBook.org

# উৎকণ্ঠা

## শংকরলাল সরকার

মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের শুরুতেই সেবার এমন এক অভিজ্ঞতা হল যে আজ এতদিন পরেও সেকথা ভাবতে বসলেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে রাত্রের মাত্র কয়েক মিনিটের উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত আমার চেতনাকে যেন স্থায়ীভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। ওরকম টেনশন-তাড়িত উদ্বেগজনক ঘাবড়ে যাওয়ার অনুভূতির সাক্ষী আমি আগে আর হইনি।

কাহিনীটা প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। পূজার সময়ে বেড়াতে গেছি মধ্যপ্রদেশ। বাবা-মাও আমাদের সঙ্গী হয়েছেন। ক্লাস ফোরে পড়া নাতিকে আমাদের সঙ্গে একা একা ছাড়তে ঠাকুমা ঠাকুর্দা রাজী নয়। তার উপর মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থানগুলোর আকর্ষণ তো আছেই। মায়ের আবদারেই মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ শুরু করলাম অমরকণ্টক থেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা ঐতিহাসিক গুরুত্বের থেকে বয়স্ক মানুষদের বেশি আগ্রহ থাকে তীর্থস্থানগুলোর প্রতিই। অমরকণ্টকে দুদিন থাকার পর তৃতীয় দিন রওনা দিলাম ভূপালের উদ্দেশ্যে।

অমরকণ্টকের নিকটবর্তী পেন্ড্রারোড স্টেশন থেকে ভূপাল যাবার অমরকণ্টক এক্সপ্রেসের টিকিট আগে থাকতেই কাটা ছিল। রাত পৌনে বারোটার সময় ট্রেন। অমরকণ্টক থেকে পেন্ড্রারোড প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। দূরত্ব খুব বেশি না হলেও পাহাড়ি পথের অনেকটা গিয়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। রাতের অন্ধকারে যাওয়া উচিত নয় ওপথে, তাই অনেকটা সময় হাতে নিয়ে দিনের আলো থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম অমরকণ্টক থেকে।

অমরকণ্টক থেকে বেরিয়ে গাড়িতে কিছুটা এগোতেই সামনে পাহাড়ের বিশাল বিস্তার। দিগন্ত জুড়ে পাহাড় যেন দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আলিঙ্গন করবে বলে। গাড়ি ছুটে চলল দ্রুত বেগে, কখনো কঠিন চড়াই, কখনো-বা খাড়া উৎরাই। মৈকাল পাহাড়ের উপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। পথের ওপাশে অজয়গড় পাহাড়। পেন্ড্রারোড যাবার পথে পার হতে হবে ওই পাহাড়। কালো পিচের রাস্তা বিরাট বড়ো সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে সবুজের বুক চিরে। যাবার পথেই দেখে নিলাম, অমরকণ্টকের দুই উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য জলেশ্বর আর অমরেশ্বর মন্দির। জলেশ্বর মন্দির দেখে গিন্নি বলল, 'এই ছোট মন্দিরটার আবার কী বিশেষত্ব। এরকম ছোট শিবমন্দির তো আমাদের মফঃস্বল শহরেও অন্তত গোটা তিনেক রয়েছে।'

বললাম 'শিবময় ভারতবর্ষ, সর্বত্রই শিব মন্দিরের ছড়াছড়ি।'

পেন্ড্রারোড স্টেশনে পৌঁছে গেলাম বিকাল পাঁচটার মধ্যে। এখনো প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরি ট্রেন আসতে। ছোট স্টেশন। এসির যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম একটা আছে বটে, কিন্তু সেটায় কোনো আলো নেই। বাইরে থেকে সেই

BanglaBook.org

অন্ধকার ঘরটা দেখে তালা খুলিয়ে ভিতরে বসার কোনো তাগিদ অনুভব করলাম না। গিন্নিও আমার কথায় সায় দিল, ওয়েটিং রুমের থেকে বাইরের এই খোলা স্টেশন চত্বর অনেক ভালো। এখানে তবু আলো বাতাস আছে, অন্য অনেক লোকের মধ্যে থাকলে অপেক্ষা করে ক্লান্তি আসবে না। তাছাড়া ওয়েটিং রুমের অবস্থা তো আহামরি কিছু নয়।

পেন্ড্রারোড স্টেশনে বসে দেখতে লাগলাম যাত্রীদের আনাগোনা। তবে যত না প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা এক্সপ্রেস যাচ্ছে মালগাড়ি চলেছে তার থেকে অনেক বেশি। অপেক্ষা করার সময় ঘড়ির কাঁটা যেন চলতেই চায় না। তবে ছেলের দুরন্তপনার কোনো ঘাটতি নেই। ঠাকুমা ঠাকুর্দা সঙ্গে থাকায় সবকিছুতেই অবাধ স্বাধীনতা। ঠাকুর্দার সঙ্গে কতবার যে পুরো প্ল্যাটফর্মটা চক্কর দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আর মাঝে মধ্যে চকোলেট বা চিপস্ দিয়ে মুখ চালাচ্ছে। বাড়িতে থাকলে ওর মা এগুলো ওকে খেতে দেয় না এখানে ঠাকুর্দার আশকারায় দেদার খাচ্ছে। মা একবার চোখ পাকাতেই আমার বাবা বলে উঠলেন, 'থাক থাক ওদেরই তো আনন্দ। তোমরা তো বনে জঙ্গলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে অথবা পূজা দিয়ে যেখান থেকে যতটা পারছ আনন্দ কুড়িয়ে নিচ্ছ। কিন্তু ও কী করবে? ওর তো কোনো খেলার সঙ্গী নেই। বেড়ানো মানে ছোটদের কাছে ট্রেন বাস গাড়িতে চাপা আর ভালো মন্দ খাওয়া। বাড়িতে থাকতে থাকতে প্রাত্যহিকতার গণ্ডির মধ্যে যখন আমাদের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে, তখন মুক্তির স্বাদ পেতেই তো আমরা বেড়াতে বের হই। ওকেও একটু আগল ভাঙতে দাও, স্বাধীনতা দাও। তবেই না বেড়ানোর আনন্দজনক মুহূর্তগুলো ওর মনে চিরস্থায়ী হবে।'

যতবার এক একটা ট্রেন আসছে দাদু নাতি দুজন মিলে ওভারব্রিজটার উপর উঠছে যাতে উপর থেকে ট্রেনগুলোকে ভালোভাবে দেখা যায়। মা একবার বলল, 'অতবার উপর নীচ কোরো না, তোমার হাঁটুর ব্যথাটা আবার বাড়বে।' কিন্তু সেদিকে দাদু বা নাতি কেউই কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না। গিন্নি আমাকে তাড়া দেয়, 'তুমি একটু দেখো, বাবাকে একদম ছুটিয়ে মারছে।'

দেখা মানে আবার কী! ওকে নিয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়ানো। রাতের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য ছেলেকে নিয়ে বের হলাম স্টেশনের বাইরে। স্টেশন ছোট ফলে বাইরে যে বড়ো রেস্টুরেন্ট থাকবে না তা বলাই বাহুল্য।

BanglaBook.org

দুচারটে ছোট ছোট দোকান, চা পান বিড়ি সিগারেটের সঙ্গে আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের জন্য জলের বোতল রেখেছে। রাতের জন্য কিছু খাবার পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলল, কিছুটা দূরে মোড়ের মাথায় একটা ভুজিয়া মিষ্টির দোকান আছে। ওদের দেখানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝেছিলাম বেশ খানিকটা দূরেই হবে। হাতে সময় রয়েছে, তাছাড়া স্টেশনের আশপাশটা দেখাও যাবে। মিনিট দশেক হেঁটে গেলাম ভুজিয়ার দোকানে। দোকান থেকে কিনে আনা গরম কচুরি মিষ্টি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। তবে খাওয়া দাওয়া করে আর স্টেশনে ঘোরাফেরা করে কতক্ষণ আর কাটানো যায়। বুঝতে পারছিলাম অপেক্ষা করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

তার উপর প্ল্যাটফর্মের আলোও খুব কম। স্টেশনের বিদ্যুৎ বাঁচানোর এক অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখলাম। যখন কোনো ট্রেন আসছে তার মিনিট খানেক আগে থেকে প্ল্যাটফর্মের সব আলো জ্বলে উঠছে, আবার ট্রেন চলে গেলেই দুচারটে ছোট ছোট আলো ছাড়া বাকি সব আলো নিভিয়ে দিচ্ছে। বই পড়ব বা কিছু যে লিখব তার কোনো উপায় নেই। ছেলে তো অধৈর্য হয়ে বলে ফেলল, "ট্রেনকে কী সব সময় দেরি করেই আসতে হয়? কখনো কখনো কী সময়ের আগে আসতে পারে না।" এটা তখন আমাদেরও মনের আকাঙ্ক্ষা, ও ছোট তাই মুখে বলছে। নয় দশ বছর বয়সের ওর মতো দুরন্ত ছেলের পক্ষে স্টেশনের এই আলো আঁধারিতে এরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ট্রেনের প্রতীক্ষা করা সত্যই ভীষণ কষ্টকর।

স্টেশনের চারদিকে উঁচু নীচু বিস্তৃত প্রান্তর। আগাছার জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে এক একটা আম কাঁঠালের গাছে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। দূর আকাশের প্রান্তে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে। স্টেশনের পাশেই একটা বিরাট বড়ো তেঁতুল গাছ। আগাছার জঙ্গলে তার বিরাট ছায়া পড়েছে। সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলোআঁধারির এক রহস্যময় খেলা। রাতজাগা একটা পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে। অনেকক্ষণ কোনো ট্রেন নেই ফলে লোকজনের মধ্যে কোনো ব্যস্ততাও নেই। বাবা, মা ছেলে সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। গিন্নি একমনে তাকিয়ে রয়েছে প্ল্যাটফর্মের ওপাশের তেঁতুল গাছটার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিগো, কী দেখছ?'

'তেঁতুল গাছটা দেখেছ, কিরকম একটা গোঙানির মতো শব্দ হচ্ছে না!'

BanglaBook.org

চাঁদের আলো সবটুকু শুষে নিয়ে গাছটা যেন এক দৈত্যর মতো দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালার মধ্যে রাতের বাতাস আটকে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।

ওর কথার উত্তরে বললাম, 'কিরকম মনে হচ্ছে? জানো তো তেঁতুল গাছে ভূতেদের আস্তানা হয়।' ট্যাঁও...ট্যাঁও শব্দ করে একটা প্যাঁচা উড়ে গেল। বেশ বড়ো হুতুম প্যাঁচা। বললাম, 'দেখলে তো প্যাঁচাটা আমার কথাটাকে সমর্থন করল।'

আমার রসিকতায় ও কোনো উত্তর দিল না, নির্জন রাতের এক রহস্যময় সৌন্দর্য ওকে আকৃষ্ট করেছে। মুগ্ধ হয়ে ও তাকিয়ে রইল রাতের প্রকৃতির দিকে।

স্টেশনের মাইকের কর্কশ শব্দে চারপাশের সেই অস্পষ্ট রহস্যময় আলোছায়া যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। তন্দ্রার ঘোর কেটে গিয়ে ধড়মড় করে আমরা সবাই জেগে উঠলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে অবশেষে এক সময় আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত ঘোষণা শোনা গেল, 'দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে অমরকণ্টক এক্সপ্রেস আসছে!'

সকলের মধ্যেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। আমরা বসেছিলাম এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ব্যাগপত্তর নিয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে আসতে হল দু নম্বরে। এই প্ল্যাটফর্মটা আরো বেশি অন্ধকার। ট্রেনের কামরার অবস্থান-নির্দেশক আলোর ব্যবস্থা নেই। কুলিদের জিজ্ঞাসা করে একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। ছেলে বাবার হাত ধরে চলেছিল। মা বারে বারে সতর্ক করে দিচ্ছিল, 'শক্ত করে ওর হাত ধরে থেকো।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'দাদার হাত একদম ছাড়বি না।'

ওঃ! কী ভয়ানক বিপদে পড়েছিলাম, ভাবলে এখনো ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমাদের নির্দিষ্ট কামরা যেখানে থামবার কথা সে জায়গাটা অন্ধকার। ট্রেন ঢুকতেই আমরা দ্রুত এগোতে থাকলাম। প্ল্যাটফর্মের থেকে ট্রেনটা অনেকটা লম্বা। অনেকগুলো কামরাই প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অন্ধকার লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই আমরা ব্যাগপত্তর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগে ছেলে বাবার হাত ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অন্ধকারের জন্য ওকে আর দেখতেই পাচ্ছি না। কোন্ কামরায় যে উঠল?

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট কামরার সামনে পৌঁছে দেখি বগির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আগেরটা দিয়ে উঠে যে ভিতর দিয়ে চলে যাব সে উপায়ও নেই। আমাদের কামরার আগের কামরাটা জেনারেল কামরা। সেটার সঙ্গে এসি স্লিপার কামরার সংযোগকারী কোনো রাস্তা নেই। ওপাশের কামরাটার সঙ্গে যদিও সংযোগকারী পথ আছে কিন্তু সে কামরারও দরজা বন্ধ। পরের কামরাগুলো প্ল্যাটফর্মের বাইরে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। তারপরই খেয়াল হল আরে ছেলেকে দেখছি না! ওকি লাইনে নেমে ওপাশের কামরা দিয়ে ট্রেনের ভিতর উঠে পড়ল? যা দুরন্ত কী করতে পারে আর কী যে পারে না তার কোনো ঠিক ঠিক ঠিকানা নেই!

এদিকে স্টেশনে ট্রেন থামবে মাত্র দু মিনিট। ইতিমধ্যেই ও ট্রেনে উঠে পড়েছে কিনা তা বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে কিংকতর্ব্যবিমূঢ় অবস্থা। এতদিন বাদে লিখতে বসে এই সব ভালো ভালো শব্দ মনে আসছে, কিন্তু তখনকার অবস্থাটা চিন্তা করলে এখনো ভয়ে আমাদের রক্ত জল হয়ে যায়।

কী করা উচিত, ট্রেনে উঠব কী উঠব না? আমরা উঠে পড়লাম, ছেলে উঠল না তাহলে যেমন বিপদ, উলটোটা হলেও কেলেংকারি। ব্যাগপত্তর নিয়ে বেশি ছুটাছুটি করাও সম্ভব নয়। জিনিসপত্র নিয়ে গিন্নি দাঁড়িয়ে রইল আমাদের নির্দিষ্ট কামরার ঠিক আগেরটার দরজার সামনে, যাতে ট্রেন ছেড়ে দিলে চটপট উঠতে পারে। নিজেদের নির্দিষ্ট কামরার ভিতর যেতে না পারলেও, ট্রেনে তো ওঠা যাবে। মা বাবা তো ছেলের নাম ধরে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আমি ছুটলাম লাইন ধরে পরের পরের কামরাতে পৌঁছাবার জন্য। অন্ধকার লাইন তার উপর পিঠে ভারী ব্যাগ। ছেলের নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়লাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম ট্রেনের ভিতর ঢুকে গেলে ছেলে আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাবে না। কিন্তু সেই টেনশনের মুহূর্তে আমার মাথায় আর কিছু আসছিল না। ভীষণ মূল্যবান, নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু হারিয়ে ফেলবার ভয় যে মৃত্যুভয়ের চাইতে কোনো অংশে কম নয় তা টের পাচ্ছিলাম প্রতি মুহূর্তে। হারাবার ভয়ই বোধ হয় মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়। আর ভয় পেলে প্রথমেই মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। কী করা উচিত আর কী যে নয় তা

BanglaBook.org

বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হয়েছিল ট্রেনের গার্ডকে বলি ট্রেন থামাতে। পরক্ষণেই বুঝেছিলাম এই সামান্য সময়ের মধ্যে গার্ডের কামরা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়।

এরই মধ্যে ট্রেন ছাড়বার বাঁশি বাজিয়ে দিল। ট্রেনের সেই হুইসল আমার কানে লাগল যেন তীব্র এক আর্তনাদের মতো। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ট্রেনটা দুলে উঠল। আমি তখনো লাইন দিয়ে ছুটে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে পারিনি। ট্রেনে উঠব কী উঠব না? যা করার এখনই করতে হবে। ছুটে প্ল্যাটফর্মের উপরে যখন গিন্নির কাছে পৌঁছলাম ততক্ষণে ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ড টেনশন সহ্য করতে না পেরে ও তো রীতিমতো কান্নাকাটি শুরু করেছে। মা চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা যে কামরাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে বড়ো বড়ো মালপত্র নিয়ে অনেক ভেন্ডার ওঠানামা করছিল। সাধারণ দেহাতি মানুষদের মধ্যে পোশাকআশাকে একেবারে আলাদা দুজন মহিলাকে কান্নাকাটি করতে দেখে ততক্ষণে সেখানে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। বড়ো বড়ো মাল ট্রেনে উঠতে দেখে মধুলোভী মক্ষিকার মতো দুজন পুলিশেরও উদয় হয়েছে কোথা থেকে। এতক্ষণ ধরে আমাদের চিৎকার চেঁচামেচি ডাকাডাকিতে একজনেরও দেখা পাইনি, অথচ এখন দুজন পুলিশ হাজির। ট্রেন কিন্তু থামেনি। ধীরে ধীরে চলছে।

ভয়ানক বিপদের সামনে মানুষ যেমন অসহায় বোধ করে, তেমনি আবার বেপরোয়াও হয়ে যায় বোধ হয়। সংকটজনক পরিস্থিতি যেমন বৈরাগ্য নিয়ে আসে, অসহায় মানুষ ঈশ্বরের নাম করে রক্ষা পাবার জন্য, তেমনি অনেকে আবার দুঃসাহসীও হয়ে যায়। নাতিকে খুঁজে না পেয়ে বাবার মনে হয় সেরকম অবস্থাই হয়েছিল। আমাদের পাশ থেকে কখন সরে গিয়ে ট্রেনের ভিতর ঢুকে গেছে খেয়াল করিনি। বুঝলাম ঘাঁস শব্দ করে ট্রেনটা দুলতে দুলতে থেমে যেতে। বাবা জেনারেল কামরাটার ভিতর ঢুকে গিয়ে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিয়েছে। ট্রেন থেমে যেতেই রেলওয়ে পুলিশ আর চেকারদের তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। আমাদের নির্দিষ্ট কামরার দরজা ভিতর থেকে খুলে দিল একজন চেকার। কী কারণে যে সেটা এতক্ষণ বন্ধ ছিল তার সদুত্তর কিন্তু পেলাম না।

BanglaBook.org

টেনশন উদ্বেগ উত্তেজনার চরম সীমায় তখন পৌঁছে গেছি। দরজা খোলার পর আমাদের নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করতে পারলাম। বাবা পাগলের মতো নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সবার আগে কামরায় ঢুকে পড়ল। আমরা একটা কামরায় উঠে ছেলের খোঁজ করতে শুরু করলাম। যত সময় যাচ্ছে ততই আমাদের টেনশন বাড়তে লাগল। ট্রেন আর প্ল্যাটফর্ম জুড়ে তখন এক হুলুস্থূল ব্যাপার। স্টেশনের কুলি থেকে ভেন্ডারের সাধারণ যাত্রীরাও খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। রাতের বেলায় ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের ঘুমের দফারফা। নানারকম মন্তব্য, অযাচিত উপদেশ, কিন্তু সেসব কোনো দিকেই তখন কান দেবার মতো আমাদের মনের অবস্থা নয়। এমন সময় একজন চেকার বলল দুটো কামরা পিছনে একটা বাচ্চা ছেলে উঠে পড়েছে। কথাটা আমার কানে যেন দৈববাণীর মতো শোনাল। ওদের নির্দিষ্ট কামরায় উঠতে বলে আমি ছুটে পিছনের কামরাটায় উঠে পড়লাম। দেখি ওদিক থেকে বাধ্য ছেলের মতো ও গুটি গুটি আসছে। ট্রেন চলতে শুরু করার পরও বাবা মাকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কান্নাকাটি করছে। ছেলেকে ট্রেনের ভিতর দেখতে পেয়ে, আমাদের ধড়ে যেন প্রাণ এল। আমার চোখেও তখন জল এসে গেছে। উদ্বেগ মুক্তির আনন্দ। ততক্ষণে ট্রেন আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# ভালোবাসা

মোনালিসা ঘোষ

প্রবাবলি...আই থিঙ্ক...আমি আমাকে ভয় পাই। ইয়েস, ম্যাডাম দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি...আমি...আমি...আই স্কেয়ার অব মাইসেলফ্।

অর্ণা মিত্র সোজা তাকিয়েছিলেন, অরণ্যর দিকে। ড. অরণ্য চৌধুরি। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অর্ণা পাতা ওলটালেন অ্যালবামের।

স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ।

দিল্লিতে এবার ১৫ বছরের স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তারই এক আত্মীয় এবং পড়শির বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে পূর্ব দিল্লির অশোকনগর এলাকা থেকে অপহৃত হয় ওই কিশোরী। তাকে সরোজিনী নগরে নিয়ে এসে তিনজনে মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গণধর্ষণের শিকার এক মহিলা।

মধ্যপ্রদেশে ধর্ষিতা নাবালিকা।

বয়কট ধর্ষিতাকে

শিশুকে ধর্ষণ করে খুন, মাকেই পেটাল পুলিশ—

একের পর এক কাগজের কাটিং কেটে এ্যালবামে সেঁটে তৈরি করা হয়েছে অ্যালবাম। লোকে স্টিকার সংগ্রহ করে। স্ট্যাম্প কালেকশনের হবি এককালে বহুল প্রচলিত ছিল। কয়েন বা টাকা কালেকশনও করে লোকে, নানাবিধ পাখির পালক কালেক্ট করা যেতে পারে। কিওরিও কালেক্ট করে কেউ কেউ। কিন্তু কেবল ধর্ষণের খবরের কালেকশন্??

—এই খবরগুলো আপনার কাছে কি ভয় অরণ্য চৌধুরি?

—ভয়। শুধুমাত্র ভয়। বিভীষিকা বলতে পারেন।

—ভয়! ভয় পাওয়া থেকে আপনি ঠিক কি পান? আনন্দ পান কি? এটাই আমার প্রশ্ন।

অরণ্যকে খুব অসহায় দেখায়।

একটা নিস্তব্ধ ঘরে, একদিকে একটা ডিভান। ডিভানের পাশেই পা তুলে আধশোয়া হবার মতো একটা চেয়ার। তাতে অরণ্যকে বসানো হয়েছে। তার পাশেই আরেকটা চেয়ার যেখানে বসে আছেন অর্ণা মিত্র। একটু দূরে একটা

BanglaBook.org

চেয়ার ও টেবিল। যেখানে জলের বোতল ও দুটো গ্লাস রাখা একটা ট্রে-র ওপর। দরজা দিয়ে ঢুকেই দুটো আলমারি। ঘরটার রঙ সাদা। মেঝে সাদা মার্বেলের। আর ফার্নিচারগুলো সাদায় এবং কালোয়। পর্দাও তাই। সাদা পর্দায় কালো বাঁশ ঝাড়। গোটা ঘরে একমাত্র একটানা এসির আওয়াজ, আর কখনো কখনো এদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

—ভয় শব্দটা আপনার কাছে কি, তার পাঁচটা প্রতিশব্দ বলতে পারবেন? কুইক। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। প্রথমেই যে শব্দটা মনে আসবে, সেইটা বলুন। কাম অন।

—ভয়, অসহায়তা। ইন্‌সিকিওরিটি! সাফারিংস, পরিত্যক্ত। আর মনে আসছে না।

—ভয়টা এত ভীষণ, তার মানে ভয় আপনার কাছে পরিত্যক্ততার অনুভূতি নিয়ে আসে। পরিত্যক্ততা—ক্যান উই সে লোনলিনেস টু।

খুব মৃদু এবং হালছাড়া গলায় অরণ্য বলল, ইয়েস ম্যাডাম, লোনলিনেস টু।

—তাহলে, এই অ্যালবামটা কি? একটু ডেসক্রাইব করবেন প্লিজ।

—ওটা হল তাদের অসহায়তা এবং সাফারিংস এবং তারপর তাদের লোনলিনেসও যা আমার ভয়ের ধরনের সঙ্গে মিলে যায়। ওরা যা আমিও তাই হয়ে যাই।

—আর তার কাটিংগুলো আপনি অ্যালবামে কেটে রাখেন। বস্তুত আপনি ভয় জমান। কি কারণে?

—আই...আই...আমি ঠিক জানি না।

আমি যদি বলি যে, এই প্রত্যেকটা ধর্ষণ ঘটবার আগে আমি ঘুমের মধ্যে এগুলো দেখেছি আর তারপরে খবরের পাতায় হুবহু ঘটনাগুলো বেরিয়েছে, আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

খুব মৃদু গলায় অর্ণা বলল,—করব ডিয়ার। আপনি বলুন।

—কখনো ঠিকই থাকি। আরামে ঘুমোই। কখনো এমনি দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার চল্লিশ বছর বয়স। নাইটমেয়ার আমাকে কোনোদিন শান্তি দেয়নি; ছেড়েও যায়নি।

অর্ণার চোখে সহমর্মিতা ফুটে উঠল। সেই চোখে অর্ণা সোজা তাকিয়েছিল অরণ্যর দিকে। অরণ্যর চোখ, তার চল্লিশ বছরের চোখ জলে

BanglaBook.org

ভরে উঠল। জলে ভরে উঠতেই স্বাভাবিক নিয়মেই সে সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করল, যাতে না তাকে বোকার মতো কাঁদতে হয়।

আর অর্ণা বলল, —অরণ্য, লেট ইট কাম আউট ডিয়ার। লেট দ্য টিয়ারস রোল ডাউন অন ইওর চিক্স। কারণ, এই জায়গাটা সমাজের মধ্যে হলেও সমাজ নয়। এখানে একজন পুরুষকে বলা হয় না, বয়েজ ডোন্ট ক্রাই। আপনার মনের এই ক্ষমতা আছে, আগে থেকে কি ঘটবে, সে সেটা দেখে ফেলে। একে বলে প্রি-মনিশন। এনিওয়ে, লেট সি, আপনি শুধু ধর্ষণের ঘটনাই কেন আগাম টের পান, কেন অন্য কোনো ঘটনা টের পান না। উইল ইউ অ্যালাউ মি টু টেক ইউ টু দ্য হিপনোটিক ট্রান্স। আপনার মনই ট্রান্স স্টেটে থেকে এই অজানা উত্তরগুলো দেবে।

অরণ্য মাথা নাড়ল।

—রিস্ট ওয়াচটা খুলে রাখুন প্লিজ। চশমাটাও। ঘাড়টা এলিয়ে দিন। হাতগুলো লুজ করুন। ফিল ইওরসেল্ফ রিল্যাক্সড্।

অর্ণা বলতে শুরু করল, এক অদ্ভুত মোলায়েম কিন্তু হাস্কি ভয়েসে—

ইওর আইজ আর ক্লোজড,

ইওর ফিজিক্যাল বডি ইউ বিগিনিং টু রিল্যাক্স,

অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল অর্ণা। কিছু কথা ধরতে পারছিল অরণ্য, কিছু নয়। মন দিয়ে শব্দগুলো বুঝতে বুঝতেই কথাটা শেষ হয়ে অন্য কথা এসে পড়ছিল। আর কোনো কথা দ্বিতীয়বার বলা হচ্ছিল না।

—ইওর আইজ আর ক্লোজড্ অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু স্টার্ট ডিপার...ইউ উইল কিপ গোয়িং ডিপার অ্যান্ড ডিপার।

দ্য ডিপার ইউ গো,

দ্য মোর ইউ রিল্যাক্স

অ্যান্ড দ্য মোর ইউ রিল্যাক্স,

দ্য ডিপার ইউ গো।

কথাগুলো তাকেই বলা হচ্ছিল, আর তার মনে হচ্ছিল, কথাগুলো ফলো করা দরকার কিন্তু অরণ্য যতই চেষ্টা করছিল কথাগুলো ফলো করতে, ততই ওর চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। অবশেষে একটা সময় এল, যখন অরণ্যর মনে হল, দুর যা বলছে বলুক, সে হাল ছেড়ে দিল।

BanglaBook.org

হঠাৎ অর্ণা কিছু সংখ্যা কাউন্ট ডাউন করতে শুরু করল, টোয়েন্টি থেকে ক্রমশ ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান অ্যান্ড জিরো। একটা তুড়ি মারার আওয়াজ পেল অরণ্য। কিন্তু আশেপাশের কোথা থেকে আওয়াজটা এল বুঝতে না বুঝতেই, অর্ণা তার আঙুল দিয়ে ভীষণ হালকা একটা স্পর্শ করল, তার দুই ভুরুর মাঝখানে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, ডিপ স্লিপ।

—কি দেখছ অরণ্য? তোমার চোখকে বিশ্বাস করো। আর সবচেয়ে প্রথমে চোখে যে ছবিটা ফুটে উঠছে সেটা বলো।

## দুই

কাল রাতে অরণ্যকে আবার গোঙাতে দেখেছে ইরাবতী। সে তাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিতে পারত। তোলেনি। কারণ, হঠাৎ আপনা থেকেই অরণ্য ঘুম থেকে উঠে জল খেয়ে তাড়াহুড়ো করে তার ডায়েরিতে কিছু লিখে রাখছিল। আর তারপর কোনো কথা না বলেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

অরণ্য ঘুমের মধ্যে প্রায়ই গোঙায়। এবং তাকে জাগিয়ে দিয়ে দেখেছে ইরাবতী, তখন অরণ্যকে ভীষণ ভীতু, কুঁকড়ে থাকা অসহায়তায় ভরা একটা মানুষের মতো দেখতে লাগে। প্রশ্ন কোনো উত্তর দেয় না। বরং বারবার ভূতগ্রস্তের মতো বলতে থাকে, আমার জন্মটা স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক নয়। কিছুই বুঝতে পারে না ইরাবতী। আর কোনো প্রশ্নের উত্তরও দেয় না অরণ্য। অরণ্যর তো থাকার মধ্যে ছিল কেবল মা। সামান্য কয়েকজন আত্মীয়। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। এসবের মধ্যে আবার জন্মের স্বাভাবিক, অস্বাভাবিকের কি আছে, ইরাবতী কখনোই বুঝতে পারত না। আর অরণ্যর মা, তিনি তো ছিলেন, নেহাতই ভালোবাসায় ভরা, ভালো একজন মানুষ। অরণ্য কিছুতেই বাচ্চা চায় না। ইরাবতী জোর করলেও না, কান্নাকাটি করলেও না।

কিন্তু সে অরণ্যকে ভালোবাসে। যখন অরণ্য স্বাভাবিক থাকে, কাজকর্ম করে, তখনো। আর যখন অরণ্য কেমন একটা মারাত্মক হয়ে যায় তখনো। ভীতু অরণ্যকে তার ভালো লাগে না। ইরাবতীর কাছে অরণ্য হবে বন্য। সে চুপিসারে এগিয়ে আসবে বাঘের মতো পা টিপে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়বে পিঠে, আর কামড়ে দেবে ঘাড়ে। চুলের মুঠি ধরে রেখে দাঁত দিয়ে চেপে রক্ত

BanglaBook.org

বার করবে ঠোঁটের। এই কারণে, ইরাবতী কোনো রাতদিনের কাজের লোক রাখে না। আর অরণ্যর মা তো বেশ কয়েক বছর হল মারাই গেছেন।

এসব কারণে ইরাবতী ডার্ক শেডের লিপস্টিক পছন্দ করে। সে কখনোই হালকা কোনো লিপস্টিক কেনে না। আর তার দরকার হয় কনসিলারের। তার জীবনে কনসিলার বস্তুটা মাস্ট! যা দিয়ে আঁচড় বা কালশিটের দাগকে কভার আপ করে। আর তার কাছে মাস্ট হল, আইসভর্তি আইসব্যাগ। যা শরীরে বুলিয়ে বুলিয়ে সে ব্যথা কমায়। আইসব্যাগ ঝুলিয়ে কনসিলার লাগিয়ে সে বেস-মেক আপ করে বা কমপ্যাক্ট লাগিয়ে নেয়। যাতে অসম্ভব ভালোবাসাবাসির নিষ্ঠুরতার ছাপটা অন্যদের চোখে না পড়ে। বিয়ের বারো বছর পরেও যদি এই ধরনের বাড়াবাড়ি রকমের দাগ লোকজন দেখতে পায়, তারা শুধু আশঙ্কিতই হবে না, যথেষ্ট আদেশ উপদেশও দেবে ওপর-পড়া হয়ে। অন্যদের এই গায়ে পড়া ব্যাপারটা ইরাবতীর পছন্দ নয়। সে তার স্বামীর আক্রমণাত্মক ভালোবাসার ধরনকে ভালোবাসে এবং তাই নিয়েই থাকতে চায়।

অরণ্য ভালোবাসার সময়ে বন্য। কিন্তু আসলে সে নেহাতই অতি ভালোমানুষ, চুপচাপ ও শীতকাতুরে ধরনের। সত্যিই যে অরণ্য শীতকাতুরে তা নয়। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম, সে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায় বলে হাতদুটোকে জড়ো করে কাঁধটা গুটিয়ে রাখতে চায় বলে হাতদুটোকে জড়ো করে কাঁধটা গুটিয়ে রাখে। দেখলে মনে হয়, তার বোধ হয় শীত করছে। কিন্তু ঘোর গরমেও সে এরকমই করে। আর এইভাবেই সে রুগীও দেখে।

বিয়ের পর অরণ্যর বন্য কাণ্ডকারখানা দেখে ইরাবতী প্রথমে হতবাক ও তারপর ভয় পেয়েছিল। তারপর অনেক কান্নাকাটি করেছিল এবং বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকিও দিয়েছিল। শেষে হুমকি নয়, সে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলেও গেছিল। অনেকবার সে বলার চেষ্টাও করেছিল তার অবস্থাটা। সে বলতে চেয়েছিল আসল কথা হল এটাই, আপাতভাবে ভদ্র দেখতে একজন মানুষ, তাকে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে ও তারপর তাকে ধর্ষণ করে। এই ড্যাম্ গুড মানুষটা আদতে নাথিং বাট আ ব্লাডি রেপিস্ট।

কিন্তু যতবার বলতে গেছিল, তার অরণ্যর মুখ ভেসে উঠেছিল। নেহাতই একজন অত্যন্ত ভদ্র ডাক্তার এবং ইরাবতী কাঁদলে বা চলে যাবে

BanglaBook.org

বললে, তার মুখে সে অসম্ভব একাকীত্বজনিত ভয় ফুটে উঠত, সেসব মনে পড়ে গেছিল ইরাবতীর। সে ডিভোর্সের কথাও ভেবেছিল। সেটা ভাবাই সার হয়েছিল শুধু। কারণ, এইসব করতে গিয়ে ইরাবতী কেবলমাত্র এটাই আবিষ্কার করে উঠল, যে সব মুশকিলের বড় মুশকিল হল, ইরাবতী আসলে দিনের পর দিন স্বামীর ধর্ষিতা হতে পছন্দ করতে শুরু করেছে।

## তিন

আবার যেদিন অর্ণা মিত্র একটা মোলায়েম গলায় বলতে শুরু করে, গো ডাউন অ্যান্ড ডাউন, ডাউন অ্যান্ড ডাউন, ডাউন অ্যান্ড ডাউন...

অরণ্য একটা লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটা চোরকুঠুরিতে গিয়ে পৌঁছোয়, এবং সেখানে একটা দরজা খুলে বাগানে বেরোনোর বদলে সে একটা হড়হড়ে পিচ্ছিল জায়গায় হড়কে পড়ে যায়। সে বলে, যে সে ধর্ষণ করছে কিন্তু কেন করছে জানে না। কাকে ধর্ষণ করছে জিজ্ঞেস করা হলে সে ইরাবতীর কথা বলে এবং তারপরই বলে আসলে সে ধর্ষণ করছে না, তার মতো দেখতে অন্য কেউ করছে। অর্ণা সেই লোকটার ওপর তাকে ফোকাস করতে বলে, যাকে অরণ্যর মতো দেখতে, কিন্তু অরণ্য নয়। অরণ্য জানায়, লোকটা যদিও সে নয়, কিন্তু তার সঙ্গেই থাকে। সঙ্গে থাকা মানে কি? সে কি অরণ্যর সঙ্গে অরণ্যর বাড়িতে থাকে? অরণ্য উত্তর দেয়, না, সে আমার ভেতরে থাকে! অর্ণা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মেনে নিচ্ছ, সে তোমার অলটার ইগো?

অরণ্য গোঙাতে থাকে।

—হোয়াট হ্যাপেন্‌ড। কি হয়েছে বলো।

—ওকে যেতে বলো।

—ডিয়ার অরণ্য, ওকে তোমার সামনে ডাকো।

অরণ্য ট্রান্সে লোকটাকে সামনে ডাকে।

তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমন করে।

অরণ্য বলতে শুরু করে, কারণ আমার মা সারাক্ষণ এরকম একটা লোকের কথাই ভাবত। আমার মা কোনোদিন আমার বাবা, যার নাম আমার সার্টিফিকেটে লেখা হয়, তার কথা ভাবেনি। সে এর কথা ভেবেছে। আর

BanglaBook.org

আমার জন্মের আগেই আমার বাবা বলে যাকে সমাজ জানে, সে মারা গেছে। অর্ণা সোজা নির্দেশ দেয়, তুমি তোমার মায়ের উম্‌বে যাও।

অনেকক্ষণ সময় নেয় অরণ্য। তার মাথা এপাশ-ওপাশ করে। শেষে সে বলে, পারছি না।

—সব তোমার মনের স্মৃতিতে আছে। তুমি শুধু সেই সময়টায় যাও, যখন তুমি তোমার মায়ের জঠরে ছিলে। ট্রাস্ট ইওর আইস। চোখে কি ভেবে উঠছে অরণ্য?

ক্ষীণ একটা গলা ভেসে আসে।

—আমি খুব আনহ্যাপি।

—তোমার মা কি করছেন?

—আমার জন্য অপেক্ষা করছে উইথ আ ভেরি আনহ্যাপি মাইন্ড।

—কেন? এগিয়ে যাও। দেখো কেন সে আনহ্যাপি।

—সে তার হাজব্যান্ডকে হারিয়েছে সদ্য। (নীরবতা)

(দীর্ঘশ্বাস)

সে মাঝে মাঝে কাঁদছে। সে আমাকে ভালোবাসছে। (নীরবতা)—তুমি কি করছ?

(একটা দীর্ঘ নীরবতা)

—তুমি কি করছ? অরণ্য...অরণ্য, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

—হুঁ...উ—

—অরণ্য, আর ইউ স্লিপিং?

মাথাটা ধীরে খুব ধীরে দুদিকে নড়ে।

মানে—না। আমি ঘুমোচ্ছি না।

—তুমি কি আমাকে বলবে, তুমি কি করছ এখন?

—আ...আ...আ...মি. অনেক জল, পুকুর, আমি খুব আনহ্যাপি। নট সিকিওরড্ অথচ ওখানে কোজিনেস আছে, নারচারিং আছে। আমার মা আমার প্রয়োজনগুলো পূরণ করে। আমি গভীর জলে ডুবে যাচ্ছি, ইট ইজ পিস যখন আমি গেটিং ইনসাইড দ্য ওয়াটার।

—তোমার ভালো লাগছে?

—উ-হুঁ।

BanglaBook.org

—কেন ভালো লাগছে না, অরণ্য?

—আমি ভয় পাচ্ছি।

—কীসের ভয়?

—একটা শিবলিঙ্গ...না, হ্যাঁ, শিবলিঙ্গ।

—তারপর?

—আমার মায়ের ভেতরে আসছে।

—কার সেটা?

—কা...র! আমি জানি না, একটা মুখ, যাকে আমি কখনো দেখিনি।

—লুক অ্যাট হিস আইজ! দেখো চেনো কিনা।

অরণ্যর চোখের তারা ঘুরতে থাকে দুপাশে। অসংখ্য স্মৃতির ফাইলের মধ্যে থেকে যেন একটা ফাইল খুঁজছে সে।

—অরণ্য...অরণ্য।

খুব আলতো করে ডাকে অর্ণা।

—চিনি না। কোনোদিন দেখিনি তাকে। কিন্তু আমার মা কেবল তার কথাই ভেবেছে, যতদিন আমি পেটে ছিলাম।

(ফোঁপানি)

—ডোন্ট হোল্ড। লেট দ্য টিয়ারস্ কাম আউট।

দু-গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে অরণ্যর।

—আমি তোমার হাতটা একটু ছোঁব অরণ্য? জিজ্ঞেস করে অর্ণা।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে অরণ্য...

ভীষণ সাবধানে আলতো করে হাতটা ছোঁয় অর্ণা।

অনেকক্ষণ কাঁদে অরণ্য।

যে লোকটাকে তুমি দেখোনি, কেবল অনুভব করেছ, অরণ্য তাকে ডাকো তোমার সামনে।

নিঃশব্দে অরণ্য তাকে ডাকে।

—বলো, তোমার জন্য আমার আজ এই অবস্থা। তোমার জন্য... চিরকাল দুঃস্বপ্ন দেখে এসেছি আমি। তোমার জন্য! তোমার কি প্রাপ্য হে অজানা পুরুষ...

—ক্ষমা কেবল ক্ষমা।

BanglaBook.org

—তুমি তাহলে তাকে ক্ষমা করছ, অরণ্য যে তোমার মাকে ধর্ষণ করেছিল, আর যার জন্য আজ তুমি?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে অরণ্য।

—সে আমার বাবা। আর তাকে ক্ষমা না করলে, দুঃস্বপ্নের হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

ঠিক এই সময়ে অর্ণা বলে ওঠে,

—ভেইরি গুড। তুমি ক্ষমা করলে একজন ধর্ষককে। তোমার মা তখন সবে তার হাজব্যান্ডকে হারিয়েছে। অরক্ষিত অবস্থায় সে তোমার মাকে ধর্ষণ করেছিল।

—হ্যাঁ। সে বিবেকদংশনে ভুগছে। বয়স হয়েছে তার। সে মুক্তি পাক অপরাধবোধের হাত থেকে। আমিও মুক্তি পাই। আমি মুক্তি চাই। ইরাবতীকে অনেক অত্যাচার করেছি আমি।

বুজে থাকা চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে অরণ্যর।

জিরো, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ...একটা তুড়ির আওয়াজ পায় অরণ্য।

—আইজ ওপেন, ওয়াইড অ্যাওয়ে।

বছর ঘুরে যায়। অনেকদিন কেটে যায় আপনি আপনি। ড. অরণ্য চৌধুরী এখন রেপ ভিকটিমস্‌দের জন্য কাজ করে। অর্ণা চেম্বারে বেল দেয়। আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঢোকে এক মহিলা।

—আপনি?

—ইরাবতী চৌধুরী।

কেস্ হিস্টরি লিখতে থাকে অর্ণা।

—আমার না...আমার না, জানেন আমার হাজব্যান্ড খুব ভালো। খুবই ভালো। প্যাশনেট, কেয়ারিং। কিন্তু আগে ও এমনই ছিল, কিন্তু ও আরও কিছু এক টা ছিল।

—মানে, সেটা...সেটাও আর এখন নেই। যদি আমি ভুল না বলি, ও বোধ হয় বেশ খানিকটা স্যাডিস্ট ছিল। মানে ডিউরিং লাভ মেকিং, ইউ নো। আমায় দিনের পর দিন ধর্ষণ করত ও।

রুমাল বার করে নাক মুছল ইরাবতী।

BanglaBook.org

—আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন? মানে, আমি বলতে চাইছি...এই...আরকি...ওর এই অত্যাচার করে আনন্দ পাওয়াটা...এই স্যাডিস্ট সত্তাটা আই মিন দিনের পর দিন আমাকে ধর্ষণ করাটা আমি পছন্দ করতাম। হ্যাঁ, ইয়েস,...হ্যাঁ, এটাই সত্যি যে, এই ধর্ষিতা হওয়াটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আপনাদের ভাষায় এটাকে কি যেন বলে...উ...ম্যাচোসিস্ট বোধ হয়। আই মিন, আমি বোধ হয় অত্যাচার পেয়ে আনন্দ পাই, একধরণের প্লেজার আরকি? ইউ নো...

ও খুব পালটে গেছে। মানে আমার হাজব্যান্ড অরণ্য একেবারেই বদলে গেছে। ও আর স্যাডিস্ট নেই। ও আর রেপিস্ট নেই। আমি আর সেই প্লেজারটা পাচ্ছি না...আমি বুঝতে পারছি, আমি অসুস্থ...সুস্থ নই আর কি? বোধ হয়। আপনি কি আমাকে হেল্প করবেন প্লিজ...

BanglaBook.org

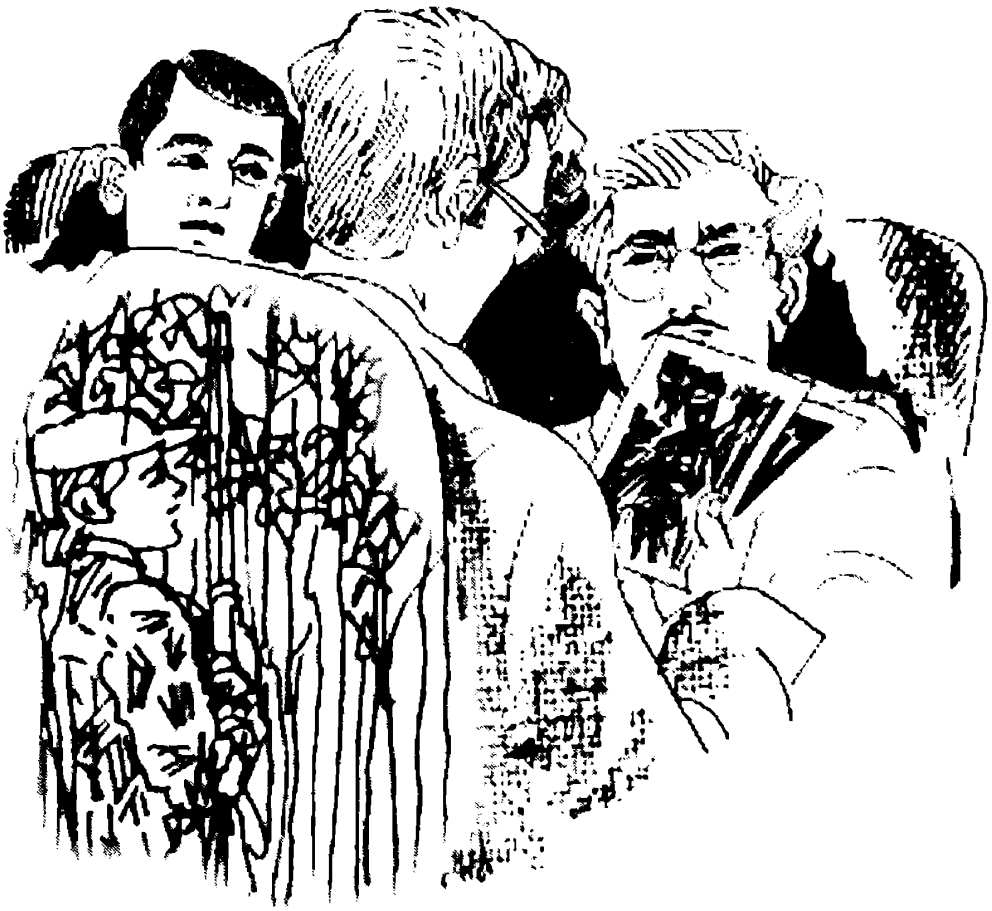

# এনকাউন্টার

## সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

### এক

হঠাৎ দুটো লোককে ওর চেম্বারে ঢুকতে দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠল অয়ন। ও এখানকার প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটার—বাইরের কাউকে ওর অফিসে ঢুকতে গেলে স্লিপ পাঠাতে হয়, অফিসের লোকেরাও না বলে ঢোকার সাহস পায় না। তাছাড়া সকালের এই সময়টায় ও হেড অফিস থেকে আসা মেলগুলো চেক করে। অন্যমনস্ক হলে উত্তরগুলো সব গুলিয়ে যায়—ঠিকমতো লেখা হয় না—অনেক পয়েন্ট বাদ চলে যায়—পরে আফশোশের সীমা থাকে না। তাই এই সময় অয়ন কারোর সঙ্গে দেখা করা পছন্দ করে না।

BanglaBook.org

এটা এখানকার সবাই জানে। তবু ভুল করে কেউ ঢুকে পড়লে অয়ন ভীষণ রেগে ওঠে। আজও উঠল। ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে বিরক্ত মুখেই জিজ্ঞাসা করলো, "ইয়েস?"

এই সময় অফিসটাও প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়ে। সাইট ইঞ্জিনিয়াররা যে যার সাইটে বেড়িয়ে যায়। যে দু-চারজন অফিস স্টাফ থাকে তারাও নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—অন্যদিকে নজর দেবার সময় পায় না। তাছাড়া ওরা যেখানে বসে সেখান থেকে অয়নের চেম্বারটা ঠিকমতো দেখাও যায় না। এই সময় চেম্বারের কাছাকাছি থাকে এক মাত্র বাচ্চু—এই প্রজেক্ট অফিসের পিয়ন। তাকেও নানা কাজে এদিক ওদিক যেতে হয়—এই মুহূর্তে অয়ন যেমন ওকে 'চব্বিশ সেকশনে' পাঠিয়েছে একটা ড্রইং দিয়ে। লোক দুটি মনে হয় এই সুযোগটাই নিয়েছে। এখানে তো অজস্র কনট্রাকটার আছে—তাদেরই কারোর লোক হবে নিশ্চয়—হয়তো কোনো ধান্দা আছে।

লোক দুটি কিন্তু অয়নের বিরক্তিকে কোনো পাত্তাই দিল না। বরং খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে পকেট থেকে দুটো লাল কার্ড বের করে অয়নের সামনে ধরল—ইন্সপেক্টার, আই.বি. ডিপার্টমেন্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

ইন্সপেক্টার, আই.বি. ডিপার্টমেন্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ! কিন্তু ওর কাছে কেন? অয়ন কেমন যেন অবাক হয়ে বোকা বনে গেল। ঠিক কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। কই সাইটে তো সেরকম কোনো গণ্ডগোলের কথা শোনেনি। প্রথমদিকে অবশ্য জমি নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল—সে সময় কিছু মারপিটও হয়েছিল—কিন্তু সে তো অনেক আগেই সব মিটে গেছে—তাহলে নতুন করে আবার কি হল?

"নমস্কার মিস্টার মল্লিক।" লোকদুটির মধ্যে ফরসামতো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "আমি রজত রায় আর ইনি সুমন্ত সিনহা। আমরা আই.বি. ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি। বসতে পারি কি?"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ—সরি সরি—আমার আগেই বলা উচিত ছিল। বসুন বসুন।" অয়ন ততক্ষণে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে—সব কিছুই কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছে। "না—মানে, আই.বি. ডিপার্টমেন্ট—স্পেশাল ব্রাঞ্চ, আমার কাছে? সাইটে কোনো গণ্ডগোল আছে নাকি? কি ব্যাপার বলুন তো?"

"না সে রকম কিছু নয়—এমনি আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—কনফিডেনসিয়াল। কিন্তু এখানে বলা যাবে তো?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন না—নিশ্চয় বলা যাবে। এখন তো অফিস একদমই ফাঁকা—সবাই সাইটে—কেউ আসবে না। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? আগে দাঁড়ান একটু চা দিতে বলি।"

অয়ন খুব চিন্তিত মুখে টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে ফোনে বাচ্চুকে চায়ের কথা বলল।

"আচ্ছা মিস্টার মল্লিক, আপনাদের এটা তো গুজরাটি কোম্পানি?" দুজনের মধ্যে যিনি রজত রায় উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

রজত রায়কে অনেকটা কার্তিক কার্তিক দেখতে—ফরসা লম্বা, বেশ হাসি হাসি মুখ, সরু গোঁফ, চোখে চশমা—চশমার ভেতরে ঝকঝকে দৃষ্টি। এক পলকেই যেন বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখে নেয়। অন্যজন সুমন্ত সিনহাকে কিন্তু দেখতে সে রকম নয়। একটু মোটা বেঁটে কালো—গম্ভীর চেহারা, ভাবলেশহীন মুখ, চোখদুটো কিন্তু অস্বাভাবিক ধরনের স্থির—অনেকটা সাপের মতো। চোখে চোখ পড়লেই সমস্ত শরীর যেন শিরশিরিয়ে ওঠে!

"না আমাদেরটা নয়। এই এম.ই.এল. মানে মজিদপুর ইলেকট্রড লিমিটেড—ফ্যাক্টরিটা যাদের হচ্ছে, ওরা গুজরাটি কোম্পানি। আমেদাবাদে হেড অফিস—মুক্তা ভাই প্যাটেল গ্রুপ। আমাদেরটা তো পীটার্স—পীটার্স কন্সট্রাকশন—এদের প্রজেক্ট পার্টনার। একটা এম.এন.সি.—সিঙ্গাপুরে মেন অফিস। তবে আমরা কলকাতা ব্রাঞ্চের—মানে পীটার্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের আন্ডারে।"

"পীটার্সের থেকে তো আপনিই এখানকার কাজ দেখাশোনা করছেন?"

"হ্যাঁ, তা করছি।" অয়ন কেমন যেন উদ্‌বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, "কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো? এখানে তো অ্যাজ সাচ সে রকম কোনো গণ্ডগোল টণ্ডগোল নেই। অন্তত আমার তো জানা নেই। একটু আধটু লেবার ট্রাবল রয়েছে—সে তো সব জায়গাতেই থাকে।"

তাছাড়া ওসব তো আমরা দেখছিও না—ওগুলো ওদের—এম.ই.এল.-এর ব্যাপার—ওরাই দেখছে। ইন ফ্যাক্ট আমরা ডাইরেক্টলি অর্ডার দেওয়া, টাকা পয়সা—কোনো কিছুই দেখছি না। লেবার, কন্ট্রাক্টর, মেটিরিয়াল অ্যান্ড পেমেন্ট, সবই ওদের। আমরা শুধু প্রজেক্টটা এক্সিকিউশান করছি। আর আমি তো সবই আমাদের ইডি-র অ্যাপ্রুভাল নিয়েই করছি। কিন্তু ব্যাপারটা—মানে প্রবলেমটা কি বলুন তো অফিসার?"

"প্রবলেম কিছুই নয় মিস্টার মল্লিক। এ সবই আমাদের জানা। পুলিশে কাজ করি বলে কি প্রজেক্ট পার্টনারের কাজ কি বুঝবো না—এটা কি আমাদের সম্বন্ধে ঠিক বলা হল?"

"না না—আমি তা বলিনি।" অয়ন কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। "আসলে আমি—মানে—।"

"আপনি পীটার্সে দশ বছর কাজ করছেন মিস্টার মল্লিক।" এতক্ষণে সুমন্ত সিনহা মুখ খুললেন। কেমন যেন কাটা কাটা চিবানো চিবানো উচ্চারণ—বরফের মতো হিমশীতল গলা। "এন.আই.টি. সুরতকল থেকে পাশ করেছেন—মেকানিকাল। দু হাজার তিন-এর ব্যাচ। ক্যাম্পাসিং-এ এই চাকরিটা পেয়েছেন। প্রথম পাঁচ বছর মুম্বাই-এ ছিলেন—তারপর কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। ট্রেনি থেকে স্টার্ট করে এর মধ্যেই সিনিয়ার ম্যানেজার অবধি উঠেছেন, এফিসিয়্যান্ট হিসাবে ম্যানেজমেন্টের কাছে নাম পেয়েছেন—ভবিষ্যতে আরো উঠবেন। এখানকার ইডি মিস্টার রঙ্গনাথন আপনাকে খুব পছন্দ করেন—এফিসিয়ান্ট ছাড়াও এই জন্যেও আপনার মাইনেটাও আর পাঁচজনের চেয়ে অনেকটাই বেশি। তিন বছর আগে বিয়ে করেছেন—নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছেন। আপনার স্ত্রী হায়দ্রাবাদের মেয়ে—নির্মলা রেড্ডি—এখন মল্লিক, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী—ভরতনাট্যম করেন। দু হাজার আটে বসন্ত উৎসবের সময় আপনাদের আলাপ। এগারোতে বিয়ে আর তিন বছর পরে সি ইস নাউ এক্সপেক্টিং—তবে এখনো মাস চারেক দেরি আছে, সম্ভবত আগস্ট মাসের প্রথম দিকেই ডেট, টিল নাউ সি ডাসেন্ট হ্যাব এনি কমপ্লিকেশন—অ্যাম আই রাইট? ও হ্যাঁ—আপনার স্ত্রীর ডাকনাম ইমলি—অ্যান্ড সি ইজ ওয়ার্কিং উইথ এ নার্সারি স্কুল ইন ইয়োর লোকালিটি—ইস ইট ওকে?"

"ইয়েস স্যার।" অয়ন এবারে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। নিজে অফিসের মাথা হয়েও থতমত খেয়ে স্যার শব্দটাই বলে উঠল।

এরা তো দেখছি ওর সম্বন্ধে সব কিছুই জানে! কিন্তু কেন—এত খবর নিয়েছে কেন—কি করেছে ও? কিছুই তো মনে করে উঠতে পারছে না। উদ্‌বেগে চিন্তায় অয়ন কেমন যেন ঘেমে উঠল। বুকের ভেতরটাও ধ্বক ধ্বক করে উঠল। গলাটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। এক অজানা আশঙ্কায় ওর

BanglaBook.org

সমস্ত শরীর যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। ও ভীষণ ভয় পেয়ে থতমত গলাতে বলে উঠল, "তাহলে স্যার—মানে—মানে ঠিক কি— ?"

"কি তাহলে মিস্টার মল্লিক—তাহলে কিছুই না।" সুমন্ত সিনহা আবার চিবানো গলায় বলে উঠলেন, "এত নার্ভাস হবার কি আছে? জল খাবেন—জল? নিন জল নিন।" ততক্ষণে বাচ্চু এসে ওদের জন্যে জল আর চা রেখে গেছে—সঙ্গে এক প্লেট বিস্কুট।

"আচ্ছা মিস্টার মল্লিক আপনারা তো অরিজিনালী ছত্রিশগড়ের মানুষ—তাই না?"

"না স্যার, আমরা অরিজিনালি বাংলাদেশের—মানে পূর্ব- পাকিস্তানের। আমার ঠাকুরদা স্বাধীনতার পর এ দেশে চলে আসেন। তখন সরকার থেকে উদ্‌বাস্তুদের জন্যে দণ্ডকারণ্যে জমি দেওয়া হচ্ছিল। ঠাকুরদা সেই সময়ে ময়ূরতলায় জমি পেয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। পরে আশি সালে আমার বাবা কলকাতায় চাকরি নিয়ে চলে আসেন। সেই থেকেই আমরা কলকাতায়। আমার জন্মও কলকাতাতে। তবে আমার জ্যাঠামশাই এবং ফ্যামিলিরা অবশ্য এখনো ময়ূরতলাতেই থাকেন।"

"ময়ূরতলাতে আপনার যাতায়াত আছে?"

"খুব একটা নাই—তবে গত বছর নভেম্বরে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ময়ূরতলাতে গিয়েছিলাম। ওখানে জগদ্ধাত্রী পুজো খুব জমজমাট—অনেকটা চন্দননগরের মতো।"

"ময়ূরতলাতে এখন আপনার কে কে থাকেন?"

"ময়ূরতলাতে?" অয়ন কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। এত ময়ূরতলার কথা আসছে কেন? সেরকমভাবে বলতে গেলে ময়ূরতলার সঙ্গে এখন তো ওর কোন সম্পর্কই নেই—আগেও খুব একটা ছিল না, তখন শুধু মাঝে মাঝে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে যেত।

"জ্যাঠামশাই তো মারা গিয়েছেন। তবে জ্যাঠাইমা আছেন। আমার দুই জেঠতুতো ভাই তমাল আর অর্জুন থাকে। আমাদের দাদা মানে জ্যাঠামশাই-এর বড় ছেলে—বিজন মল্লিক মুম্বাইতে থাকেন—হাইকোর্টে চাকরি করেন। আর বিনি তো রায়পুরে থাকে।"

"বিনি কে?"

BanglaBook.org

"বিনি আমাদের বোন—একমাত্র বোন—জ্যাঠামশাই-এর মেয়ে—প্রথম পক্ষের মেয়ে—অতসী মল্লিক—আমার চেয়ে মাস তিনেকের ছোট। ও রায়পুরে থাকে।"

"ও, আপনার জ্যাঠামশাই-এর বুঝি দুই বিয়ে?"

"হ্যাঁ, বিজনদা আর বিনি প্রথম পক্ষের। উনি মারা যাবার পর জ্যাঠামশাই এই জ্যাঠাইমাকে বিয়ে করেন। আমি অবশ্য বিনির মাকে দেখিনি। জ্যাঠাইমা বলতে এনাকেই বুঝি।"

"কিন্তু আপনার বোন তো এম.বি.এ.?"

"হ্যাঁ—একটা প্রাইভেট ম্যানেজমেন্ট কলেজ থেকে পাশআউট—দুহাজার দুই সালের। গ্রাজুয়েশন স্কটিশ থেকে। ওর জন্ম-কর্ম-পড়াশুনো সবই অবশ্য কলকাতাতে—আমাদের বাড়ি থেকে।"

"তবে—রায়পুরে কেন?" এবারে সুমন্ত সিনহা নয় রজত রায় প্রশ্ন করে উঠলেন, "এখানে বুঝি চাকরি পাননি?"

"না, তা ঠিক নয়। আসলে বিনির সঙ্গে যার বিয়ে হয়—কমল। —কমল রায়পুরেরই ছেলে—জ্যাঠামশাই-এর ঠিককরা বিয়ে। ওদের রায়পুর বাজারে অনেকগুলো দোকান আছে। খুবই অবস্থাপন্ন ঘর—তবে পড়াশুনো একদমই বেশি না। বাবা জ্যাঠামশাইকে বার বার বারণ করেছিল। জ্যাঠামশাই তাতে কানই দেননি।

—বিনিও প্রথমটা রাজী হয়নি—কিন্তু পরে কি হল কে জানে, হঠাৎই রাজী হয়ে গেল। তবে ও বিয়ে অবশ্য টেকেনি—কমলদের বাড়ির কারোর সঙ্গেই ওর বনিবনা হয়নি—পরে তো ডিভোর্সই হয়ে যায়।

এরপরেই বিনি একটা চাকরিতে ঢোকে—রায়পুরে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। এখন শুনেছি ওটা ছেড়ে দিয়েছে—ওখানেই কি একটা এনজিও করে—আদিবাসীদের নিয়ে। তবে আমিও খুব একটা জানি না—অনেক দিন যোগাযোগ নেই। কিন্তু এসব কথা আসছে কেন স্যার?"

"কেন আসছে আপনি জানেন না?" সুমন্ত সিনহা যেন ব্যঙ্গ করে উঠলেন। "আর বিনির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ নেই—এসব কথা কাকে শোনাচ্ছেন মিস্টার মল্লিক—আমরা কি একদমই বোকা না গাধা?"

"কি আশ্চর্য—আমি কি তাই বলেছি!" অয়ন এবারে যেন একটু রেগে

BanglaBook.org

উঠল। "আপনারা তখন থেকে যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন—আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করছেন না—আমার আপনাদের মিথ্যে কথা বলে লাভ?"

'লাভ কি লোকসান তা আপনিই জানেন—তবে বিনি মল্লিকের সব খবরই আপনি রাখেন। আপনার সঙ্গে ওর রীতিমতো যোগাযোগ রয়েছে—আমাদের কাছে এ খবর আছে।"

"দেখুন ইন্সপেক্টার!" অয়ন ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। নাঃ, রাগ করে কোন লাভ নেই—মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। "বিনির সঙ্গে আমার অনেকদিন যোগাযোগ নেই। আমি জানিও না ও এখন কি করছে। এবারে বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ব্যাপার। কিন্তু আমি কি একটা কথা জানতে পারি—আপনারা বিনিকে খুঁজছেন কেন—কেন, কি করেছে কি ও? আর তেমন কিছু জানার থাকলে আপনারা তো বিনিকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারেন—মাঝখান থেকে আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?"

"আমরা জড়াচ্ছি না তো—আপনি নিজেই জড়াচ্ছেন। আপনি কি করে জানলেন আমরা বিনিকে খুঁজছি? কই আমরা তো আপনাকে এমন কথা বলিনি। হ্যাঁ খুঁজছি—এখন বলুন তো, আপনার বোন কোথায়? আমরা একবার দেখা করতে চাই।"

"যাঃ ব্বাবা, আপনারা কোন্ কথার কি মানে করেন তার ঠিক নেই। বললাম তো আমার সঙ্গে বিনির অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—মাসখানেক আগে একবার ফোন করেছিল—বলেছিল কলকাতায় আসবে—আমাদের ওখানে উঠবে। কিন্তু পরে আর আসেওনি—যোগাযোগও করেনি। তবে আমি ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম—যে নম্বর থেকে ফোন করেছিল সেই নম্বরে ফোন করেছিলাম—কিন্তু ওকে পাইনি। ও দিক থেকে একজন বয়স্কমতো লোক বলেছিল যে ওখানে বিনি বলে কেউ থাকে না—ওটা একটা পিসিও।"

"ও তাই, বয়স্কমতো লোক, চেনেন বুঝি তাকে? কি নাম বলুন তো—আর নম্বরটাও একটু দিন তো?"

"না চিনি না—গলা শুনে মনে হয়েছিল তাই বলেছি। আর নম্বরটাও দিতে পারবো না, ওটা আমি সেভ করিনি—করার কথা মনেও আসেনি।"

এবারে আর সুমন্ত সিনহা কিছু বললেন না, এবারে বললেন রজত রায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা মিস্টার মল্লিক এই দুটো ফোনের মধ্যে কত

BanglaBook.org

দিনের গ্যাপ—মানে আপনার বোনের কাছ থেকে ফোন পাওয়ার কত দিন পরে ওনাকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন?”

অয়ন এবারে যেন একটু চিন্তায় পড়ে গেল। ভেবে নিয়ে বলল, “তা দিন কুড়ি পঁচিশ তো হবেই—তার চেয়ে বেশিও হতে পারে, আমার ঠিক অতটা খেয়াল নেই।”

“খেয়াল নেই না? অথচ যে নম্বরটা আপনি সেভ করেননি কুড়ি পঁচিশ দিন পরেও সেই নম্বরটা ঠিক মনে করে ফোনটা করে নিলেন—বাঃ, আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভালো!

নাকি নম্বরটা আপনার মোবাইলের কললিস্টে থেকে গিয়েছিল? আপনার মোবাইলে কতদিনের কললিস্ট থাকে মিস্টার মল্লিক? আসলে বলুন না—নম্বরটা আপনি স্টোর করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেবেন না। হয়তো কোথাও লিখে রেখেছেন নয়তো বা অন্য কোনো নামে সেভ করে রেখেছেন—কিংবা মুখস্থ করে ফেলেছেন। কি মিস্টার মল্লিক—তাই না?

যাক গে, বাদ দিন, ও নম্বরটা আমাদের আর দরকার নেই, আমরা ওটা পেয়ে গেছি। কিন্তু দেখুন তো এদের মধ্যে কাউকে আপনি চেনেন কিনা?”

রজত রায় এবারে পকেট থেকে কতকগুলো পোস্টকার্ড সাইজের ছবি বার করে অয়নের হাতে ধরিয়ে দিলেন। সবই যেন জঙ্গলে ঘেরা কিছু মানুষের ছবি—অয়ন এদের কি করে চিনবে? কিন্তু না, সবকটা ছবি দেখতে হল না—সাত নম্বর ছবিটাতে চোখ পড়তেই ও ভীষণ চমকে উঠল, বুকের ভেতরটাও একবার ধ্বক করে উঠল, ওর জিবটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মাথায় ক্যাপ, পরনে জংলা পোশাক—হাতে রাইফেল—জঙ্গলের অস্পষ্ট আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে বিনিই!

## দুই

কথাটা কিন্তু খুব একটা ভুল বলেনি অয়ন—বাবা মারা যাবার পরে ময়ূরতলার সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগই নেই, তবে আগে ছিল। তখন মাঝে মাঝেই ওরা ময়ূরতলাতে যেত, আর পুজোর সময় গিয়ে দিন সাতেক থাকত। তবে এই পুজো মানে কিন্তু দুর্গাপুজো নয়—জগদ্ধাত্রী পুজো। এখানে দুর্গাপুজোর চেয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর চলটাই বেশি।

BanglaBook.org

ময়ূরতলা খুবই পুরানো জায়গা—মুঘল আমলের ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে। এটা নাকি দারাশিকোর জায়গিরের মধ্যে ছিল। তখন এখানে ময়ূর লড়াই-এর আসর বসতো। সেই থেকেই জায়গাটার নাম ময়ূরতলা।

স্বাধীনতার পরে ওপার বাংলার লোকজনেরা এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। তারপরেই এখানে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু। এখন তো এ পুজো আস্তে আস্তে সব ধরনের মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে গিয়েছে। এখানে এখন প্রায় তিরিশ পঁয়তিরিশটা পুজো হয়। সবকটাই খুব ধুমধাম করেই হয়। দুর্গাপুজোর মতোই সপ্তমী অষ্টমী নবমী—আর দশমীতে ভাসান—সব মিলিয়ে এ এক জমজমাট ব্যাপার।

ছেলেবেলায় বিনি কিন্তু ময়ূরতলায় আসতে একদমই পছন্দ করতো না, বলতো জংলী জায়গা। আসলে জন্ম থেকেই ও কলকাতাতে মানুষ। কলকাতা মেডিকেল কলেজেই ওর জন্ম। সে সময় নাকি ওর মায়ের নানারকম কমপ্লিকেশন দেখা দিয়েছিল—ময়ূরতলাতে তখন চিকিৎসার খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল না—ওনাকে তাই কলকাতায় আনা হয়। তবে হাজার চেষ্টা করেও ডাক্তাররা ওনাকে বাঁচাতে পারেনি। কি সব পেপটিক টেপটিক হয়ে গিয়েছিল। ডেলিভারির মাত্র পনেরো দিন পরই উনি মারা যান।

তখন অয়নও সবে হয়েছে—মাত্র তিন মাস আগে। তাই উপায়হীনভাবে অয়নের জ্য. বিনিকে তখন অয়নের মায়ের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই দু জনে একসঙ্গে মানুষ। অনেকদিন পর্যন্ত অয়ন এই ব্যাপারটা জানতোই না। বিনিও জানতো না—অয়নের বাবা মাকেই 'মা বাবা' বলে ডাকত। পরে যখন ওর বাবা আবার বিয়ে করেন তখনই জানতে পারে—ও তখন প্রায় বছর দশেকের!

বিনিটা চিরটাকালই একটু অন্য টাইপের। এমনিতে বেশ হাসিখুশি সরল স্বভাবের, তবে মাঝে মাঝে কি যে হত কে জানে—কেমন যেন গম্ভীর আর চুপ চাপ হয়ে যেত—তখন কি যেন ভাবত। আর এই সময় যদি কেউ ওকে বিরক্ত করত তাহলে ভয়ঙ্কর রেগে যেত, তখন ওকে সামলানোই মুশকিল হত। একবার তো একটা ছেলেকে কাটারি নিয়ে মারতে তাড়া করেছিল—ছেলেটা নাকি ওকে গম্ভীর দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছিল!

তবে অয়নের ওপর ও কখনো রাগ করতো না। ওদের সম্পর্কটাও ছিল

BanglaBook.org

অন্য রকমের—শুধুমাত্র ভাই বোনের মতো নয়—অনেকটা বন্ধুর মতো। দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতো—আর খুব বিশ্বাস করতো, আবার সুযোগ পেলেই একজন অন্যজনের ওপর গার্জেনগিরিও করতে ছাড়তো না!

একবার তো সরস্বতী পুজোর দিন অয়নকে বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট খেতে দেখে বিনি প্রায় খেপে গিয়েছিল। রেগে উঠে কেঁদে কেটে একেবারে হাট বসিয়ে দিয়েছিল। বাড়িতে কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি—এমন কি অয়নও না। তারপর অনেক কষ্টে বুঝতে পেরে অয়ন কান টান মুলে ওকে শান্ত করে ছিল।

তবে যা করত—করত, পড়াশুনোতে কিন্তু দারুণ ভালো ছিল। হায়ার সেকেন্ডারিতে খুবই ভালো রেজাল্ট করেছিল—স্কটিশে ভর্তি হয়েছিল—পরে এম.বি.এ. একটা প্রাইভেট কলেজ থেকে।

এই সময়েই হঠাৎই অয়নের মা মারা যান। অয়ন তখন সুরতকলে। খবর পেয়ে এল। এসে বিনিকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল! বিনি যেন ততদিনে অনেকটাই পাল্টে গেছে, পড়াশুনোও একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে, জিজ্ঞাসা করলেই কেমন যেন কর্কশ মেজাজে উদ্ধতভাবে উত্তর দিচ্ছে!

এরই মধ্যে একদিন সামান্য কারণে অয়নের সামনেই ওর বাবার সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করল, তারপর রেগেমেগে ময়ূরতলা চলে গেল! কিছুদিন পরে আবার ফিরে এল। শেষে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার পাট গুটিয়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে ময়ূরতলাতেই ফিরে গেল!

অয়নের বাবা এতে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, শুধু দুঃখ বললে বোধহয় ভুল বলা হয়, কেমন যেন ভেঙে পড়েছিলেন, মনে মনে বড্ড একা হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিচ্ছু বলেননি। তবে বিনির বিয়ে ঠিক হওয়ার খবরে আর স্থির থাকতে পারেননি, ময়ূরতলায় ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু পাত্র- পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ওনার একদমই ভালো লাগেনি, বরং অপছন্দই হয়েছিল। কিন্তু কেউই ওনার কথা শোনেনি—এমন কি বিনিও না, উল্টে কেমন যেন একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে অপমান করেছিল। এরপরে কলকাতা ফিরে উনি আর কখনো ময়ূরতলায় যাননি। কিন্তু ঘটনাটা দু-বাড়ির সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটল ধরিয়েছিল—যে ফাটল আর কখনোই জোড়া লাগেনি।

BanglaBook.org

অয়নের বাবা আজ আর নেই—তিন বছর আগেই গত হয়েছেন। অয়ন এখন নিজের কাজকর্ম নিয়ে খুবই ব্যস্ত, নির্মলাও তাই। ময়ূরতলার চ্যাপ্টারটা স্বাভাবিকভাবেই আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এসেছে, অয়ন সব কিছু ভুলতে বসেছে।

ভুলেই হয়তো যেত, কিন্তু বছরখানেক আগে বিনি হঠাৎই আবার যোগাযোগ করেছে—বেশ কয়েকবার অয়নদের ফ্ল্যাটে এসে থেকেও গেছে। নির্মলাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে—নির্মলারও হয়েছে, ও তো দিদিভাইতে যেন একেবারে মোহিত হয়ে গেছে!

অয়নও তাই গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় নির্মলাকে নিয়ে ময়ূরতলা ঘুরে এসেছে। কিন্তু ওদের একদমই ভালো লাগেনি—সব কিছুকেই বড্ড মেকি আর আড়ষ্ট বলে মনে হয়েছে! তাছাড়া বিনির সঙ্গেও দেখা হয়নি—ও রায়পুরেই থেকে গেছে—অয়নরা আসবে জেনেও ময়ূরতলাতে আসেনি!

## তিন

"আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বল তো—সারাক্ষণই অন্যমনস্ক! রাতেও দেখি ভালো করে ঘুমোও না—মাঝে মাঝেই চমকে ওঠ! কেন, কি হয়েছে কি—অফিসে কোনো গণ্ডগোল?" নির্মলা বলে উঠল।

ও তখন গালে ক্রিম লাগাচ্ছিল। শুতে যাবার আগে এটা ও প্রতিদিনই করে। কাল আবার একটু সকাল সকাল উঠতে হবে—সেবায়নে ব্লাড দিতে যাবে। রিপোর্ট নিয়ে পরশু ড. ঘোষের কাছে যাবার কথা আছে। এমনিতে কোনো প্রবলেম নেই ঠিকই কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন শরীরটা ভারী হয়ে উঠছে। একটুতেই কেমন যেন হাঁসফাঁস করে, কোনো কাজ করতেই ইচ্ছে করে না। বাইরে বেরোতেই অস্বস্তি করে—বিশেষ করে স্কুলের বাচ্চাগুলোর সামনে, ওরা এমন সব প্রশ্ন করে তার ঠিক নেই। এই তো সেদিন লোয়ার কেজির একটা মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলল, "মিস, তুমি কি মায়ের সব কথা শোনো?"

নির্মলা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি। বলল, "হ্যাঁ শুনি—কিন্তু কেন বল তো? মায়ের কথা তো শুনতেই হয়, কেন তুমি শোনো না?"

মেয়েটা ওর কথার কোনো উত্তরই দিল না, উল্টে যেন গম্ভীর হয়ে

BanglaBook.org

উঠল, ঠিক যেন একটা পাকা বুড়ি! তারপর বলল, "হুঁ, ব্যাপারটা তাহলে ঠিকই ধরেছি। তোমার শরীর তাই এত ভালো হয়ে গেছে, আগে তো খুবই রোগা ছিলে, এখন কত মোটা হয়ে গেছ! মা বলে—মায়ের কথা শুনলে নাকি শরীর ভালো হয়। আমিও মায়ের কথা শুনব—তাহলে আমিও তোমার মতো মোটা হয়ে যাব।"

শুনে নির্মলার তো লজ্জায় ধরণী দ্বিধা হও-এর মতো অবস্থা আর টিফিনের সময় স্টাফরুমে বলামাত্র ওখানে প্রায় দমফাটা অবস্থা। কথাটা শুনে কোনো ভাবান্তর দেখায়নি শুধু অয়ন—অন্যমনস্ক হয়ে কতকটা দায়সারাভাবে "হুঁ" বলে প্রসঙ্গটা ওইখানেই শেষ করে দিয়েছিল!

আজও তাই করল। নির্মলার কথার কোনো জবাব দিল না, বইটা যেমন পড়ছিল তেমনি পড়তেই থাকল। ইদানিং ও রাজশেখর বসুর মহাভারত পড়ছে। যখন পড়ে তখন খুব মন দিয়ে পড়ে—একটাও কথা বলে না, খাতাতেও কি সব নোট-টোট করে।

তবে আজ যেন একটু অন্যরকম হল, তখনি তখনি জবাব দিল না ঠিকই কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎই বইটা বন্ধ করে দিল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বল তো একটা খুনের শাস্তি কি?"

"তার মানে?" নির্মলা বলে উঠল। বলল, "ফাঁসি।"

"তাহলে দুটো খুনের—দুবার ফাঁসি?"

"ভ্যাট, তাই আবার হয় নাকি—তুমি যে আজকাল কি সব বলো না, তার কোনো মানেই বুঝি না!"

"বোঝ না—না বুঝতে চাও না? আচ্ছা, এক টাকা চুরি করাও তো চুরি, আবার এক কোটি টাকা চুরি করাও চুরি। তাহলে দুটো চুরির দু রকম শাস্তি কেন? চুরি ব্যাপারটাই যদি অন্যায় হয় তাহলে তো সে অন্যায়ের একইরকম শাস্তি হওয়া উচিত—তাই না? তাহলে কি শাস্তির ম্যাগনিচুড চুরির ম্যাগনিচুডের ওপর নির্ভর করছে? কে জানে তাই হয়তো হবে। নইলে যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন—দুজনেই তো মিথ্যাবাদী, অথচ একজন পড়ে রইল উরু ভেঙে, আর অন্যজন রাজা হল মজা করে—বাঃ, এ তো আচ্ছা নিয়ম!"

"যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির আবার মিথ্যা বলল কখন?"

"মিথ্যা বলল না—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ! এটা মিথ্যা কথা নয়? এই

BanglaBook.org

মিথ্যা কথাটা যদি না বলত তাহলে যুদ্ধের কি পরিণতি হত কে জানে—হয়তো পাণ্ডবরা হেরেই যেত! কৃষ্ণই তো বলেছিলেন—বলেছিলেন দ্রোণ যদি আর আধবেলা যুদ্ধ করে তাহলেই সমস্ত পাণ্ডব সেনা ধ্বংস হয়ে যাবে, কি—বলেননি? তবে—?

এটা অনেকটা কি রকম জানো—মনে করো একটা ব্যাটসম্যান খুব ভালো খেলছিল, কিন্তু অ্যাম্পেয়ার তাকে ভুল আউট দিয়ে দিল! ব্যাস, এর ফলে টিমটাই হেরে গেল। আশ্চর্য—তাই না?"

নির্মলা এবারে কেমন যেন বোকা বনে গেল। অয়নের কথাগুলো ওর কেমন যেন গণ্ডগোলে গণ্ডগোলে লাগল। বলল, "যুধিষ্ঠির তো নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই বলেছিল। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মিথ্যা বলা যায়—মহাভারতেই আছে।"

"হ্যাঁ আছে। শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নয়, আরো চারটে আছে। মোট পাঁচটা বিষয়ে মিথ্যা বললে পাপ হয় না। বলব—শ্লোকটা বলব?"

"তার মানে, তুমি কি আবার শ্লোক-ট্লোকও জানো নাকি?"

অয়ন এবারে হেসে ফেলল। বলল, "তা একটু আধটু জানি বৈকি, কিন্তু শোনোই না—মন দিয়ে শোনো—আদিপর্বের ৭২ পরিচ্ছেদে এরকম একটা শ্লোক আছে

বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যাগে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃত্যানাহুরপাতকানি।

(মহাভারত—রাজশেখর বসু—৪৯৪ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ বিবাহকালে, রতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায় আর ব্রাহ্মণদের উপকারের উদ্দেশ্যে এই পাঁচটা ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিলে পাপ হয় না। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় কথাটার মানে বুঝতে পারছ—শুধু মিথ্যা কথা বলাই নয়, অনেক কিছুই করা যায় শব্দটা দিয়ে!

আর তুমিই বলো—এই পাঁচটা ব্যাপার ছাড়া আর কি-ই বা আছে মানুষের জীবনে? আসলে পৃথিবীর সব মিথ্যাকেই এই পাঁচটা পয়েন্টের কোনো না কোনোটা দিয়ে আড়াল করা যায়!

BanglaBook.org

যেমন ধর তুমি আমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে মাছ কিনতে পাঠালে। আমি চারশো টাকার মাছ কিনলাম আর একশো টাকা দিয়ে ফুর্তি করলাম। কিন্তু তুমি যখন জানতে চাইলে তখন বললাম পাঁচশো টাকারই মাছ কিনেছি। কারণ ওইখান থেকে টাকা নিয়ে ফুর্তি করেছি জানলে তুমি রাগ করবে। বলা কি যায় রেগে গিয়ে হয়তো এমন কিছু করবে যাতে আমার প্রাণসংশয় হতে পারে—তাই মিথ্যা বলে দিলাম!

আর প্রাণসংশয় কথাটাই তো কনফিউজিং—একেবারেই রিলেটিভ। তুমি জলে ডুবে যেতে যেতেও ভাবতে পারো, নাঃ কিছুই হয়নি—আমি ঠিক এই বিপদ সামলে নেব। আর আমার হয়তো জল দেখেই মনে হবে—ডুবে যাব—আমার প্রাণসংশয়! এই ভাবা, আর ভেবে কিছু ঠিক করা—সবটাই বড় গণ্ডগোলের!

আরে ভাই, এই জন্যেই তো মহাভারতটা আমি খুব ভালো করে পড়ছি। ওই যে আছে না—যা নাই মহাভারতে তা নাই ভারতে—এটা কিন্তু একদমই সত্যি! এখনো আমরা—মানে এ যুগের লোকেরা, মহাভারতের তুলনায় সব কিছুতেই একেবারে শিশু—এমনকি ছলচাতুরিতেও।"

BanglaBook.org

## চার

"কি মল্লিক সাহেব কিছু ভাবলেন?"

"কি ব্যাপারে বলুন তো—কি ভাবব?" অয়ন রজত রায়কে উত্তর দিল।

রজত রায় আজ আবার অয়নের অফিসে এসেছেন। তবে আজ একা এসেছেন—সুমন্ত সিনহা আসেননি।

"কি ব্যাপারে সে তো আপনি ভালোই জানেন। যাক গে, ও কথা বাদ দিন—ওষুধটা পেলেন?"

"ওষুধ—কোন্ ওষুধটা?"

"যেটা আজ ড. ঘোষ ম্যাডামকে দিয়েছেন। সেবায়নের ক্লিনিকেও নেই—লাইফেও পেলেন না। পেয়েছেন কি—নইলে নামটা বলুন আমি আনিয়ে দিচ্ছি।"

"তার মানে?" অয়ন এবারে যেন রাগে লাল হয়ে উঠল। স্থান কাল পাত্র ভুলে প্রায় চিৎকার করেই বলল, "এসব আপনি জানলেন কি করে—

আপনারা কি আমায় ফলো করছেন নাকি? কেন—আমি কি চোর না ডাকাত —না গুণ্ডা বদমাইশ? আশ্চর্য তো!"

অয়নের কথায় রজত রায় বোধহয় একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, "আরে না না—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমরা কি তাই বলেছি নাকি? কিন্তু ও কথা থাক—ওষুধটা পেয়েছেন কী? না পেলে বলুন—আনিয়ে দিচ্ছি। তবে এর মধ্যে আবার অন্য কিছু ভাববেন না—ইটস্ অ্যা ফ্রেন্ডলি জেসচার—যে কোনো লোকই করবে। আরে আমাদের বাড়িতেও তো মা বোনেরা আছেন—নাকি?"

শেষের দিকে ওনার কথাগুলো যেন একটু আন্তরিক শোনাল। অয়নও যেন একটু শান্ত হয়ে পড়ল। বলল, "হ্যাঁ পেয়েছি—আমাদের পাড়ার দোকানেই পেয়ে গেছি—তবে মাত্র দশদিনের পেয়েছি। ওরা অবশ্য কাল পরশুই আবার আনিয়ে রাখবে বলেছে। দেখা যাক—না পেলে তখন না হয় আপনাকে জানাব।"

"ওঃ সিওর—উইদাউট এনি হেসিটেশন। আমার নম্বর তো আপনার কাছেই আছে। তবে আসল ব্যাপারটা কি জানেন—আমরাও তো চাকরি করি, আপনাদের চাকরি যেমন কারখানা বানানো, আমাদের চাকরি তেমনি আপনাদের দেখাশুনো। তাই সব সময় আপনাকে নজরে নজরে রাখি—নইলে কে বলতে পারে কখন কি হয়ে যাবে।"

"মানে—কিসের কি হয়ে যাবে?"

"না সে রকম কিছু না, আচ্ছা আপনাদের আদি বাড়ি তো নাটোরে। তাহলে তো আপনাদের মধ্যে ভাই ছাতু আছে—ভাই ছাতু, আছে না?"

"ভাই ছাতু—সে আবার কি? না ও সব আমাদের মধ্যে নেই।"

"ভাই ছাতু জানেন না—চৈত্র সংক্রান্তিতে হয়! অনেকটা ভাইফোঁটার মতো তবে অতটা বড় নয়। ভাই ছাতুতে বোনেরা ভাইকে নেমন্তন্ন করে—তারপর হাতে তিন বার একটু করে ছাতু দেয়, অনেক মন্ত্রতন্ত্রও পড়ে, কিন্তু সে সব আমার জানা নেই। এরপরে ভাই ওই ছাতুকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, আর বোনকে বলে—তুমি সুস্থ থাকো—সুখে থাকো—বিপদ আপদ থেকে দূরে থাকো—আমি তোমার সব বিপদ আপদ দুঃখ ভয়, সব কিছুকেই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। রীতিটা বেশ ভালো—তাই না?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ তা ভালো—তবে হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন তা তো বুঝলাম না!"

"বুঝলেন না—না? আরে আপনার বোনকে বিপদে পড়ার আগেই তো আপনার সাবধান করা উচিত। কত লোকই তো কত ভুল করে—আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে—সব কিছু নতুন করে আরম্ভ করে। আর আমাদের তো রিহ্যাব ক্যাম্প রয়েছেই।

নইলে তো কত কিছুই হতে পারে—তথ্য গোপন করার জন্যে কাউকে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া যেতেই পারে। এ তথ্য তো আবার যে সে তথ্য নয়—একেবারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার তথ্য!

কি—আপনি আবার তেমন কিছু গোপন টোপন করছেন না তো? দেখবেন—সাবধান কিন্তু! আমাদের হাতে কালি থাকে, ছুঁয়ে দিলেই লেগে যায়—কিছুতেই মোছা যায় না!

তাছাড়া এনকাউন্টার আছে। অন্য কারোরই বা কেন—আপনারই তো হতে পারে! ম্যাডামেরও স্কুল থেকে আসার সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে! না, গাড়ির ধাক্কাই যে হবে তা কিন্তু বলিনি। সামনেই তো পয়লা বৈশাখ, রাস্তাঘাটে যা ভিড়—হাঁটাই যায় না! ওই ভিড়-ভাট্টাতে লোকজনের ধাক্কাও লাগতে পারে, আর ওনার এখন যা অবস্থা তাতে আর পড়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে!

আসলে বুঝলেন তো মি. মল্লিক—আমাদেরও ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে।"

## পাঁচ

রাত ন'টা মতো বাজে—অয়ন আজ অনেক আগেই অফিস থেকে চলে এসেছে—পাশের ফ্ল্যাটের এক বৌদির ফোনে খবরটা পেয়েই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। নির্মলা আজ খুব বড় একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে! স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় ভিড়ের মধ্যে কি জানি কি করে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছে! আসলে এক ভদ্রলোক সময় মতো ধরে ফেলে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। উনিই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের যেমন অমায়িক ব্যবহার তেমনিই নাকি সুন্দর চেহারা—ফরসা লম্বা, বেশ হাসিহাসি মুখ, সরু গোঁফ, চোখে চশমা—অনেকটা যেন কার্তিকের মতো দেখতে!

BanglaBook.org

নির্মলা তখন থেকেই ঘুমোচ্ছে—ডাক্তারকে ফোন করে একটা হালকা ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছে। কিছু হয়নি ঠিকই তবে ভয়ঙ্কর নার্ভাস হয়ে গিয়েছে, দেখেও কেমন যেন ভীতসন্ত্রস্ত, বিধ্বস্ত লাগছে। ঘুমের মধ্যেও অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে!

সামনের ফ্ল্যাটের বৌদি অবশ্য সাহস দিয়ে গেছেন—বলেছেন চিন্তার কিছু নেই। বিপদটা সামলে গেছে, তবে সময়মতো ওই ভদ্রলোক না ধরলে কি যে হত কে জানে!

অয়নের চিন্তা কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছে না—ও অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, আর কি যেন ভাবছে! একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক যেন ওর সর্বাঙ্গকে গ্রাস করেছে।

নাঃ, নিজেকে এইরকম অসহায় অবস্থায় দেখতে ও চায় না—এমন বিপদগ্রস্তও না। কিন্তু কি-ই বা করার আছে—ও কি-ই বা করতে পারে?

কেন, পারে না কেন—অবশ্যই পারে! পাণ্ডবরা যদি নিষাদী ও তার পাঁচ নিরপরাধ পুত্রকে জতুগৃহে দগ্ধ করে বেঁচে থাকতে পারে, রাজা হতে পারে—তাহলে অয়নও পারে—নিশ্চয় পারে!

তাছাড়া মানুষের ইতিহাসে এ তো নতুন কিছু নয়—হাজার হাজার নিদর্শন আছে। কই, কৌরব রক্তে হাত রঞ্জিত করতে পাণ্ডবরা তো দ্বিধাবোধ করেননি—সেকি শুধুই ধর্ম সংস্থাপনে?

আর অয়নের এই সমস্যা—কি বলে মহাভারতের ওই পাঁচটা পয়েন্টের ব্যাখ্যায় একে? এ কি প্রাণসংশয় নয়? তাহলে?

নাঃ, আর দেরি করবে না—এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এনকাউন্টার আসার আগেই ও নিজেই এনকাউন্টারে যাবে!

অয়ন হঠাৎই এবারে পায়চারি বন্ধ করলো, খুব সন্তর্পণে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করল, চোরা দৃষ্টিতে চারিদিক খুব ভালো করে দেখে নিল, বন্ধ ঘরটাকেও যেন আরো একবার জরিপ করল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি মেসেজ অপশানে গিয়ে একটা ঠিকানা লিখে সেটা রজত রায়ের নম্বরে সেন্ড করে দিল!

BanglaBook.org

# সেই রাত

## বিনোদ ঘোষাল

এখনো পর্যন্ত জীবনে একবারই প্রবল আতঙ্কের সামনাসামনি হয়েছিলাম এবং আজও সেই রাতটার কথা ভাবলে বুকের ভেতর ছলাৎ করে ওঠে। ঘটনাটা এখনো আমার পুরো মনে রয়েছে। কোনোদিন কোথাও লিখিনি, বলিওনি কাউকে। আজ বলি।

আমার জেঠুর বাড়ি ছিল বাগবাজারে। ৩৫ নম্বর নিবেদিতা লেনে। সেখানে আমার মেজজেঠু আর ন'জেঠু সপরিবারে থাকতেন। আমরা প্রায়ই

BanglaBook.org

কোন্নগর থেকে যেতাম সেই জেঠুর বাড়িতে। উত্তর কলকাতার বাড়ি যেমন হয়। সরু রাস্তার গা ঘেঁসে একটা পেল্লায় বাড়ি। পুরনো লাল ইট বার করা। কোনোকালে হয়তো প্লাস্টার বা রঙ করা হয়েছিল তবে আমি জ্ঞানত রঙ বা প্লাস্টারের কাজ করানো কখনোই দেখিনি। রাস্তার গায়েই বিবর্ণ এবং মোটা কাঠের দরজা। সেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বেমক্কা অন্ধকার। সেই অন্ধকার চোখে একটু সয়ে নিয়ে কয়েক পা সোজা এগোলেই খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে সোজা। সেই সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে রেলিং ধরে ওপরে উঠে বিশাল চওড়া একটা বারান্দা। আর বারান্দার পাশে পরপর দুটো পেল্লায় ঘর। এক ঘরে থাকত মেজজেঠু, মেজজেঠিমা, আর তার তিন মেয়ে। আর অন্য ঘরে ন'জেঠু, জেঠিমা আর দুই মেয়ে। দুই জেঠুর মেয়েরাই ছিল আমার থেকে বয়েসে অনেকটা করে বড়।

প্রতিবারই আমি মা, দিদি আর বাবা দু-তিনদিন থাকতাম। আর প্রতিবারই আমি খুব অবাক হতাম রাত হলে আমাকে কিছুতেই সেই বারান্দাতে একা যেতে দেওয়া হত না। ওই অতবড় বারান্দাটার এককোণে টিমটিমে একটা হলদেটে বাল্ব জ্বলত বলে পুরো বারান্দা কখনোই আলোকিত হত না, এবং একটা আলো-ছায়ার আধিভৌতিক পরিবেশ তৈরি করত। বড়দের সঙ্গে বারান্দায় বেরোলে হাত ধরে যেতে হত। একা একা কখনোই নয়।

ফলে আমার মধ্যে একই সঙ্গে একটা জমাট ভয় আর কৌতূহল কাজ করত। একবার হল কি, আমি বাবা মা আর দিদির সঙ্গে গেছি। সন্ধেবেলার পর আমার দিদি আর ন'জেঠুর বড় মেয়ে পঙ্কাদি সেই বারান্দায় গেল আর কিছুক্ষণ পরেই ফট করে একটা শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে দিদির তীক্ষ্ণ চিৎকার। বড়রা সকলে ঘরের মধ্যে গোল হয়ে বসে গল্প করছিল, দিদির চিৎকার শুনে দুই জেঠু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন বারান্দায়। মেজজেঠুও গেলেন হাতে টর্চ নিয়ে। আমরা সকলে ঘরের ভেতর আতঙ্কিত। মা-ও যেতে চাইছিল, বাধা দিল জেঠাইমা, তুমি যেয়ো না, চুল খোলা রেখে বারান্দায় যেয়ো না। মিনিট কয়েক পরে দুই জেঠুর সঙ্গে দিদি ঢুকল ঘরে। আমার দিদি ভয়েতে পুরো সাদা হয়ে গেছে।

কী হয়েছে জানা গেল কিছুক্ষণ পর। দিদি আর আমার জেঠতুতো দিদি মিলে সন্ধেবেলায় গা ধুয়ে বারান্দার ওই কোণে ভেজা জামাকাপড়

BanglaBook.org

বদলাচ্ছিল, ঠিক তখনই নাকি বারান্দার সেই তারে ঝোলানো বাল্বটা দুলতে শুরু করে। প্রথমে অল্প অল্প তারপরে খুব জোরে, তারপর হঠাৎ করেই বাল্বটা গেল ফেটে আর খুব হাওয়া দিতে থাকল বারান্দায়।

সে কি! হাওয়া তো দেয়নি একটুও! সবাই অবাক।

ন'জেঠু ধমকে উঠল পঙ্কাদিকে। কেন তোরা সবকিছু জেনেও বারান্দায় চেঞ্জ করছিলি...জানিস না? বলে থেমে গেছিল ন'জেঠু, আর মা বলেছিল, কী ব্যাপার ন'দা? আমি বরাবর শুনে আসছি সন্ধের পর বারান্দায় যাওয়া বারণ। কারণটা আজও জানি না, আজ আপনাকে বলতেই হবে।

ছোটরা ভয় পাবে, ওসব কথা থাক বৌমা। বলে মাকে থামাতে চেষ্টা করলেন মেজজেঠু।

না, আজ শুনবই। আর ভয় তো ছোটরা আজ পেয়েই গেছে। প্লিজ আমাকে বলুন।

মেজজেঠু তখন বলতে শুরু করলেন, সবটা আমিও ভালো করে জানি না। তবে তুমি তো জানো আমাদের এই বাড়ি বহুকাল আগের। মানে সেই ব্রিটিশের আমল থেকে। শুনেছি এই বাড়ি নাকি এক মহিলার ছিল। এবং তিনি একাই থাকতেন।

এই এত বড় বাড়িতে একা!

শুনেছি তাই। আগে অনেকেই থাকতেন, কিন্তু একবার কলেরায় নাকি পরিবারের সব মানুষ মারা যায়, শুধু বুড়িই বেঁচে গেছিল, তারপর থেকে সে একাই থাকত। এবং এই বাড়ির প্রতি অগাধ মায়া। আমার বাবা যখন তাঁর কাছ থেকে এই বাড়িটা কিনেছিল তখন তাঁকে দোতলার বাইরের দিকে ওই কোণে একটা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি হয়েছিল যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিন এখানেই থাকবেন। তো মারা যাওয়ার পর...বলে থামলেন জেঠু।

কী হল মারা যাওয়ার পর?

জিজ্ঞাসা করে ফেললাম আমি।

মাঝে মাঝেই উপদ্রব শুরু হল। বাবা গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসার পরেও বন্ধ হল না।

কী হত?

BanglaBook.org

তেমন কিছু না, আসলে ওনার যত রাগ মহিলাদের ওপর। ছেলেদের কিচ্ছু করেন না। কিন্তু মেয়েদের দেখলেই রেগে যান। আসলে শুনেছি ওর নাকি এক অবিবাহিত মেয়ে ছিল, আর বড় প্রিয়। মেয়েটি অল্প বয়েসে কালাজ্বরে মারা যাওয়ার পর উনি আর কোনো অল্পবয়েসি মেয়েদের সহ্য করতে পারতেন না। দেখলেই রেগে যেতেন। মারা যাওয়ার পরেও সেই অভ্যাস যায়নি।

সন্ধের পর থেকেই ওনার এই বারান্দা দিয়ে যাতায়াত। ওই জন্য আমরা কেউ সন্ধের পর খুব একটা বারান্দায় যাই না, গেলেও মেয়েদের পাঠাই না। রেগে যান উনি।

কি করেন?

এমনিতে প্রাণের কোনো ক্ষতি করেন না, তবে ওই আর কি এটা ওটা ছোঁড়াছুড়ি করেন। ধাক্কা দেন।

এতটা শুনেই আমি ভয়ে অস্থির। গা ছমছম করছিল শুনে।

সেই রাতেই খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই মিলে শুয়ে পড়েছি। আমি আর বাবা পালঙ্কের ওপর। আর বাকিদের কেউ মেজজেঠুর ঘরের মেঝেতে কেউ ন'জেঠুর ঘরে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার আর ঘুম আসে না। কিছুতেই। নিচে সদর দরজা আর বারান্দার দরজা বন্ধ থাকে বলে দোতলার ঘরের দরজায় কেউ-ই ছিটকিনি দেয় না। আমি নাইট বাল্বের হালকা আলোর ঘরে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেককিছু ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎই মনে হল ভেজানো দরজাটা যেন খুব আলতোভাবে ঠেলে কেউ খুলছে। আমি ভয়ে কাঠ। একবার ভাবলাম শব্দ করি, কিন্তু গলা গিয়ে আওয়াজ বেরোল না, তার কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজে চোখে যা দেখলাম তাতে প্রাণ উড়ে গেল। আপাদমস্তক সাদা কাপড় পড়া কেউ একজন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে মুখটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু কুঁজোমতো। মাথায় ঘোমটা দেওয়া বলে মুখের ভেতরটা অস্পষ্ট। আমার হাড় হিম হয়ে গেল। ভাবলাম নিশ্চয়ই চোখে ভুল দেখছি। কিন্তু বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিলাম আমি সেই সাদা মূর্তির দিকে। আর বুঝতে পারছিলাম সে ভালো করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকা সকলকে দেখছে। আমাকেও। কতক্ষণ এমন কেটেছিল

BanglaBook.org

জানি না, একসময় দেখলাম মূর্তিটা আবার বাইরে বেরিয়ে গেল, দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশে বাবা নাক ডাকছে। কিন্তু তাকে ডেকে তোলার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই তখন। নড়াচড়া করতেই ভয় লাগছিল। অমন অবস্থায় থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বাবাকে বললাম আমি বাড়ি যাব।

কেন রে?

আমি থাকব না এখানে, না না না।

কারণটা ভেবেছিলাম কিছুতেই বলব না কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতেই হল বড়দের। সবটা শুনে বাবা বলল ভুল দেখেছিস চোখে। রাত্রে ওইসব ভূতের গল্প শুনে শুয়েছিলি বলে দেখেছিস। কিন্তু ন'জেঠু বাবাকে বলল, না রে, ও ভুল দেখেনি। ঠিকই দেখেছে। তবে ভয় পাস না, বুড়ি আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। আসলে বুড়ি নিজের পরিবারকে খুব ভালোবাসত তো, তাই আমরা রাত্রে সবাই যখন একসঙ্গে ঘুমাই তখন ও এসে আমাদেরকে দেখে, কিছু করে না, ভাবে ওর নিজের ফ্যামিলির সবাই শুয়ে আছে। আগে দরজায় কপাট লাগিয়ে ঘুমোতাম আমরা, কিন্তু মাঝরাতে যখন তখন দরজা ধাক্কানোর শব্দ হত বলে আমি আর মেজদা এখন আর দরজায় কপাট দিই না। এমনিই খোলা রাখি।

এই সব শুনে আমার ওই বয়েসেও, ভয় নয় কেমন যেন মনের ভেতর কষ্টের মোচড় দিয়ে উঠেছিল। এখন আর সেই বাড়িটা নেই, ভেঙে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। বুড়িটা এখন কোথায় কে জানে, কিন্তু সেই রাত্রের আতঙ্ক আর পরদিন সকালের কষ্টটা আমার মধ্যে আজও রয়ে গেছে।

BanglaBook.org

# লালসার হাতছানি

পল্টু দত্ত

বাকি রাতটুকু আর ঘুম হয়নি। ঘুমোতে পারিনি। ঘুমোনোর আর সাহসও ছিল না আমার। ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষাতে বসে ছিলাম। আলো একটু ফুটতেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। শিলং বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে।

এখন একটু চা খাওয়ার মতনও ধৈর্য নেই। গুয়াহাটি না ফেরা অবধি শান্তি নেই। ভীতি যেন আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রয়েছে আমায়। চায়ের দোকান এখনো খোলেনি, ইচ্ছে হলেও চা খাওয়ার উপায় নেই।

একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়লাম। চোখ বারবার রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে। তারা কী আবার দলবল নিয়ে আমার খোঁজে আসছে?

কাল রাতের ঘটনা এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। পুনরায় মনে আনতেও সাহস হচ্ছে না। যদি কেউ মনের কথা জেনে যায়।

কিন্তু ঠেকিয়ে রাখাও যাচ্ছে না। মনের দরজা ভেঙে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ছে।

কত দিনের সাধ আমার শিলং দেখব। কত আনন্দ নিয়ে শিলং এসেছিলাম। ঘুরেও ছিলাম খুব আনন্দ করে। দু চোখ ভরে শিলং-এর সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম। কিন্তু মাঝরাতে যা ঘটল, সেটা আমার জীবনের একটা কালো দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন থেকে ঘটনাটা মুছে ফেলতেও পারব না। আমারই একটু ভুলের, না, লোভের জন্য এত বড় ঘটনাটা ঘটল। হ্যাঁ, ঘটনাটার জন্য আমি নিজেই দায়ী।

গুয়াহাটি যাবার বাসের টিকিট দেওয়া শুরু হওয়া মাত্র একটা টিকিট কেটে বাসে উঠে বসলাম। আর পনেরো মিনিট বাদে বাস ছাড়বে।

বাস ছাড়ল। বাস একটু একটু করে এগোচ্ছে আর আমার ভয়ও একটু একটু করে কমছে। নিরাপদ জায়গায় আসতেই সিটের পেছনে হেলান দিয়ে চোখটা বন্ধ করি। ঠিক তখনই গুয়াহাটি আসার দিন থেকে সব ঘটনা একটার পর একটা মনের ওপর ভেসে উঠল।

অফিসের কাজ নিয়ে গুয়াহাটি এসেছিলাম গত পরশু দিন। কাজ ছিল বড়জোর ঘণ্টাখানেকের। হাতে মাত্র দু দিনের সময় নিয়ে এসেছি। কারণ, যে কোনো কারণে যদি সেদিন কাজটা না হয়! এর আগে বহুবার গুয়াহাটি এসেছিলাম। সেই ১৯৮৫ সাল থেকে। বছরে এক দুবার আসতেই হয়েছে। প্রতিবারই ভেবেছি একদিনের জন্য অন্তত শিলং ঘুরে আসব। কিন্তু আসা

BanglaBook.org

হয়নি। কিছুটা পরিস্থিতির জন্য; আবার একা বলে আরো সাহস হয়নি তখন।

এবারও গুয়াহাটি আসার আগে ভেবে রেখেছিলাম হাতে সময় পেলে একবার অন্তত শিলংটা ঘুরে আসব।

আমার অফিসের কারো শিলং দেখতে বাকি নেই। যারাই প্রথমবার গুয়াহাটিতে কাজে এসেছিল তারাই শিলং ঘুরে গেছে। সে কারণে এবার আমার ধনুকভাঙা পণ, শিলং আমি যাবই।

গুয়াহাটির কাজটা খুব তাড়াতাড়ি মিটে গেল। সরকারি অফিসে কাজ। অফিসাররা এত তাড়াতাড়ি আসবেন ভাবতেই পারিনি। বলতে গেলে প্রথম ঘণ্টাতেই মিটে গেল কাজটা। অন্যান্যবার পুরো দিনই লেগে গিয়েছে। কোনো কোনো বার পরের দিনের জন্যও অপেক্ষা করতে হয়েছে আমায়। কারণ, হয় অফিসার দেরিতে এসেছেন অথবা অফিসার হয়তো সেদিন অফিসেই আসেননি।

এবার আমার ভাগ্য সহায় বলেই মনে হয়েছিল।

সত্যিই আমার ভাগ্য সহায়। কেননা আগেরবারগুলোতে আমার বাধা আমিই সৃষ্টি করেছিলাম। ভেবেছিলাম, একা একা ওখানে যাব! ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিবিদ্বেষ দানা বেঁধেছে! সঙ্গে রয়েছে অফিসের এত টাকা! তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে হোটেলের পরিবেশও শুনেছি ভালো নয়। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে ভেবেই যাওয়া বাতিল করেছিলাম।

এবার কিন্তু এইসব মনেই আসেনি। বরং মনের একটু দৃঢ়তা অনুভব করেছি। সেকারণে 'জয় কামাখ্যা মা' বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

গুয়াহাটি থেকে শেয়ার ট্যাক্সিতে রওনা হয়েছিলাম, সকাল পৌনে সাতটায়। লাগেজ বলতে একটা ছোট অ্যাটাচি। তাতে একটা বিল-বই, রাতের একটা পোশাক, তোয়ালে, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ প্রভৃতি একরাতের প্রয়োজনমতো জিনিস।

শিলং পৌঁছেছিলাম এগারোটা নাগাদ। যেখানে নামলাম তার কাছেই একটা হোটেল পেলাম। সিঙ্গল বেডের একটা ঘরও পেয়ে গেলাম। ভাড়াটা সাধ্যের মধ্যে। মোটামুটি ভালো ঘর। ঘরটা হোটেলের একতলাতেই।

BanglaBook.org

হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে বেরোলাম।

অ্যাটাচিটা ঘরে রেখে দিলাম। শুধু শুধু সঙ্গে নিয়ে ঘোরার মানে হয় না। টাকাগুলো থাকল নিজের কাছেই। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পেটভরে খেলাম। রাত অবধি যতটা সম্ভব ঘুরে নেব এটাই ইচ্ছা।

ঘোরার জন্য একটা অটো ভাড়া করলাম। দিনেরবেলা যতটা সম্ভব দূরের স্থানগুলো আর সন্ধের পর হোটেলের কাছের স্থানগুলো দেখব এই আমার প্ল্যান।

ঘুরতে ঘুরতে ভাবছি, সত্যিই শিলং মেঘালয়ের রানী। কী অপূর্ব সুন্দর! হাত বাড়িয়ে মেঘগুলো ধরতে ইচ্ছে করে। সমগ্র শিলং পাহাড়টা পাইন আর ফার গাছে আরো মনোরম হয়ে উঠেছে। এখানকার বেশিরভাগ দোকানে মেয়েরাই দোকানি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে কী সুন্দর দেখতে। তাদের হাসিটা যেন আরো সুন্দর।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে শিলং শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। সত্যিই অসাধারণ সুন্দর। মনে মনে ভাবলাম বিয়ের পর এখানেই বেড়াতে আসব।

রাত সাড়ে আটটা অবধি ঘুরে ঘুরে হোটেলে ফিরলাম। পাহাড়ে সাড়ে আটটা মানে বেশ রাত।

যাইহোক, ঘরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে আবার বাইরে এলাম। রাতের খাওয়াটা আগে খেয়ে নেওয়া যাক। বেশি রাতে হোটেলে খাবার পাওয়া মুশকিল।

খেয়ে উঠে হোটেলের ছাদে গেলাম। ভাবলাম, আজকের রাতটাই তো থাকব। যতটা সম্ভব উপভোগ করে নিই।

একটু একটু করে বাইরের কোলাহল কমছে। রাস্তাঘাটে গাড়ি-ঘোড়াও কমে এসেছে। একে একে বাড়ি, বিভিন্ন হোটেলের ঘরগুলোর আলো নিভছে। পাইন, ফার গাছগুলো আতঙ্কের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে যেন। যেন বলতে চায়, চরাচরবাসী সাবধান! এখন ক্লান্ত রানীর ঘুমের আয়োজন চলছে।

নিঃশব্দ শিলং-এর সৌন্দর্য আরো কিছুক্ষণ উপভোগ করলাম। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এলাম। জামা প্যান্ট ছেড়ে রাতে শোবার পোশাক পরে নিলাম।

জামা-প্যান্ট ভাঁজ করে অ্যাটাচিতে রাখলাম। কেননা, অফিসের সমস্ত টাকা প্যান্টের পকেটে আছে।

BanglaBook.org

আজ সারাদিনটা ঘোরাঘুরি হয়েছে। রাতও যথেষ্ট হয়েছে। তাই শুয়ে পড়লাম। আমার এতদিনের সাধ যেন মিটল। আজ রাতটা কাটলেই কাল সকালে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হব।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। চোখে আলো পড়লে আমার ঘুম আসে না। আবার একদম অন্ধকারেও ঘুম হয় না। অন্ধকার হওয়ামাত্র মনে হয় আমি কোন জঙ্গলে শুয়ে আছি। আমার চারিদিকে ভয়ংকর সব জন্তু জানোয়ার। পাশ ফিরলেই তাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। তারপর তারা আর আমায় রেহাই দেবে না।

ঘরে কোনো স্বল্প আলোর বাল্বও নেই। অগত্যা বাথরুমের আলো জ্বেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। সবটা নয়, সামান্য ফাঁক রাখলাম, যাতে ঘরটা সামান্য আলোকিত হয়।

শোওয়ামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই-ই হয়েছিল। রাতে কোনোদিনই আমার টয়লেটে যাবার অভ্যাস নেই। সুতরাং একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম।

পাশ ফিরতে গিয়ে একসময় চোখের পাতা আলগা হয়েছিল। আবার চোখ বন্ধ করার মুহূর্তে মনে হল হালকা কিছু একটা যেন দেখলাম! সেটা কী দেখার জন্য আবার চোখ খুললাম। মনে হল কেউ যেন আমার পাশে শুয়ে আছে।

এ কি করে সম্ভব! আমার বিছানায় একজন অচেনা মেয়ে! এ হতে পারে না। আমি তো এখানে একা বেড়াতে এসেছি! পাহাড়ি অঞ্চল। সারাদিন একা একা ঘুরেছি। একাই হোটেলে ফিরেছি। একা একাই খেতে গেছি। হোটেলের ঘরে একাই শুয়েছি বেশ মনে আছে। তাহলে! তাহলে কি আমি ভুল দেখছি! না! ঠিকই দেখছি, এই তো আমার পাশে কে একজন মেয়ে শুয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। বাথরুমের সামান্য আলো ঘরে পড়েছে। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর ঘাগরা। আলুথালু অবস্থা। লোকে দেখলে বা শুনলে ভাববে আমার শয্যাসঙ্গিনী। না! এ তো ভালো ব্যাপার নয়। এ তো কোনো ভালো মেয়ের কাজ নয়!

একটা বিপদের আশঙ্কায় সজাগ হই আমি। এই ঘর থেকে পালাতে হবে। যেমন করেই হোক।

BanglaBook.org

কিন্তু মেয়েটা এখানে এল কিভাবে! বেশ মনে আছে দরজার ছিটকিনি আটকিয়ে শুয়েছিলাম। তাহলেও বাথরুমের দিকে চোখ যায় আমার। দরজাটা একটু বেশি খোলা মনে হচ্ছে! এতটা তো খুলে রাখিনি?

শুনেছি বাথরুমের জানলা খুলে অনেক ছেলেমেয়ে হোটেলের ঘরে ঢুকে পড়ে। সারাদিন নেশাভাঙ করে তারা। রাতে একটু শোওয়ার জন্য পাগলা হয়ে যায়।

বাথরুম থেকে চোখ ফিরে এসে পড়ে মেয়েটার ওপর। ভরপুর যৌবন। নিজে যেচে এসে আমায় ধরা দিয়েছে। এত সহজে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে আমার ভিতরের দানবটা জেগে উঠেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সামনে লালিপপ দেখলে যেমন করে ঠিক তেমনি করছে। ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এমন সুন্দর লোভনীয় বস্তুকে ছেড়ে দেওয়া মুশকিল।

অনেক কষ্টে ঠেকাই দানবটাকে। আর সময় ব্যয় করা যাবে না। বাঁচতে চাও তো মেয়েটা জেগে ওঠার আগে পালাতে হবে।

আওয়াজ না করে খাট থেকে আস্তে আস্তে নেমে জুতোটা হাতে নিই। টেবিল থেকে আর এক হাতে অ্যাটাচি। এবারে খুব সন্তর্পণে দরজার দিকে এগোই। আমার বাম হাতে জুতো আর ডান হাতে অ্যাটাচি। অ্যাটাচিসমেত ডান হাত দরজার ছিটকিনিতে রাখি। আবার মেয়েটার লোভাতুর যৌবন আমার চোখের দৃষ্টি টানে। চোখের ক্ষিদে মিটতে চায় না। শায়িত মেয়েটার শরীর লেহন করে চলেছে। এই তন্ময়তার মধ্যে অ্যাটাচিটা হাত থেকে পড়ে যায়, বেশ জোরে শব্দ করে।

দেখলাম আওয়াজে মেয়েটা চমকে খাটে উঠে বসেছে। খাট হয়ে ঘরের চারদিকে তার দৃষ্টিটা তড়িৎ বেগে একবার ঘুরল। তারপরেই এক লাফে মেঝেয়। নিমেষেই আমার সামনে।

আমি অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করি। এক টানে সে আমায় খাটের কাছে নিয়ে এনে ফেলল। আমি তাকে বললাম, আমার ঘরে কেন এসেছ?

মেয়েটি হিন্দিতে উত্তর করল। বুঝতে পারলাম সে আমার বাংলা কথা বুঝেছে। বলল, কে এসেছে এখানে! তুমিই তো আমায় এনেছ। ফুর্তি করে এখন পালিয়ে যাচ্ছ! টাকা ছাড়ো তারপর যাও।

BanglaBook.org

ওকে বোঝাতে চাইলাম আমি ভয় পাইনি। বললাম, একদম বাজে কথা বলবে না। আমি এখনি ম্যানেজারকে ডাকব।

মেয়েটি ঘাগরার পকেট থেকে ফোনটা বের করে ফোনে কাকে যেন আসতে বলল। একটু বাদেই দরজায় দুম দুম করে আওয়াজ। শোনামাত্রই মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। তারপরই হুড়মুড় করে তিনজন ষণ্ডা মার্কা ছেলে আর তাদের পেছনে ম্যানেজার ঘরে ঢুকল।

আমি ভয় পেয়ে ম্যানেজারকে আমার সব কথা বলতে গেলাম। তারা আমায় আটকে দিল। কিছু বলতে দিল না।

তাদের মধ্যে একজন আমার অ্যাটাচিটা নিতে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলাম। সে পিছন দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ল আর আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে অ্যাটাচিটা কেড়ে নিলাম।

তারপরই বাকি দুজন আমার কাছে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন আমার অ্যাটাচিটা ধরল। আমি খুব শক্ত করে অ্যাটাচিটা চেপে ধরে আছি। কিছুতেই ছাড়ব না। ততক্ষণে পড়ে যাওয়া ব্যক্তিও উঠে এসেছে। তখন তিনজনে মিলে আমায় চড় ঘুষি মারতে লাগল।

আমি বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছি। তারাও চড় ঘুষি মেরেই চলেছে। আর আমিও আর্ত-চিৎকার করে চলেছি।

এবারে ম্যানেজার দৌড়ে আসে। আমার বেশি ক্ষতি হলে তারও বিপদ হতে পারে। কেননা আমি যার রেফারেন্সে এই হোটেলে এসেছি, তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি। গুয়াহাটি এবং শিলং-এর একজন নামকরা ব্যক্তি।

ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় মারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। অনেক টাকা দাবি করেছিল তা আমি দিতে পারিনি। বলেছি আমার কাছে নেই।

তবু কিছু টাকা দিতে হয়েছে। রাগ প্রকাশ করে তারা চলে গেল। আবার ফিরে আসবে কিনা জানি না।

ম্যানেজার আমার কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বলে গেল, চলে যান।

সকলে চলে যাওয়ার পরেও, আমার বিছানায় বসতেও আর মন চায়নি। ভোরের অপেক্ষায় একটা চেয়ারে বসে পড়ি।

একটা হর্ন বাজিয়ে বাসটা থামল। চোখ চেয়ে দেখি একটা চায়ের

BanglaBook.org

দোকানের সামনে বাসটা দাঁড়িয়েছে। একজন দুজন করে যাত্রী নামছে চা খাবে বলে। আমিও নামলাম। একটা চায়ের অর্ডার দিলাম।

চা-ওলার কাছে জানলাম গুয়াহাটি আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। মনে মনে ভাবলাম এখন আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে এসে গেছি। আশা করছি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে আর অসুবিধা হবে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে চায়ে একটা আরামদায়ক চুমুক দিলুম।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG